বিজ্ঞানে মুসলমানের দান

প্রথম খণ্ড

(অঙ্কশাস্ত্র—দশম শতাব্দী পর্যন্ত)

এম. আকবর আলি এম, এস-সি (Cal.)

(ইউনিভার্সিটি মেডালিষ্ট)

'I am sure that no Subject loses more than Mathematics by any attempt to dissociate it from its History"—J. W. L. Glashier.

দি মালিক লাইব্রেরী

১১ সি দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—মোহাম্মদ আবুল ফজল
দি মালিক লাইব্রেরী
১১ সি দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৯৪৩

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

নালন্দা প্রেস, ১৫৯-১৬০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র

আমাদের জীবনের পথ-প্রদর্শক, অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার

আদর্শ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবিদ আলি, এম. এ., বি. টি.

সাহেবের করকমলে—

মিঞাভাই সাহেব,

আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম তিতিক্ষা, অপরিসীম ধৈর্য, অপরিমেয় কার্যক্ষমতা, স্নেহভাজনদের সৎপথে পরিচালিত করবার জন্যে অপার কষ্ট স্বীকার, সরল জীবন যাপন প্রণালী ও উচ্চ চিন্তা যারা আপনার সংস্পর্শে এসেছে তাদেরই মুগ্ধ করেছে। আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা স্পৃহাই আমাকে এ গ্রন্থ লিখতে উৎসাহিত করে; আপনার আদর্শই আমার উদ্যমকে সঞ্জীবিত রাখে। আপনার পাণ্ডিত্যের আদর হয় নি তবুও আপনাকে এতটুকু দুঃখ করতে দেখিনি, সবই আল্লার দান বলে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। আপনার আদর্শই আমাদের পথ প্রদর্শক। আপনার ঋণ এ জীবনে শোধ দেবার নয়, তবুও আপনার প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা আপনাকে দিয়ে ধন্য হলুম।

স্নেহধন্য

আকবর আলি

ভূমিকা

ইসলামের অভ্যুদয়ের অতি অল্পকাল মধ্যেই মুসলিমগণ জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। মুসলিম সাম্রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করায় বিভিন্ন প্রদেশে নামায সম্পাদনেব উদ্দেশ্যে দিঙনির্ণয় দ্বারা তথা হইতে কাবার অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। দিবাভাগের বিভিন্ন অংশে নামায পড়িতে হয় ও বৎসরের বিশিষ্ট দিনে রোযা রাখিতে হয় বলিয়া চন্দ্র সূর্য্যের গতিবিধি লক্ষ্য করার প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই তখন জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয় ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাও আরম্ভ হইয়া যায়। ফলে ৭৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ নয় শতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানধারা মুসলিম মনীষীদিগের মধ্যে প্রবাহিত হয়। তদানীন্তন পরিচিত জগতে, বাগদাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, মিসরের মধ্য দিয়া মরোক্কো, টলেডো, সেভিল ও কর্ডোভা পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে মুসলিম সুধীবৃন্দ কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও তথায় তাঁহারা নানা বিষয়ের চর্চ্চা করিতে থাকেন।

ঐ যুগের মুসলিম বৈজ্ঞানিকদিগের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা জগৎ সমাজে তেমন ব্যাপক ভাবে পরিচিত হয় নাই। ইহা সত্য যে বর্ত্তমান সভ্যজগৎ তাহার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দ্বারা আরবের সহিত বিজ্ঞানের যোগসূত্রের কথা নানাভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইউরোপীয় সুধীবর্গের গবেষণার ফলে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মূল আরবী সংস্করণ হইতে নূতন মুদ্রন প্রকাশিত হওয়ায়, আরব সভ্যতার নিকট বর্ত্তমান সভ্যতার ঋণের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল প্রচেষ্টার পরিচয় কথা সুদূর ইউরোপ হইতে আজিও সম্যকরূপে ভারতে আসিয়া পড়ে নাই। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনার প্রয়োজন অধিক হইলেও এখনও তাহা হয় নাই। বাংলা দেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তির কথা জানিবার আগ্রহ বর্ত্তমানে অত্যন্ত অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় এই পুরাতন কাহিনী তেমন বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই। যা' দু' একখানা ছোটখাট পুস্তক পাওয়া যাইত তাহাও বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। অধিকন্তু মুসলিম বৈজ্ঞানিকদিগের বিরাট কীর্ত্তির কথা ঐ সকল পুস্তকে অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে পূর্ব্বে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহারা বৈজ্ঞানিক মতামতের সদালোচনা করিতে পারেন নাই কারণ হয়তো তাঁহাদিগের নিজেদেরই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অভাব ছিল। এই জন্য প্রকৃত বিজ্ঞানের ছাত্রদ্বারা এই বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন

ছিল। বহুবার বহুস্থানে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার অনুরোধ আমাকে করা হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার অবসর আমি পাই নাই। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে মুসলিমের অবদান অতি মহান; সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিতে গেলে সেই সকল মনীষীর কীর্ত্তির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হইবে। এই জন্যই ঐরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার অভিপ্রায় কোনও দিনই আমার মধ্যে উদিত হয় নাই। আমার স্নেহাস্পদ পূর্ব্বতন ছাত্র শ্রীমান আকবার আলি এই কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার লইয়া আমাকে যেমন একটি গুরু দায়িত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি সমাজের একটি অতি গুরুতর অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে তিনি মুসলিম যুগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া তদানীন্তন গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ এবং পদার্থবিৎ ও রাসায়নিকদিগের কীর্ত্তির কথা ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিতে চান। কার্য্যটি অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ; তাঁহার পরিশ্রম সফল হউক ইহাই কামনা করি।

অতীতের গৌরবগাথার আলোচনা দ্বারা বর্ত্তমান মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজের মধ্যে নূতন জীবনের অনুভূতি জাগুক ইহা সাতিশয় বাঞ্ছনীয়। মুসলিমগণ এই জ্ঞানালোচনার প্রেরণা তাঁহাদিগের শিক্ষা গুরু, ইস্‌লামের প্রথম প্রচারকের এই সুপ্রসিদ্ধ বাণী হইতে লাভ করেন "জ্ঞান আহরণ কর, জ্ঞানের আহরণ ক্রিয়া পূণ্য কীর্ত্তির অনুষ্ঠান স্বরূপ। যে জ্ঞানের আলোচনা

করে সে আল্লাহের প্রশংসা করে; জ্ঞানের সন্ধানকারী, আল্লাহের পূজারী। জ্ঞানের শিক্ষক দানের পুণ্য অর্জ্জন করেন এবং যিনি উহা উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত করেন তিনি এবাদতের পুণ্যের অধিকারী। জ্ঞানের অধিকারী পাপ ও পুণ্যের বিচারে সমর্থ, ফলে জ্ঞানই স্বর্গের পথ প্রদর্শন করে। মরুমাঝে ইহাই আমাদের সমাজ, বন্ধুহীন জগতে ইহাই আমাদের সঙ্গী, বিপদে ইহাই আমাদের রক্ষক, বন্ধু সমাজে ইহাই আভরণ স্বরূপ। জ্ঞান সহযোগে আল্লার সেবক ন্যায়ের উচ্চ আসনে সমাসীন হয়েন, ইহজগতে ইহাই তাঁহাকে রাজার সহযোগী করে এবং পরকালে পরমানন্দের অধিকার দেয়। (স্পিরিট অফ ইস্লাম, সৈয়দ আমির আলি)" বিজ্ঞান এই জ্ঞানের বিশেষরূপ, অতএব বৈজ্ঞানিক আল্লার শ্রেষ্ঠ পূজার অধিকারী।

এই বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে গিয়া গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ে মুসলিমগণ গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হয়তো এমন শিল্প কুশলতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমানের পরমাণু বিচূর্ণন ক্রিয়ার সমতুল্য কোনও শক্তি প্রয়োগে হয়তো সংশ্লেষাত্মক সুবর্ণও প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন কিন্তু তাহার বিশদ বিবরণ আমরা পাই না, যাহা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় তাঁহারা সঙ্কর ধাতুই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রচেষ্টায় আনুষঙ্গিক বহু রাসায়নিক কীর্ত্তির কথা জানিতে পারিয়াছি এবং তাহা হইতে মনে হয় সে যুগে সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও ততোধিক সীমাবদ্ধ শিল্প কুশলতার

সহযোগিতায় তাঁহারা ব্যবহারিক রসায়ন ক্ষেত্রে যে কীর্ত্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, যদি পর পর যুদ্ধ বিপর্য্যয়ে রাজনৈতিক শক্তি ক্ষয় না হইত এবং তাঁহারা সেই কীর্ত্তির অনুসরণ করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস অন্যরূপে লিপিবদ্ধ হইত। বর্ত্তমান যুগের মুসলিমদিগের সত্যই ইহা দুর্ভাগ্য যে, যেদিন তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব যশোগৌরবের সন্ধান পাইলেন সেদিনও কেহ এই পথে চলিবার আগ্রহ দেখাইলেন না। ততদিনে একদল মুসলিম জ্ঞানী, ধর্ম্মসাধকের নির্ব্বিবাদ পথে তনু মন প্রাণ সংযোগ করিয়া পার্থিব কীমিয়ার পরিবর্ত্তে কীমিয়া-এ-সায়াদাত বা পারলৌকিক কীমিয়ার সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়ায়, ক্রমে দৈন্য ও দারিদ্র্য আসিয়া মুসলিমের গৌরবোন্নত পদকে ক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছে। আমার মনে হয় আল্লাহ মুসলিমকে কেবল পারলৌকিক সম্পদেরই অধিকার দেন নাই, পরন্তু তিনি তাহাকে পার্থিব সম্পদেরও পূর্ণমাত্রায় অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু ভুল করিয়া তাঁহারা প্রাচ্যের কৃষ্টির সহিত সমতা রাখিয়াই এই সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারকে অনিত্য বলিয়া সুদূর ভবিষ্যতের পারলৌকিক সম্পদের জন্য উন্মুখ হইয়া বর্ত্তমানকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। পার্থিব সম্পদ পারলৌকিক সম্পদের সোপান স্বরূপ। হয়তো গভীর ধর্ম্মভাবাপন্ন গোঁড়া সম্প্রদায় আমার এই কথা স্বীকার করিতে চাহিবেন না, তথাপি ইহা সত্য।

কিন্তু ইউরোপীয় ক্রুসেডের ফলে নিদারুনভাবে শক্তি ক্ষয়

হওয়ায় ক্রমে পার্থিব ব্যাপারের উপেক্ষা দ্বারা সুফীবাদের প্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠিল, এবং অদৃষ্টবাদই মুসলিমের শক্তিময় বাহুকে শিথিল করিয়া আনিল। পুরুষকার বলিতে যাহা বুঝায়, আরবের বীর সন্তানেরা তাহা ক্রমে ক্রমে ভুলিতে লাগিলেন। এই বিস্মৃতির ফলে মুসলিমের কর্ম্মময় জীবন ধারা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে তাঁহাদিগের আদর্শ, পবিত্র কোরাণের শিক্ষাও সঠিক পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। বহু স্থানে কোরাণের সহিত বিজ্ঞানের বাহ্যিক বিরোধ দেখাইয়া অবশেষে তাঁহারা সমগ্র বিজ্ঞানকেই ধর্ম্মবিরোধী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অধিকন্তু কেহ কেহ বা বিজ্ঞানীদের বিধর্ম্মী আখ্যাও দিয়াছেন। অথচ আমার বার বার এই কথা মনে হইয়াছে যে বিজ্ঞানের সাহায্যে পবিত্র 'কোরাণের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হইলে, নানা বিষয় যাহা আপাত দৃষ্টিতে বিজ্ঞান বিরোধী বলিয়া মনে হয় তাহাও প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। সে যাহাই হউক এবম্বিধ কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মুসলিম ধর্ম্মপ্রচারকদলের অনেকেই ক্রমাগত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব জাগাইয়া মুসলিম সমাজের উন্নতির পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারই ফল স্বরূপ ক্রমে ক্রমে আমরা বিজ্ঞান আলোচনা ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু যে জ্ঞান আহরণের প্রেরণা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারিব না।

আজ সেই লুপ্ত গরিমার আলোচনার ফলে এই মুমূর্ষু সমাজের মধ্যে যদি চেতনার সঞ্চার হয় এবং তাহারা নিজ ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া, বর্ত্তমানের কর্ম্মক্ষেত্রে যদি নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় তবেই এই প্রচেষ্টার সার্থকতা হইবে। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিরাট কীর্ত্তি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন বলিলেই আমরা সম্মানের অধিকারী হইব না, পরন্তু সেই গৌরব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ক্রমে যে অজ্ঞান তমসার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছি তাহাতে নিজেকে অধিকতর হীন বলিয়াই প্রচার করিব। অতএব আমি বলিতে চাই "হে মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজ, তোমার পূর্ব্ব গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় জাগিয়া উঠ। দশ, বিশ করিয়া নহে, শত সহস্র সংখ্যায় বিজ্ঞানের সাধনায় লিপ্ত হও। তোমার পূর্ব্ব গৌরব পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, আবার তুমি উন্নতির শীর্ষতম শিখরে আরূঢ় হইতে পারিবে। ভিক্ষা তোমার উপজীবিকা নহে, অনুগ্রহের দান তোমায় হীন করিয়াছে আরও হীনতর করিবে। যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি তোমাকে শিখাইয়াছে তাহারা তোমার নিদারুণ শত্রুতা করিয়াছে, আল্লার দরবারে তাহারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হইবে। তোমরাই একদিন অন্ধকার ইউরোপে জ্ঞানের আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলে; আজ তোমার নিজ বাসভূমিই অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন! জাগ্রত হও, নূতন জ্ঞান শিখা পুনঃ প্রজ্জ্বলিত কর। বিশ্ব মাঝে তোমার প্রকৃত প্রাপ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হও।"

আজ সমাজকে অতীতের গৌরব গাথা শোনাইয়া পূন্য কীর্ত্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এই গ্রন্থের সহায়তায় সেই আশা যদি সফল হয়, তবেই এই গ্রন্থ প্রণয়নের সার্থকতা থাকিবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা
১২-৩-৪৩

মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

কয়েকটি কথা

ইতিহাস শুধু অতীতের বিস্মৃত কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না, ভবিষ্যতের পথকেও সুনিয়ন্ত্রিত করে। অতীতের গৌরবময় কাহিনী নূতন পথে এগিয়ে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত করে তোলে, অতীতের দুঃখ, ত্রুটি, বিচ্যুতি যাত্রা পথকে দেয় সতর্ক করে। শুধু শৌর্য বীর্যের বেলায়ই নয় কৃষ্টির বেলায়ও এই একই কথা খাটে। শৌর্যবীর্য মানুষের আসুরিক দম্ভকে বড় করে তুলতে পারে, সাময়িক প্রাধান্য দিতে পারে কিন্তু মানুষকে মানুষ হিসাবে টিকিয়ে রাখতে পারে না—সেজন্যে চাই মনঃশক্তি, স্বাস্থ্যবান কৃষ্টি। কৃষ্টি বলতে যাদের কিছুই নাই তারা আপনা আপনি বিলীন হয়ে যায়—ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবে। কৃষ্টিহীন অমিত বলশালী অসভ্য বিজেতা এসে দেশ জয় করেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে মিশে গিয়েছে সভ্য বিজিতের সঙ্গে তার পূর্বেকার কোন নাম, চিহ্ন বা গন্ধ পর্যন্ত নাই : ইতিহাসে এমন উদাহরণের অভাব নাই। জাতির যাত্রাপথকে সহজ করে তোলবার জন্য তাই সব সময়ে সব বিষয়েরই ইতিহাস দরকার। যে জাতির ইতিহাস নাই তারা হতভাগ্য, যাদের আছে অথচ তা জানেনা তারা ততোধিক হতভাগ্য। বর্তমানে মুসলিম জাতি এই অতি হতভাগ্য দলের অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের এই দুর্ভাগ্যের কথা আমার প্রথম মনে জাগে কলেজে পড়বার সময়। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলুম। দেশবিদেশের

নানা বৈজ্ঞানিকদের অমানুষিক সাধনা দেখে বিস্মিত হতুম, তাঁদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসত—অতি শ্রদ্ধার পাত্রদের মধ্যে মুসলমান কেউ আছে কিনা খোঁজ করতুম কিন্তু সর্বদাই নিরাশ হতুম। কোন দিন কোন মুসলিম বৈজ্ঞানিকের নাম পাই নাই কলেজ Text Book-এ কি প্রফেসরের লেকচারে, কি অন্য কোন সেই সময়কার পাঠযোগ্য পুস্তকে। মাননীয় অধ্যাপক, বক্তা ও নেতাদের গগনভেদী চীৎকারে পূর্ব পুরুষদের শৌর্য, বীর্য, সৌন্দর্যবোধের কাহিনী শুনতে পেতুম কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁদের এতটুকু অবদান আছে কিনা, কোন দিনও কার মুখে শুনতে পাই নাই। একটা অব্যক্ত বেদনায় মনটা বিষিয়ে উঠত। মনে প্রশ্ন জাগত, সত্যিই কি কোন দিন কোন মুসলিম মনীষী এদিকে দৃষ্টি দেন নাই; শুধু কাব্য, সঙ্গীত বিলাস ব্যসনেই কি গোটা মুসলিমজাতি কাল হরণ করেছে। এর কোন সদুত্তর পাই নি কোথাও। যাঁদের কাছে এর সদুত্তর পাব আশা করেছিলুম সেই মাননীয় অধ্যাপকবৃন্দ আরও নিরাশ করেছেন, তাঁদের অনেককে পেয়েছি নিরুত্তর, অনেকের জ্ঞান দেখেছি প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্রের চেয়ে বেশী নয়; অনেকে আবার একে নিছক অনর্থক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বোধ হয় সমস্ত মুসলিম ছাত্র ও যুবকের মনেই এমনি প্রশ্ন জাগে এবং এমনি ভাবেই তাদের নিরাশ হতে হয়। প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা। কতদূর সফল হ'তে পেরেছি পাঠক পাঠিকারা বিচার করবেন।

কলেজ ছেড়ে রিসার্চ করবার সময় হয়ত পূর্বেকার মানসিক অবস্থার জন্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এদিকে আকৃষ্ট হই এবং তখন থেকেই তথ্যাদি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করি। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরিশ্রমের ফলে যে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি সেইগুলো অবলম্বন করেই বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদানের কথা সমাজ সম্মুখে পেশ করবার আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত তথ্যাদি আপাতত কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে। প্রথম খণ্ডে বা বর্তমান গ্রন্থে দশম শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত মুসলিম মনীষী অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের জীবনী ও কার্যাবলীর পরিচয় দেওয়া গেল। দ্বিতীয় খণ্ডে একাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিম অঙ্কশাস্ত্রবিদদের কথা আলোচিত হবে। তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ, চতুর্থ খণ্ডে রসায়নবিদ, পঞ্চম খণ্ডে পদার্থবিদ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের কথা আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

ইতিহাসের মধ্যযুগই মুসলিম প্রাধান্যের যুগ। পূর্বে যে সমস্ত ঐতিহাসিক এই মধ্যযুগ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই একে অন্ধকার যুগ বলে ধরে নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের কার্যকলাপেও একে অন্ধকার যুগ বলে প্রতিপন্ন করে তুলেছেন। তাঁদের অনেকের মতে কৃষ্টি জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এ সব চেয়ে অন্ধকার যুগ। হয়ত তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণার পরিপোষকতার জন্যেই কোন ইতিহাসেই মুসলিম মনীষার কথা সম্যক আলোচিত হয়

নাই। কেউ একে একেবারে উপেক্ষা করে গেছেন, কেউ একে নগণ্য বলে সামান্য দুই এক কথাতেই আলোচনা শেষ করেছন। অনেক ঐতিহাসিকই মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও শৌর্যবীর্যের কথা আলোচনা করে কৃষ্টির দিক দিয়ে তাদিগকে হীন করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। এই মানসিকতার মূলে রয়েছে কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ। তার মধ্যে একটি হোল রাজনৈতিক এবং বোধ হয় এইটি প্রধান। ইসলাম প্রবর্তনের পর থেকে ক্রুসেড পর্যন্ত যে ইসলাম বিদ্বেষ ইউরোপীয় খৃষ্টানদের মনে শিকড় গেড়ে বসেছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের পরও তার প্রভাব লোপ পায় নাই। তাই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে মুসলমানদের বাস্তব অবাস্তব বর্বরতার কাহিনীই বেশী করে স্থান পেয়েছে, কৃষ্টিতে অবদানের কথার কোন স্থানই সেখানে হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ হোল অজ্ঞতা ও একদেশদর্শিতা। ঐতিহাসিকদের প্রায় সবাই এই সময়ে পাশ্চাত্যদেশের কি অবস্থা ছিল, লাটিন ভাষায় কি আলোচনা হয়েছিল সেই নিয়েই আলোচনা করেছেন। এই সময়কার প্রানবস্তু মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং কৃষ্টির ভাষা আরবী সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর নেবারও দরকার বোধ করেন নাই। ফলে তাঁরা আসল জিনিসকেই হারিয়ে ফেলেছেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে সে সময়ে কি উন্নতি হয়েছিল তার ধারণাও করতে পারেন নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কি উন্নতি হয়েছে সে কথা জানতে হোলে যেমন পাশ্চাত্যের ইংরেজী, জার্মান, বা ফরাসী ভাষায় যা কিছু হচ্ছে

সূচনা

আলোর পরে আঁধার, উত্তেজনার পরে অবসাদ প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতি তার সমস্ত কাজের মধ্যেই এই নিয়মের অনুসরণ করে চলেছে। মানব সমাজের সভ্যতার তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এখানেও সেই একই নিয়মের অনুবর্তন দেখা যায়। হয়ত ক্রমাগত দু এক শতাব্দী জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হয়েছে কিন্তু তার পরেই কিছুদিন ধরে চলেছে অবসাদ। সমস্ত গতি যেন রুদ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। উন্নতি দূরের কথা পূর্বেকার স্মৃতিরও যেন বিভ্রম ঘটেছে—অবনতির দিকেই চলেছে খানিকটা অভিযান। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক ইসলামের পুনঃ প্রবর্তনের পূর্বের শতাব্দী এই অবসাদেরই যুগ! পৃথিবীর সর্বত্র তখন অজ্ঞান বিভীষিকা বিরাজ করছিল বলা চলে। স্থানে স্থানে অল্প স্বল্প প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও সমষ্টিগতভাবে তাতে সভ্যতার কোন উন্নতিই হয় নাই। অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই তারা আপনা আপনি দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিবে গিয়েছে—অন্ধকারের সামান্যতম অংশেরও

তাতে ভাঙ্গন ধরে নি বরং গাঢ় হয়েই দেখা দিয়েছে। এর পূর্বে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভারতবর্ষ, চীন, মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, গ্রীসের ইতিহাস তার সাক্ষ্য যোগাচ্ছে; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জন্মের পূর্ব শতাব্দীতে পূর্বেকার এই সমস্ত উন্নত দেশেও প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছিল বলে বলা চলে না। সভ্যতার ইতিহাসে এই অবসাদের কথা বিবেচনা করলে এ যুগটাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা ছাড়া উপায় থাকে না। পৃথিবীকে এই অন্ধকার রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি দিবার জন্য দরকার ছিল একজন যুগ প্রবর্তকের এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জন্ম সেই শুভ সংবাদই বহন করে এনেছিল।

ইসলামের প্রথম যুগে বিজ্ঞানের কোন আলোচনাই হয় নাই। এ খুবই স্বাভাবিক। শত শত বৎসরের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও কুশিক্ষাকে ভেঙ্গেচুরে জাতিকে নূতন করে গড়ে তুলতে ভিতর ও বাইরে থেকে যত বাধা আসে, সেগুলি অতিক্রম করা বড় সহজ নয়। ইসলামের প্রথম যুগেও এই অবস্থাই দেখা দেয়; তাই সমাজ সংস্কারই মনীষীদের দৃষ্টি বেশী করে আকর্ষণ করে। তাঁরা অন্যদিকে চেয়ে দেখবার সুবিধা বড় পান নাই। কিন্তু সেদিকে যে একেবারে অন্ধ ছিলেন না, তা বোঝা যায় হজরত মোহম্মদ (দঃ) এর উক্তিতে 'বিদ্যাশিক্ষার জন্য দরকার হলে সুদূর চীনদেশেও গমন করবে'। বিদ্যাহীন ধর্মপ্রবর্তক যাদের

এমন উপদেশ দেন তাদের মধ্যে যদি বিদ্যার জন্য আকুল আগ্রহের পরিচয় না পাওয়া যায় তবে আর কার মধ্যে পাওয়া যাবে? ফুটি ফুটি করেও এ আগ্রহটা প্রথম শতাব্দীতে ফুটে উঠতে পারে নাই, অন্ততঃ বিজ্ঞান-চর্চার দিক দিয়ে। ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শনের আলোচনাই প্রথম যুগের মুসলমান সমাজকে অনেকটা আচ্ছন্ন করে রাখে। সামান্য পরিবর্তন ও সুযোগ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনার আগ্রহ দুকুল ভাসান বন্যার দুর্বার গতি নিয়ে মুসলিম সুধী সমাজকে পেয়ে বসে। কুসংস্কার, গোঁড়ামি, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত কোন কিছুই এ আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারে নাই। সমস্ত বাধা বিপত্তি আপনা থেকেই মাথা নত করে দূরে সরে দাঁড়ায়। মুসলিম মনীষিগণ সব কিছু ভুলে গিয়ে বিজ্ঞান সাধনায় রত হন—পৃথিবীকে অজ্ঞান অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচাবার মহান ব্রত স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়ে।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম কে বিজ্ঞান আলোচনা সুরু করেন সে কথা সঠিকভাবে জানা যায় না। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে বিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ উৎসাহী ও পক্ষপাতী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বাণীতেই, কিন্তু ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ছাড়া অন্যদিকে মন দিবার অবসর তাঁর হয় নাই। হজরত-আলীর (কাঃ) বাণী

"খুয আল ফারার ওয়াত্ তালাক্
ওয়াশ্ শায়য়ান্ য়াশ্ বাল্কল্ বারাক্

এযা মাখ্‌যালাৎ ওয়া আসহাকাৎ
মালাক্‌ তাল ঘারাব্‌ ওয়াশ্‌ শারাক্‌

পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি বিদ্যুৎ বা বজ্র সদৃশ কোন বস্তুর সঙ্গে সম্মিলিত করতে পার তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হতে পারবে"—সোনা তৈরীর পরিকল্পনার আভাষ দিলেও যতদূর জানা যায় তিনি বিজ্ঞান হিসাবে এর কোন আলোচনাই করেন নাই। খুব সম্ভব ওম্মীয় বংশের প্রথম খালেদই (মৃত্যু ৭০৪ খৃঃ অঃ) সর্বাগ্রে বিজ্ঞান-চর্চার পথ প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে খুব বিদ্বান ছিলেন, এবং তাঁর অভূতপূর্ব বিদ্যাবত্তার জন্য 'আলহাকিম' নামে অভিহিত হতেন। বিদ্যাবত্তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বিদ্যোৎসাহিতা। গ্রীক সভ্যতার নিদর্শন গ্রীক পণ্ডিতদের অমূল্য গ্রন্থাবলীর দিকে তাঁর নিজের এবং পণ্ডিত সমাজের নজর পড়ে এবং তাঁরা এগুলি আরবীতে অনুবাদ করতে সুরু করেন। তিনি নিজেই জ্যোতিষবিদ্যা (Astrology), চিকিৎসাশাস্ত্র (Medicine) এবং রসায়নশাস্ত্রের (Chemistry) কতকগুলি গ্রন্থ গ্রীক থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন। গ্রীক দর্শন এবং বিজ্ঞান প্রথম প্রথম আরবদের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে, তাই প্রথম মুসলমান বিদ্যোৎসাহী নৃপতি এবং বিদ্বানদের দৃষ্টি পড়ে গ্রীক সভ্যতার দিকে। বিদ্যোৎসাহের এবং বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম যুগ হলেও, শুধু ভাষান্তর করাই যে তাঁদের জ্ঞান-চর্চার একমাত্র নিদর্শন এমন মনে করবার কোন কারণই নাই। বিজ্ঞানে তাঁদের নিজেদের দান

খুব কম হলেও বিশেষ উপেক্ষণীয় নয়। খলিফা খালেদ শুধু বিদ্যোৎসাহীই ছিলেন না, তিনি নিজেও রীতিমত বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। জ্যোতিষ, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল তাঁর অতিশয় প্রিয়। রসায়নশাস্ত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় রাসায়নিকদের সাধনার ধন স্পর্শমনির আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত হওয়াতেই পাওয়া যায়। তিনি নাকি স্পর্শমনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তার ব্যবহারে স্বর্ণ প্রস্তুতেও সফলকাম হন; এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রসায়ন বিভাগে করা যাবে। স্পর্শমনি আবিষ্কারে খলিফা খালেদ কতটা সফলকাম হয়েছিলেন, সে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, আসল কথা মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও প্রতিভার অভাব ছিল না। বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁদের প্রতিভার দান পূর্বেকার গ্রীক, ভারত এবং চীনের দানকে অনেকটা নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল। এগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করলে স্বতঃই মনে হয় যে, কারা দ্য ভো (Carra de Vaux) মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা মোটেই প্রামাণ্য নয়।* তাঁর মতে গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান প্রতিভা, কল্পনার মহত্ব, এবং কার্যকুশলতা মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে

---

* We must not expect to find among the Arabs, the same powerful genius, the same gift of scientific imagination, the same originality of thoughts, that we hear among the Greeks. "The Legacy of Islam. Edited by Sir T. Arnold. P. 376."

আশা করা উচিত নয় : কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ উক্তির মধ্যে অনেকখানি অসত্য লুক্কায়িত আছে।

প্রায়ই দেখা যায়, যে-সমস্ত জাতি এক সময় খুব উন্নত ছিল, একবার অধঃপতন হওয়ার পর আর কোন দিনই তারা তেমন উন্নতি করতে পারে নাই। অনেক স্থানেই, একবার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানের অতল অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত হয়ে গেছে, হয়ত বা চিরকালের জন্যই ; রয়েছে শুধু পূর্বেকার স্মৃতিটুকু। উদাহরণ স্বরূপ চীন ও ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। পূর্বেকার গৌরবের দোহাই দিয়ে যে বেশী দিন চলে না সে জ্ঞানটুকুও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। এই প্রাকৃতিক নিয়মেরও তেমনি ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে মেসোপটেমিয়ার বেলায়। আরবের ধূসর মরুভূমি এবং পারস্যের গোলাব কাননের মধ্যে তাইগ্রীস ইউফ্রেটিস নদী বেষ্টিত এই উর্বর ভূখণ্ড খৃষ্টজন্মের বহু পূর্বে বিজ্ঞানের লীলাভূমি ছিল। আবার প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পরে ইসলামের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত বৈজ্ঞানিকগণের সাধনার পীঠস্থানও হয় এই তাইগ্রীস ইউফ্রেটিস বেষ্টিত মনোহর ভূখণ্ডের মধ্যেই। ব্যাবিলনিয়ানদের দিন-পঞ্জী রাখার পদ্ধতি দেখে মনে হয় তাঁদের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা খৃষ্টজন্মের প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বেই (5700 B. C.) আরম্ভ হয়েছিল। কতদিন পরে এ জ্ঞানপিপাসা নির্বাপিত হয়ে পড়ে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু

জানা যায় না। তবে ইসলামের আবির্ভাবের নিকটবর্তী পূর্বকালে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন নিদর্শনই এখানে ছিল না সে ঐতিহাসিক সত্য। পুনর্বার অনুপ্রেরণা জাগে আব্বাসীয় বংশের খলিফা আলমনসুরের (712—774-5 A. D.) রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীতে।

মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান-আলোচনা করবার প্রথম অনুপ্রেরণা আসে গ্রীক সভ্যতা থেকে সেঁ কথা আগেই বলা হয়েছে। গ্রীক সভ্যতার উৎস ছিল আলেকজেন্দ্রিয়া ও কতিপয় সিরিয়ান নগরীতে; তাঁদের জ্ঞান-শিষ্যদের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার স্থান হয় তাইগ্রীস ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত কুফা ও বসরাতে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই কুফা ও বসরা দর্শন ও সাহিত্য-চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠে। মুসলিম রাজ্যের অন্য কোথাও তখন এ বিষয়ে এত উন্নতি হয় নাই। ইসলামদীক্ষিত জ্ঞানানুরাগী পণ্ডিতগণ তাঁদের শিষ্যবর্গ নিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় রত হন। অবশ্য প্রথমে তাঁরা অন্যান্য দেশের মত সাহিত্যের উপরই বেশী নজর দেন, পরে দর্শন আলোচনা আরম্ভ করেন। কুফা ও বসরাতে দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা চলত, এ সবগুলিরই উপর গ্রীকসভ্যতার অপ্রতিহত প্রভাব দৃষ্ট হয়। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে খালেদ ইবনে আহমদ নামক বসরার একজন পণ্ডিত একখানি গ্রীক-আরবী অভিধান প্রণয়ন করেন, এই অভিধান থেকে আরবী দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর গ্রীকের প্রভাব

সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। গ্রীকদের বৈজ্ঞানিক নামগুলি এই অভিধানে সুন্দর ভাবে আরবীতে অনুদিত করা হয়েছে। তখনকার দিনে ঔপপত্তিক দর্শনকে তিনভাগে ভাগ করা হোত; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, খোদাতত্ত্ব জ্ঞান এবং এতদুভয়ের মধ্যে স্থান ছিল অঙ্কশাস্ত্রের। আরবীয় পণ্ডিতগণ অঙ্কশাস্ত্রের প্রচলিত সংজ্ঞাগুলিকে গ্রীক নামের সঙ্গে অর্থের সাদৃশ্য রেখে আরবীতে অনুবাদ করেন, এর অনেকগুলি আজ পর্য্যন্ত অঙ্ক-শাস্ত্রে বিরাজমান আছে। অঙ্কশাস্ত্রকে চার ভাগে ভাগ করা হোত; (১) অঙ্ক (এলমুল আদাদ, arithmetic), (২) জ্যামিতি (হান্দাসা), (৩) জ্যোতির্বিদ্যা (এলমুল হায়া astronomy), (৪) গান (মুসিকি), ইউরোপীয় মধ্যযুগের quadriviam-এ যে সপ্তসুকুমার বিদ্যার উল্লেখ করা হোত, এগুলি তাদের মধ্যে অন্যতম।

তাইগ্রীস ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের তীরবর্তী স্থানেই ইসলাম প্রবর্তনের পর প্রথম জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা সুরু হয়। নদীর অবস্থিতি, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বোধ হয় মানুষের মনের মধ্যে একটা আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। মুসলিম সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎসের সঙ্গে ভারতের পূর্বেকার উন্নত যুগের সমালোচনা করলে, এ ধারণাকে নিতান্ত অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ভারতেও পূর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার স্থান ছিল নদী মাতৃক প্রদেশ সমূহে, এবং নদীর তীরে অবস্থিত তদানীন্তন নগরী সমূহে। এখনকার সঙ্গে তুলনা করা হয়ত চলবে না,

এখনকার মত বাণিজ্যের অবাধ প্রসার ও গতি এবং তার জন্য অপরাপর স্থান সমূহের সঙ্গে সহজ সংযোগ যে সেকালে ছিল না সে স্বতঃসিদ্ধ। নানা সুবিধার জন্যেই জ্ঞানবিজ্ঞানের লীলাভূমি হয়ে উঠছিল নদীতীরবর্তী নগরীসমূহ। কুফা ও বসরা সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে জ্ঞানের আলোচনাকেন্দ্র হিসাবে মুসলিম জগতে প্রাধান্য লাভ করলেও, খাঁটি বিজ্ঞানের আলোচনা এখানে তেমন কিছুই হয় নাই। সাহিত্য ও দর্শনই এখানকার সুধী সমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল। ইসলামীয় দর্শন, ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, আরবী সাহিত্যের উন্নতি, কুফা ও বসরা নগরীর সহিত নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট; কিন্তু বিজ্ঞানের বিশেষভাবে আলোচনা প্রথম সুরু হয় বাগদাদ নগরীতে। হারুন-অর-রশিদের বাগদাদ, আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর বাগদাদ, জগৎকে শুধু সাহিত্য, কল্পনার খোরাকই দেয় নাই, বিজ্ঞানেও এর দান আজকালকার সভ্য জগৎ নত মস্তকে স্বীকার করে নেয়।

বিজ্ঞানে মুসলমান মনীষীদের দানের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আরবী ভাষার কথা। শুষ্ক মরুভূমির ততোধিক শুষ্ক বাতাস এ ভাষাকে পারস্যের গোলাপ কাননে লালিত পালিত পারসী ভাষার মত মোলায়েম মনোমুগ্ধকর হতে দেয় নাই। আরবী ভাষায় কবিতার অভাব নাই। ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বে এবং পরেও এখানে শুধু কবিতারই স্থান ছিল বলা চলে, তবুও এর ভাষা যে কবির মত নমনীয় রমণী সুলভ হতে পারে নাই, এ হয়ত কেউ অস্বীকার করবেন না।

আরবের অধিবাসীরাও যেমন প্রাণ খোলা আনন্দে, কবির ভাষার পায়ের তলায় দিগন্তে বিলীন মরুভূমির উপর দিয়ে, কল্পনায় বিভোর হয়ে না থেকে বাস্তবেরও সন্ধান করে, এর ভাষাও তেমনি। সে ভাষা কবির কাব্যকে যেমন অতুলনীয় করে তুলেছে, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিজ্ঞানের নীরসতার সঙ্গে তার নীরসতাকেও তেমনি বেশ খাপ খাইয়ে দিয়েছে। আরবী ভাষার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি অধুনা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার চেয়ে কোন অংশে কম ত নয়ই, বরং অনেক স্থানেই উন্নত বলেই মনে হয়।

প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে আরবী ভাষাই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী সংযম ও প্রকাশশীলতা দাবী করতে পারে। বিজ্ঞানের তথ্যগুলিকে যে ভাষায় খুব সংক্ষেপে অথচ ভাবপূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় সেই ভাষাই বিজ্ঞানের পক্ষে তত বেশী উপযোগী। এদিক দিয়ে আরবী ভাষাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করবার উপায় নাই। ছোট ছোট আরবী শব্দগুলি যে অনেক ভাবব্যঞ্জক সেকথা ভাষাবিদ মাত্রেই স্বীকার করবেন কিন্তু এর মাধুর্য্য হোল যে সেগুলোর অর্থ প্রচ্ছন্ন নয়। আরবী ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধাতুগত বিভিন্ন অর্থ জানাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ জন্যে ভাষা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থও শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্টরূপে ধারণাবদ্ধ হয়ে পড়ে, সে শব্দগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

আর নূতন করে শিখবার প্রয়োজন হয় না। একই মূল থেকে বিভিন্ন অর্থ নিয়ে বহু শব্দ গঠন করবার উপযোগী হিসাবে এর সমকক্ষ ভাষা খুব কমই আছে বলা চলে। একটা উদাহরণ থেকেই কথাটা ভালভাবে বুঝা যেতে পারে। পূর্বেকার চিকিৎসকদের মতে শোথ (Dropsy) হয়ে থাকে অত্যধিক পানের জন্যেই। সেই হিসেবে আরবীয় চিকিৎসকেরা এর নামকরণ করেন "ইসতিস্‌কা" বা পানের আকাঙ্খা, আর এই ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের নাম দেন 'মুস্তাসকি" বা যে এই পানের আকাঙ্খা থেকে ভুগছে দুইটি শব্দই মূল ধাতু "সাকা"—সে পান করতে দিয়েছিল—। থেকে উৎপন্ন। আরবীয়েরা নিজেরাও এই ভাষা নিয়ে খুবই গর্ব করেন। আরবী ভাষাভাষী পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গেই বলবেন "আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি খালাকাল লিসানাল আরাবীয়া আহসানিয়ান কুল্লে লিসান"—সেই খোদাতালার সর্ব প্রশংসা যিনি আরবী ভাষাকে সমস্ত ভাষার শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন।*

যেখানে পৃথিবীর সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করে জীবিকা অর্জন

---

* For a Scientific language, indeed, Arabic is eminently fitted by its wealth of roots and by the number of derivative forms, each expressing some particnlar modifications of the root idea, of which each is susceptible (Literary History of Persia—Browne—Vol II-P. 7)

করতে হয়, সেখানে মানুষ কল্পনাবিলাসী কম হয়। তাদের কল্পনার খোরাক থাকে বাস্তবের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হয়ে, তারা হয় কাজের লোক। অদরকারী অতিশয়োক্তি তাদের থাকে কম। একথা আরবীয়দের সম্বন্ধে খাটে। আরবী কাব্যে তাই রামায়ণ মহাভারতের দশানন, হনুমান, ঘটোৎকচের সন্ধান কম পাওয়া যায়, তাদের কাব্যেও বাস্তবের ছোঁয়াচ লাগান। এই বাস্তবতা বেশী করে দেখা দিয়েছে বিজ্ঞান আলোচনায়। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের, অন্ততঃ অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা সমস্ত কিছুই কাব্যে হয়েছে। বেদের শ্লোকের বেদাঙ্গ, আর্যভট্টের দশগীতিকা, সুলভ সূত্র প্রভৃতি সমস্তই শ্লোক আকারে গাথা। এতে মনে হয় বিজ্ঞানকে একদিকে খাট করা হয়েছে। কাব্যে অতিশয়োক্তি থাকবেই, এই অতিশয়োক্তি ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানেও ঢুকে গেছে। কল্পযুগ, ব্রহ্মার মুহূর্ত ইত্যাদিতে বড় বড় সংখ্যার কল্পনায় কাব্যের ছোঁয়াচ বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে অনেক স্থানেই খর্ব করে দিয়েছে। তাঁরা যে কথাটা বলতে চেয়েছেন, সংক্ষেপে সারটুকু না বলে, কাব্যের সাহায্যে তাকে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলেছেন। কবির দেশ, যুগে যুগে কাব্যের যা আদর, সেটা বৈজ্ঞানিকদের উপরও কটাক্ষপাত না করে পারে নাই। বৈজ্ঞানিকগণও সে কটাক্ষ উপেক্ষা করতে পারেন নাই। কাব্যের মোহ যে তাঁদিগকেও বিচলিত করেছিল, বিজ্ঞানের আলোচনায়ও কাব্যের স্পর্শ দেখে সেই কথাই মনে হয়। তবে সংস্কৃত সাহিত্য যে খুবই উন্নত

ছিল, বৈজ্ঞানিক শ্লোকগাথা থেকে সে বিষয় ভাল ভাবেই প্রতীয়মান হয়। নীরস বিজ্ঞানকে সরস করে তুলবার প্রচেষ্টা, সাহিত্যের এবং বৈজ্ঞানিকের উভয়েরই বিশেষ কৃতিত্বেরই নিদর্শন, তা ছাড়া এতে মুখে মুখে বৈজ্ঞানিক শ্লোকগুলি শিখে নেবার পক্ষেও খুবই সুবিধাজনক। তবুও পরবর্তী যুগে এর প্রসার এবং প্রচার হয় নাই বা হতে পারে নাই, বোধ হয় অনেকটা কাব্যের অতিশয়োক্তির জন্যেই। গ্রীক বিজ্ঞানের সম্বন্ধেও এই অতিশয়োক্তির কথা প্রযোজ্য। যদিও গ্রীক বিজ্ঞান-সাহিত্যে কাব্যের প্রাদুর্ভাব কম, তবুও তাঁরা কল্পনায় কম যান নাই। গ্রীক দেবদেবী, ঐতিহাসিক সমস্যাসমূহ বিজ্ঞান ও সাহিত্যে এমন ভাবে ভর করে আছেন যে, এঁদের তাড়িয়ে আসল বিজ্ঞানের খোঁজখবর নেওয়া বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রীক পণ্ডিতদেরও বৃহৎ গণিতিক সংখ্যার প্রতি একটা অসম্ভব রকমের আসক্তি দেখা যায়; আরকিমেডিস (Archimedes) এর পশুর সমস্যা (Cattle Problem), বালুকা-গণক (Sand reckoner, বা aren arius), সামো অধিবাসী আরিষ্টারকাস (Aristarchus) এর বৃহৎবর্ষ (Great year) প্রভৃতি গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের বৃহৎ গণিতিক সংখ্যাপ্রীতির পরিচয় দেয়।

ভারত এবং গ্রীকের জ্ঞানশিষ্য আরবেরা কিন্তু গুরুদের এই কাব্যাসক্তি ও বৃহৎ সংখ্যাপ্রীতির প্রভাব একেবারে কাটিয়ে গেছেন। এ তাঁদের অমিশ্রিত নবজ্ঞান প্রবর্তক অপূর্ব প্রতিভারই পরিচায়ক। আরবীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিজ্ঞানের মতই

কাটখোট্টা। বৃহৎ বৃহৎ কল্প যুগের কল্পনা তাঁদের অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ স্থান পায় নাই। শুষ্ক, নীরস, তদানীন্তন জ্ঞানলব্ধ নাতিবৃহৎ জ্যামিতিক ও বীজগণিতিক সংখ্যা নিয়েই তাঁদের কারবার হয়েছে। সেই জন্যেই অঙ্কশাস্ত্রে তাঁদের দানও হয়েছে অতুলনীয়। অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে, এ দৃঢ় মানসিক শক্তির অভাব দেখা যায়। সে দিকে তাঁরা গুরুদের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অন্যান্য বিভাগে সাহিত্যিক রূপ এবং অলঙ্কারের এত অধিক আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যে, আসল বক্তব্য তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। বেশীর ভাগই হয়েছে রসায়ন বা কিমিয়া বিভাগে। মনে হয় স্পর্শ-মনির লোভকে তাঁরা কেউ তেমন সংবরণ করতে পারেন নাই। পাছে অন্য কেউ তাঁদের আয়াস লব্ধ জ্ঞানটুকুকে আয়ত্ত করে নিয়ে ফাঁকি দিয়ে স্পর্শমনির আবিষ্কার করেন, হয়ত এমনি একটা দুর্বল ধারণা অহেতুক একটা ঈর্ষাকে তাঁদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল এবং সে সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব অসম্ভব করে তোলবার জন্য তাঁরা সাহিত্যিক রূপ এবং অলঙ্কারের আশ্রয় নিয়েছিলেন এই বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে। এ ধারণা সত্য নাও হতে পারে। হয়ত অন্যান্য দেশের মত সাহিত্যিকের আদরের জৌলুস তাঁদের মনেও একটা ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিল এবং সেইজন্যেই বৈজ্ঞানিক হয়েও তাঁরা সাহিত্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই। যদি অঙ্কশাস্ত্রের মতই বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও সাহিত্যের অহেতুক প্রভাব ঢুকতে না দেওয়া হোত,

তা হলে তাঁদের আয়াস লব্ধ জ্ঞান যে আরও সমাদর ও প্রসারতা পেত, সে কথা অস্বীকার করা চলে না কোন প্রকারেই। রূপ ও অলঙ্কারের খোলস ছাড়িয়ে আসল নগ্ন মূর্তি বের করতে পারলে দেখা যাবে বিজ্ঞানের রত্নগুলোকে কেমন করে সাহিত্যের সরস জঞ্জালে আবরিত করে রাখা হয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও যে আরব পারস্যে বিজ্ঞানের কিছু কিছু চর্চা চলত পরবর্তীকালে বিদ্যোৎসাহী মুসলমান নরপতিদের আলয়ে পারসী ও ইহুদী বৈজ্ঞানিকদের উপস্থিতিতেই সে বিষয় প্রমাণিত হয়। পারসী সাহিত্যের প্রতি দৃক্‌পাত করলে মনে হয়, ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকালের পারসীকদের বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে উত্তরকালের মুসলমানদের বিজ্ঞান-চর্চার এক নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। শুধু যে সিরিয়ান ভাষা থেকেই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল তা নয়, সাসানিয়ানদের আমলকার পারসী ভাষা পেহলবী থেকেও অনেক গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত হয়। তন্মধ্যে সাসানিয়দের রাজত্বের শেষভাগে সম্পাদিত "জিকই সাতরো আয়ার" (আরবী-জিজ আলশাহী বা জিজ আলশাহরীয়ার) Royal astronomical table অন্যতম। আলমনসুর, আলমামুনের বিদ্বান-সভায়ও অনেক পারসী ও ইহুদী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁরা অনুবাদ ও মুসলমানদের বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তদানীন্তন জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলককে (astronomical table) পারসী ভাষায় জিক বা 'জিজ' বলা হোত, উত্তরকালেও এই শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। এ সমস্ত

অনুধাবন করলে মনে হয় ইসলামের পূর্বেও পারস্যে বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। গ্রীক ব্যতীত অন্য যে দেশের প্রভাব মুসলমানদের উপর কার্যকরী হয়, সে হল ভারতবর্ষ। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে (astronomy) গ্রীক প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু ভারতবর্ষের দান ছিল বীজগণিত ও অঙ্কে। বীজগণিত গ্রীকদের নিকট এক প্রকার অপরিজ্ঞাতই ছিল। গ্রীক অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে আলেকজেন্দ্রিয়ার অধিবাসী ডাওফেণ্টেরই (Diophantus) যা নাম পাওয়া যায় বীজগণিতের সঙ্গে। ডাওফেণ্ট ছাড়া অন্য কোন পণ্ডিত এবিষয় নিয়ে তেমন কোন চর্চা করেন নাই। গ্রীক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে কেমন নানারূপ সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত করতেন সে বিষয় ডাওফেণ্টের জীবনী থেকেই কিছু বোঝা যায়। জীবনীকার আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন, ডাওফেণ্টের বাল্যকাল তাঁর জীবনের এক-ষষ্ঠাংশ, তারপর দ্বাদশাংশের এক-অংশের পর তাঁর দাড়ি গজায়, তারপর এক-সপ্তাংশে তিনি বিবাহ করেন, বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে তাঁর এক পুত্র জন্মে। পুত্র পিতার বয়সের অর্ধেককাল জীবিত ছিল, এবং পিতা পুত্রের চার বৎসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ৩৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং ৮৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ গ্রীক-বিজ্ঞানকেই ভিত্তি করে বিজ্ঞানের আলোচনা সুরু করেন। তাঁরা যদি বিজ্ঞানের আর

বিশেষ কোন উন্নতি না করে, শুধু তাঁদের সংরক্ষণ এবং অনুসন্ধিৎসার ফলপ্রসূত শতাব্দীকাল পূর্বেকার বিস্মৃতপ্রায় গ্রীক-বিজ্ঞানের অনুবাদ করেই রেখে যেতেন, বিজ্ঞানে তাঁদের নিজেদের মৌলিক দান কিছু নাও থাকত, তাহলেও তাঁদের আয়াস, অনুসন্ধিৎসা, শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ গ্রহণে ধর্মনির্বিশেষে অপক্ষপাত কার্যের জন্য, জগৎকে তাঁদের নিকট চিরঋণী হয়ে থাকতে হোত। গ্রীক-বিজ্ঞানের নামগন্ধও যখন বিলুপ্তপ্রায় তখনই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব, ও পূর্বেকার জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুসন্ধান, বিজ্ঞান জগতে বিধাতার এক আশীর্বাদই বলতে হবে। মুসলমানদের পূর্বে বিজ্ঞান অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জমান প্রায়। গ্রীকদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনেকগুলিই অধুনা লুপ্ত। আরবী অনুবাদই শুধু পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছে। বস্তুতঃ মুসলিম মনীষী এবং নৃপতিগণ, এদিকে মনোনিবেশ না করলে জগতের বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান-গবেষণা আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হোত। এপোলোনিয়াস (Appollo-nius) এর conics, মেনিলস (Menelaus) এর গোলক (spherics) বাইজেনটাইনের ফিলো (Philo) এর বায়ুবিজ্ঞান (pneumatics) প্রভৃতি গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত ; আরবী অনুবাদগুলিই তাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। মোট কথা গ্রীকবিজ্ঞানে-এত উন্নতির সাক্ষ্য হিসাবে রয়েছে শুধু মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অনুবাদ কার্য এবং তারই উপর নির্ভর করে ইউরোপের

২

বর্তমান বৈজ্ঞানিক অভিযান। মুসলমানগণ যখন পুরাতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুবাদ এবং নব নব জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত, খৃষ্টীয় ইউরোপ তখন অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইউরোপে তখন চলছিল অসভ্যতার অভিযান, বর্বরতার চরম নিদর্শন, ধর্মের নামে মানুষের জ্ঞান-পিপাসাকে পঙ্গু করে দিয়ে ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।

মুসলিম মনীষিগণ যে সময় বিজ্ঞান সাধনা আরম্ভ করেন তখন যে বিজ্ঞানের চর্চা করা আজকালকার মত এত সহজসাধ্য ছিল না সে অবিসম্বাদী সত্য। প্রথমতঃ আজকালকার মত অন্য দেশের জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়ার কোন সুবিধাই ছিল না, তা ছাড়া মুদ্রনের অভাবে কোন গ্রন্থই প্রচার লাভ করতে পারত না। বিজ্ঞানের ছাত্রদের হাতে লিখে নিয়ে পূর্বেকার বিজ্ঞান গ্রন্থগুলিকে নিজেদের সম্মুখে ধরে রাখতে হোত, আর এক অসুবিধা ছিল এই সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহের। এ ছাড়া নানা রকম ভাষা শিক্ষা করবার কঠোর পরিশ্রমও সহ্য করতে হোত। এই সমস্ত বিবেচনা করেই আলবেরুনী (আবু রাইহান আলবেরুনী ৯৭৩-১০৪৮) বলেছেন, "প্রথম জীবনে উপযুক্ত শিক্ষা, নানা ভাষা জ্ঞান, সুদীর্ঘ জীবন, দীর্ঘ ভ্রমণের, গ্রন্থ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের নিমিত্ত অর্থ ও সামর্থ এই সমস্ত বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমাদের দিনে কোন এক জীবনে এ সমস্তের একত্র সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। আমাদের কাজ হবে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের

কার্যগুলিকে সংরক্ষণ করা এবং যতদূর পারা যায় তাঁদের অসম্পূর্ণ গবেষণাকে সম্পূর্ণ করা। যে এর বেশী কিছু করতে যাবে, সে শুধু নিজেরই ধ্বংস করবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক কিছুরই ধ্বংস হবে।" আলবেরুনীর এ সমস্ত কথা তাঁর অতি বিনয়ের পরিচয় মাত্র। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানজগতে দান, তাঁর কথা মত যতটুকু হওয়া উচিত ছিল, আসলে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। নানা রকম অসুবিধা এবং সঙ্গে সঙ্গে খুব কম সুযোগ পেয়েও তাঁরা বিজ্ঞান-জগতে যে পরিবতন এনেছেন সে শুধু আশ্চর্যজনকই নয়, অতীব বিস্ময়কর।

মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অসুবিধা অন্ততঃ অর্থের দিক দিয়ে যে কত ছিল সে বোঝা যায় তদানীন্তন গভর্ণমেণ্টের বাজেটে শিক্ষাবিভাগের ব্যয় বরাদ্দ থেকে। আজকালকার অধ্যাপকগণের একজনের সমান মাইনেও তখনকার সমস্ত শিক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্দ হোত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রত্যেক মুসলিম রাজ্যেই বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল বটে, কিন্তু তাঁদিগকে রাজ্যের অন্য কর্মচারীদের মত তেমন দরকারী মনে করা হোত না বলেই ধারণা হয়। বাগ্মীর যেমন কদর ছিল বিদ্বানের কদর তেমন ছিল না, বক্তৃতা শক্তিকে অসম্ভব রকমে সমাদর করা হোত। হয়ত এখনকার মতই মুখে যাঁরা যত চীৎকার করতে পারতেন, গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও তাঁরাই তত বেশী আকর্ষণ করতেন। যাঁরা নীরবে নিজেদের সাধনায় লিপ্ত থাকতেন, তাঁদের দিকে খুব কম লোকেরই

নজর পড়ত, অন্ততঃ যে সব নীরব কর্মী ধর্মশাস্ত্র বা রাজনীতি চর্চা না করে অন্যদিকে মন দিতেন। ইবনে আত্তাবের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে একজন বিদ্বানকে ব্যাকরণ, ছন্দপ্রকরণ, অঙ্ক, কোরাণ ও সাহিত্য শিক্ষাদানের নিমিত্ত মাসিক ষাট দেরহামে (দেড় পাউণ্ড বা প্রায় কুড়ি টাকা) পাওয়া যেত কিন্তু সেই শিক্ষক যদি বাগ্মী হতেন তা হলে এক হাজার দেরহামেও তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। খলিফা আলহাকিম (৯৯৬-১০২১) কায়রোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে বিদ্যাগার নির্মাণ করেন তার বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ ছিল তু'শ সাতান্ন দিনার (একশ সাড়ে আটাশ পাউণ্ড বা মাত্র সতরশ টাকা)। এর মধ্যে নব্বই দিনার ব্যয় হোত পাণ্ডুলিপি নকল করবার জন্যে, এবং তেষট্টি দিনার লাইব্রেরীয়ান, অন্যান্য কর্মচারী ও আসবাবাদির জন্য ব্যয় হোত। দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র একশ চার দিনার। কিন্তু মিশরের প্রধান কাজী পেতেন, কারুর কারুর মতে, মাসিক চার হাজার দেরহাম (প্রায় আশী পাউণ্ড) কেউ কেউ বলেন তাঁর বেতন এর চেয়েও বেশী ছিল; তিনি দৈনিক সাত দিনার বা প্রায় পঞ্চাশ টাকা পেতেন। অর্থের এমন অপ্রাচুর্যের মধ্যেও যাঁরা বিজ্ঞানের সাধনায় জীবনপাত করেছেন, শুধু অনর্থক জীবনপাতই করেন নাই বরং বিজ্ঞানকে রত্নসম্ভারে পূর্ণ করে মুসলিম জগৎকে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে গৌরবময় করে গিয়েছেন, তাঁদের সে সাধনার মূল্য আজ কে দিবে?

মুসলমান আমলে রীতিমত ভাবে বিজ্ঞান-চর্চা প্রথম সুরু হয় বাগদাদ নগরীতে, আব্বাসীয় খলিফা আলমনসুরের রাজত্ব কাল থেকে। ওম্মীয় বংশের রাজত্বকালে বিজ্ঞান-চর্চা কতদূর হয়েছিল, তার বিস্তৃত ইতিহাস এখনও পাওয়া যায় নাই। দেশে দেশে, মসজিদে, লাইব্রেরীতে যে সমস্ত পাঁণ্ডুলিপি রয়েছে এখনও তার রীতিমত খোঁজ করা হয় নাই। সেগুলোর মধ্যে যে কোন রত্নরাজি লুক্কায়িত আছে তা কে বলবে? এক কনস্তান্তিনোপলে প্রায় শ'খানেক লাইব্রেরীতে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি বর্তমান; তা ছাড়া কায়রো, দামস্কাস, মসুল, বাগদাদ, পারস্যের অন্যান্য নানাস্থানে, ভারতবর্ষে, স্পেনে, এখনও অনেক পাণ্ডুলিপি আছে। সেগুলির খোঁজও হয় নাই, পৃথিবীও তাদের পরিচয় পায় নাই। মধ্যে মধ্যে দু একখানি করে বের হয় আর সমস্ত পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে মুসলিম মনীষীদের জ্ঞান সাধনা দেখে। সমস্তগুলির অনুসন্ধান হবার পর এ সম্বন্ধে নিখুঁত ইতিহাস পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে অঙ্কশাস্ত্রের কথা। বিজ্ঞানের মুল অঙ্কশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রপাতও অঙ্কশাস্ত্র থেকেই। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে তাদের 'অঙ্কের' দরকার পড়েছিল সে কথা বিশ্বাস করবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার দরকার নাই। অবশ্য আজকালকার মত ধারাবাহিক প্রণালীবদ্ধ সুষ্ঠু কোন নিয়ম কিংবা আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রের প্রাথমিক আইনকানুনও যে

প্রথমেই প্রচলিত হয়েছিল এমন মনে করবার কোন কারণই নাই। তবে গণনা করবার একটা প্রণালী প্রথম থেকেই আবিষ্কৃত বা স্থিরীকৃত হয়েছিল মানুষের চিরন্তন কল্পনা শক্তির প্রভাবে ও অভাব বোধের তাড়নায়।' অঙ্কশাস্ত্রের ধারাবাহিক নিয়ম প্রণালী প্রথম যে কোথায় স্থিরীকৃত হয় সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। মেসোপটেমিয়া অগ্রগণ্য হবার দাবীর পক্ষে যেমন কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করে, তেমনি আবার মিশরও অন্য কতকগুলি যুক্তি দেখিয়ে তারই প্রথম হওয়ার দাবীকে জগৎ সম্মুখে তুলে ধরেছে। চীন এবং ভারতবর্ষও এ সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তবে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের পূর্বাপর সংরক্ষণ অভ্যাসের জন্য পূর্বেকার কার্যাবলীর অস্তিত্ব, এগুলি থেকে একটা ঐতিহাসিক তারিখ ঠিক করে নেওয়া সম্ভবপর। চীন এবং ভারতের বেলায় তেমন কোন প্রামাণিক ঐতিহাসিক তারিখ পাওয়া মুস্কিল। এদের প্রত্যেকের দাবীর মধ্যে যৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা যতই থাক না কেন, বিভিন্ন দেশের প্রাচীন অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশ, অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি করেছিল। সকলের মত এবং পথ ঠিক এক নয়। দেশের জলবায়ুর উপর মানুষের মানসিক অবস্থা যে অনেকখানি নির্ভর করে এ সমস্ত বিবেচনা করলে সে কথা বেশ ভাল ভাবেই প্রতীয়মান হয়। ভারত, আরব, পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের সভ্যতা ও আদর্শের সঙ্গে গ্রীক, রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য

দেশের সভ্যতা ও আদর্শের অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণ, এই জলবায়ুর পার্থক্যেই সন্নিবেশিত বলে মনে হয়। মানুষের আদি বাসস্থান এবং তাদের দেশ হিসাবে জাতিভেদ নিয়ে পণ্ডিতেরা এখনও গোলমাল করছেন. কেউ কেউ অঙ্কশাস্ত্রের চর্চাকে ভিত্তি করে এর মীমাংসার একটা উপায় নিরূপণের চেষ্টা করতেও কসুর করেন নাই।

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে নানা কারণে অঙ্কশাস্ত্র আলোচনা করবার মত মানসিকতার অভাব দেখা দিলেও নানা দিক থেকেই অঙ্কশাস্ত্র তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে এসে হানা দেয় নানা সমস্যার রূপ নিয়ে। এমনিতে অঙ্কশাস্ত্র আলোচনা না করলেও আশু প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে তাঁদের একটুও দেরী হয় নি। প্রথমেই এসে পড়ে সন তারিখ এবং পঞ্জিকার কথা। হজরতের মক্কা শরীফ থেকে হিজরতকে প্রথম প্রথম মুসলিমগণ কোন চোখে দেখেছিলেন বলা যায় না কিন্তু হজরতের মৃত্যুর পর একে কাজে লাগানর কথা তাঁদের মনে পড়ে। ফলে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই এই ঘটনা মুসলিম জগতের সন তারিখ নির্ণয় করবার জন্য ব্যবহৃত করা হয়। হিজরতের সতের বৎসর পরে হিজরী, সন হিসাবে গণনা করবার নিয়মপদ্ধতি প্রচলিত হয়। মুসলিম মনীষিগণ এ বিষয়ে কি তৎপরতা দেখিয়েছিলেন এই সঙ্গে খৃষ্টীয় অব্দের প্রচলনের কথা বিবেচনা করলেই সে কথা উপলব্ধি করা যাবে। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পাঁচশত বৎসর পরে ষষ্ঠ

শতাব্দীর প্রথম ভাগে Dionysius Exignus কর্তৃক এই অব্দটি প্রবর্তিত হয় কিন্তু দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ সর্ব সাধারণের সমর্থন পায় নি বা সন হিসাবেও প্রচলিত হতে পারে নি।

কারুর কারুর মতে হিজরী সন ব্যবহার করবার প্রথা হজরতের জীবনকালেই স্থিরীকৃত হয়। এর স্বপক্ষে তাঁরা কতকগুলি হাদীসের উল্লেখ করেন কিন্তু এই হাদীসগুলির সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অন্য একদলের মতে হজরত আবুবকর (রাঃ) এর খেলাফতের সময় ইমেনের গভর্ণর ইয়ালা বিন ওমাইয়া কর্তৃক প্রথম এটি সন হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এরও বিশ্বস্ত কোন প্রমান পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায় দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) ই এটিকে প্রথম ৬৩৮-৩৯ খৃঃ অব্দে সন হিসাবে প্রচলন করেন; এর প্রচলনের কারণও হোল তাঁর শাসন সংস্কার ও রাজস্বের সুব্যবস্থা করবার আগ্রহ।

হজরত ওমর (রাঃ) রাজস্ব আয় ব্যয়ের সুচারুভাবে হিসাব নিকাশ রাখবার ব্যবস্থা করবার মনস্থ করাতেই তারিখের কথা উঠে পড়ে। রাজকীয় কাগজ পত্রাদিতেও তারিখের সমস্যা দেখা দেয়। রাজধানী থেকে প্রেরিত চিঠি পত্রাদিতে তারিখ না থাকার জন্যেও চারিদিক থেকে অভিযোগ আসতে সুরু করে। আলবেরুনীর মতে, এই তারিখ না থাকার জন্যেই আবু মুসা আল আশারী তিরস্কারের ভঙ্গীতে হজরত ওমরকে এক চিঠি লেখেন—"আপনি যে সমস্ত চিঠি পত্র পাঠাচ্ছেন তাতে তারিখের

নাম গন্ধও নাই"। এই ভাবে নানা দিক থেকে তারিখ ও সনের অত্যাবশ্যকতা দেখা দেওয়ায় খলিফা সবাইকে ডেকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ কেউ হজরতের জন্ম তারিখ থেকে একটি সন প্রচলন করবার ব্যবস্থা করতে বললেন কিন্তু প্রস্তাবটি সব্বার মনঃপুত হোল না। হজরত আলী (কঃ) তখন হিজরতের ঘটনা থেকে সন প্রচলন করবার প্রস্তাব করেন। হিজরতের পর থেকেই হজরতের রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ হতে থাকে। প্রস্তাবটিতে সব্বাই সানন্দে সম্মতি দিলেন। ফলে হিজরী সন রাজকীয় সন হিসাবে গৃহীত হওয়ার সিদ্ধান্ত হোল। এই সিদ্ধান্তের তারিখ নিয়েও কিছু কিছু মত ভেদ দেখা যায়। কারুর মতে হিজরতের ষোল বৎসর পরে, কারুর মতে আঠার বৎসর পরে খলিফা এই সিদ্ধান্ত করেন—তবে অধিকাংশের মত হোল সতের বৎসর।

হিজরতের ঘটনার বৎসরকে সনের প্রথম বৎসর বলে ধরা হোলেও তারিখকে কিন্তু বৎসরের প্রথম তারিখ বলে ধরা গেল না। অব্দ প্রচলন হবার পূর্বেই কোরাণ শরীফে দিন পঞ্জী রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—মোহাররম মাসই বৎসরের প্রথম মাস। তাই ৬২২°খৃঃ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর হিজরতের তারিখ হোলেও হিজরী প্রথম সনের প্রথম মাসের প্রথম তারিখ আরম্ভ হোল ৬২২ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুলাই শুক্রবার থেকে।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও ধর্মবিশ্বাসের সূক্ষ্ম পথ দিয়েও অঙ্কশাস্ত্র মুসলিম মনীষীদের জীবনে প্রভাব বিস্তার

করবার প্রয়াস পায়। কোরাণ শরীফের নানা নির্দেশ—"আকাশের চন্দ্র সূর্য হিসাব অনুসারেই চলে" (১) "সূর্য চন্দ্র তাদের নির্দিষ্ট আইন অনুসারেই চলে" (২) (নভোমণ্ডলের) সব কিছু আকাশে সাঁতার কাঁটছে (৩) স্থূলজ্ঞানী অন্ধবিশ্বাসীদের মনে ভাবান্তরের সূচনা না করলেও জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানপিপাসুদের মনে দোলা না দিয়ে পারে না। হজরতের বাণী irrational number $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ এর যথার্থ মূল্য এখন পর্যন্ত শুধু আল্লাই জানেন জিজ্ঞাসু মনকে উদ্ব্যস্ত করে তুলতে বাধ্য।

যা হোক এমনিভাবে ধর্মীয় এবং রাজকীয় উভয় কারণে অঙ্কশাস্ত্র মুসলিম রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলেও প্রথম যুগে বিজ্ঞান হিসাবে এর আলোচনা করবার মত মানসিক অবস্থার সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। অতি আবশ্যকীয় সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু ছাড়া আর বেশীদূর অগ্রসর হবার মত অবসরও আর তাঁদের হয় নাই। পঞ্জিকা ও তারিখের ব্যবস্থা হবার পর হিসাব নিকাশ রাখবার জন্য তাঁরা তৎকালীন প্রচলিত আরবী অক্ষরমালাকেই সংখ্যা হিসাবে ব্যবহার করা সুরু করে দেন। আরবী অক্ষরমালা দ্বারা কি ভাবে সংখ্যা নিরূপিত হোত পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত টেবল থেকেই তা বোঝা যাবে।

নিখুঁত বিজ্ঞান হিসাবে এর মূল্য যাই হোক না কেন এই অপরিস্ফুটতার মধ্যেও অঙ্কশাস্ত্রের সন্নিবদ্ধ নিয়মের পরিচয়

(১) সুরা আররহমান (২) সুরা ইয়াসিন (৩) সুরা ইয়াসিন

১	ا	১০	ی	১০০	ق	১০০০	غ	১০০০০	یغ	১০০০০০	قغ
২	ب	২০	ک	২০০	ر	২০০০	بغ	২০০০০	کغ	২০০০০০	رغ
৩	ج	৩০	ل	৩০০	ش	৩০০০	جغ	৩০০০০	لغ	৩০০০০০	شغ
৪	د	৪০	م	৪০০	ت	৪০০০	دغ	৪০০০০	مغ	৪০০০০০	تغ
৫	ه	৫০	ن	৫০০	ث	৫০০০	هغ	৫০০০০	نغ	৫০০০০০	ثغ
৬	و	৬০	س	৬০০	خ	৬০০০	وغ	৬০০০০	سغ	৬০০০০০	خغ
৭	ز	৭০	ع	৭০০	ذ	৭০০০	زغ	৭০০০০	عغ	৭০০০০০	ذغ
৮	ح	৮০	ف	৮০০	ض	৮০০০	حغ	৮০০০০	فغ	৮০০০০০	ضغ
৯	ط	৯০	ص	৯০০	ظ	৯০০০	طغ	৯০০০০	صغ	৯০০০০০	ظغ

পাওয়া যায়। যেখানেই দুইটি সংখ্যা যুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে সেখানেই তাদের মূল্য হয়েছে গুণন পদ্ধতি অনুসারে।

যেমন

ط=৯ غ=১০০০ طغ=৯০০০

ر=২০০ غ=১০০০ رغ=২০০.০০০

আরবদের মধ্যে সংখ্যা গণনার এই প্রণালী ষষ্ঠ শতাব্দীতেই প্রচলিত হয়। মুসলিম জাতির দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা গণনার মধ্যেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসে পড়ে। বিজয়ী মুসলিম সেনানীগণ গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন এবং হিসাব নিকাশে গ্রীক সংখ্যা ব্যবহার সুরু করেন। শাসকগণও এর প্রভাব থেকে

মুক্তি পান নি। তাঁরাও এর ব্যবহারে সায় দেন। অষ্টম শতাব্দীর একটি রাজস্ব হিসাব পত্রের দলিলে আরবী ও গ্রীক সংখ্যা পাশাপাশি লিখিত দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম মনীষিগণ এর নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করেন বলা যেতে পারে।

অষ্টম শতাব্দী

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে যে ভাঁটা বইতে সুরু করে অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত তাতে আর বিশেষ কোন পরিবর্তনই দেখা দেয় নি। দর্শনের কচ্‌কচানি অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এর উন্নতির পথ আগলিয়ে থাকে। নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামের শিষ্যবর্গ তাঁদের ধর্ম, আচার, ব্যবহার তথা সমাজ সংস্কার নিয়েই মেতে থাকেন—বিজ্ঞানও তাই রুদ্ধ দ্বার থেকে মুক্তি পায় নি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞান চর্চা কিছুই হয় নি। তাঁদের পতনের পর ওম্মীয় বংশের রাজত্ব কালেও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নি বলা চলে। মিশর রাজ খলিফা খালেদ এবনে ইয়াজিদ এবনে মোয়াবিয়া ছাড়া অন্য কেউ এদিকে মন দিয়েছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু খালেদের অনুপ্রেরণাও সুধী সমাজকে বিশেষ অনুপ্রেরিত করতে পারে নি বলে মনে হয়। এমনিতে এই নিরুৎসাহের কারণ বোঝা দুষ্কর। সবে মাত্র যাঁরা উন্নতির পথে পা বেড়িয়েছে; জ্ঞান বিজ্ঞানের নেশায় মেতে উঠেছে; তাদের পক্ষে খলিফা খালেদের অমূল্য বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী ও অনুপ্রেরণা সত্বেও বিজ্ঞানের প্রতি এই ঔদাসীন্য এক অস্বাভাবিকতারই আভাস দেয়। খুব সম্ভব

রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতই এই ঔদাসীন্যের মূল কারণ। হজরত আলী (কাঃ) র বংশের প্রতি ওম্মীয়দের অত্যাচার, কারবালার নৃশংস স্মৃতি সবার উপরে তৃতীয় ইয়াজিদের অমানুষিক প্রজাপীড়ন এই সবগুলো মিলে ওম্মীয় বংশকে মুসলিম সর্বসাধারণের বিরাগ ভাজন করে তোলে। জনমত ওম্মীয় বংশের প্রতি একটি বিরাট বিরাগ ও আন্তরিক ঘৃণার স্তুপ হয়ে দাঁড়ায়। সুধীসমাজও জনগণের ছোঁয়াচ এড়াতে পারেন নি। হয়ত সেই জন্যেই খালেদের অনুপ্রেরণা তাঁদিগকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি।

ওম্মীয় বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশের রাজত্বের সময় এই অবসাদ ভাব কেটে যায়। কুয়াসা কেটে গিয়ে নবীন সূর্যের নব আলোকে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। নৃপতিদের জনপ্রিয়তা ও বিদ্যোৎসাহিতা সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পথকেও উন্মুক্ত করে দেয়। এ ছাড়া এই সময়ে পারসী মাওয়ালাদের আরব বিদ্বেষী কার্যকলাপও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রতি মুসলিম জনগন ও সুধী সমাজকে আগ্রহান্বিত করে তোলে। আব্বাসীয় বংশের উদার শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মাওয়ালাগন শুউব্বী নামে একটি আরব বিদ্বেষী বিদ্বৎ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে; এরা সাম্যবাদী নামেও পরিচিত ছিল। আরব বা নবদীক্ষিত মুসলিমদের সর্ব বিষয়ে হেয় করবার প্রচেষ্টা এদের একমাত্র কার্যে পরিণত হয়। আরব ভক্ত বা নব দীক্ষিত মুসলিমগণ খলিফাদের কার্য-কলাপ দেখিয়ে গর্ব করলে

সাম্যবাদীরা ফেরাউন, নমরূদ, খসরু প্রভৃতি সম্রাটগণের কীর্তি বর্ণনা করে প্রতিপক্ষকে নির্বাক করতে চেষ্টা করত। নবী রসুলের কথা উঠলে একলাখ চল্লিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে মাত্র চারজন (হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত এসমাইল ও হজরত মোহাম্মদ দঃ) আরব বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাদের বিদ্রূপ করতে ছাড়ত না। জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতার কথা উঠলে আরববিদ্বেষীরা গ্রীক, ভারতীয়, মিশরীয় ও পারসী দর্শন বিজ্ঞান জ্যোতিষের নজির উপস্থিত করত—মুসলিমদের এক খোদা দত্ত কোরাণশরিফ ছাড়া নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি প্রসূত কোন কিছুই বলবার থাকত না। শুউব্বীদের এমনিভাবে আরবদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর যে কোন জাতির পক্ষে ওকালতি আরবজাতিকে অন্য সব জাতির চেয়ে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা, নব-দীক্ষিত ও নব ভাবে অনুপ্রেরিত মুসলিমদের মধ্যে এক অপূর্ব আত্মবোধ জাগিয়ে তোলে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য সুধীসমাজের মনে এক অদম্য-মানসিকতার উদ্ভব হয়। নৃপতিদের বিদ্যোৎসাহিতা এতে ইন্ধন যোগায়। ফলে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলিফা আলমনসুর বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর সময় থেকেই সর্বপ্রথম মুসলিম মনীষিগণ কর্তৃক সুশৃঙ্খল ও সুসন্নিবদ্ধভাবে বিজ্ঞান আলোচনা সুরু হয়।

খলিফা আলমনসুর (৭৫৪—৭৭৫)

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম পারে বাগদাদ নামীয় এক বড় গ্রামে খলিফা আলমনসুর তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এর রাজকীয় নাম রাখা হয় মদিনা-তুস-সালাম। খলিফাদের মুদ্রাতে এবং রাজকীয় কাগজ-পত্রাদিতেই এই নূতন নাম ব্যবহৃত হোত, কিন্তু এখানকার অধিবাসীগণ সে নাম গ্রহণ করেন নাই। রাজকীয় নাম শুধু রাজকীয় কাগজ-পত্রাদিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, বাইরে যথাপূর্ব বাগদাদ নামে পরিচিত হতে থাকে। খলিফার প্রদত্ত নাম গ্রহণ না করলেও, তাঁর অন্য গুণাবলীর সম্মান করতে এর এতটুকুও শৈথিল্য আসে নাই। ফলে তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা অতি সহজেই সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজসভা দেশ-বিদেশের বিখ্যাত বিদ্বানগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। তাঁদের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারক, কবি, জ্যোতির্বিদ, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক,—এক কথায় তখনকার দিনের সর্ববিদ্যাবিশারদগণেরই উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। নগরীর নকশা হয় নও বখত নামক একজন পারসী এবং মাশাআল্লাহ্ নামক ইহুদী জ্যোতির্বিদের পরামর্শ অনুসারে।

আলমনসুরের রাজসভার বৈজ্ঞানিকগণের অন্যতম আবু ইসহাক আল ফাজারী, নানা কারণে তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তন্মধ্যে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা

অন্যতম এবং এইটিকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজেও তৎকালে জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র (astrology) এবং দিনপঞ্জী নিরূপণ করবার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলি, খুবই উচ্চাঙ্গের, অবশ্য তৎকালীন বিজ্ঞানের আদর্শ হিসাবে। যতদূর

আবু ইসহাক আল ফাজারী

জানা যায় মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম, সমুদ্রে সূর্য ও নক্ষত্র সমূহের উচ্চতা নির্ণয় করবার যন্ত্র আস্তারলব (astrolabe) নির্মাণ করেন এবং অঙ্ক-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পুস্তকও প্রণয়ন করেন। এ সমস্ত ছাড়াও অঙ্কশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। Armillery Sphere সম্বন্ধে তাঁর প্রণীত গ্রন্থ, গণিতে তাঁর উচ্চজ্ঞানের কথা আজও জগতে বিঘোষিত করছে। এখনও এর অনেক বিষয়ই প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। আরবদের বর্ষ গণনার নিয়ম-পদ্ধতি এর পূর্বে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াবদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না, আলফাজারীই সর্বপ্রথম আরব বর্ষগণনা সুনিয়ন্ত্রিত করে দিনপঞ্জী প্রণয়ন করেন। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গৌরব কাহিনী এর পূর্বেই জনশ্রুতি হিসাবে, মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। তবে সত্যিই এর মধ্যে কি আছে, সে সম্বন্ধে তাঁদের স্পষ্ট কোন ধারণা তখন পর্যন্ত গড়ে উঠে নাই। এই সময় আলমনসুরের বিদ্যোৎসাহিতার সুযোগ নিয়ে, নিজেদের

জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করবার উপায় ঠাওরাতে তাঁদের বিলম্ব হল না। প্রধানতঃ আলফাজারীর উৎসাহে ভারতের তদানীন্তন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কঙ্ক বা কঙ্কায়ন (কারুর কারুর মতে এই জ্যোতির্বিদের নাম হল মঙ্ক) ভারতের জ্ঞান সাধনার পরিচায়ক 'সিন্দহিন্দ' নামক গ্রন্থ আলমনসুরের সভায় আনয়ন করেন। 'সিন্দহিন্দ' খুব সম্ভব সূর্যসিদ্ধান্ত কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নামীয় কোন গ্রন্থ। অনেকের মতে ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্তই 'সিন্দহিন্দ' নামে পরিচিত এবং এরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৫৪ হিজরীতে (৭৭১ খৃঃ অব্দে) বাগদাদে আনীত হয়। তবে এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য কিছুই পাওয়া যায় না। সিন্দহিন্দ ছাড়া আরকণ্ড বা খণ্ডখাণ্ডক এবং আর্যভট্ট (আল আরজাওয়াদ বা আল আরজাওয়ার) নামীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও এই সময়েই বাগদাদে আনীত হয় এবং আরবীতে অনূদিত হয়। যা'হোক, ফল কথা এই সময় থেকে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়ে। যতদূর সম্ভব বাদশাহদিগকে প্ররোচিত করে ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে তথাকার বৈজ্ঞানিকগ্রন্থসহ বাগদাদে আনয়ন করবার এবং সেই সমস্ত বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করবার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। আলফাজারীর উৎসাহ এতে ইন্ধন যোগায়। আলফাজারীর পূর্ণ নাম হোল আবু ইসহাক ইব্রাহিম এবনে হাবিব, এবনে সোলায়মান এবনে সামোরা এবনে জোন্দাব আল ফাজারী। ৭৭৭ খৃঃ অব্দে এই উৎসাহী বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন।

পিতার বিদ্যোৎসাহ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পুত্রের উপর কদাচিৎ বর্ষে। আলফাজারীর বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে এব্রাহিম এবনে হাবিব আল ফাজারী, পিতার জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হয়েছিলেন। পিতার উৎসাহে আনীত 'সিন্দহিন্দ' গ্রন্থখানি খলিফা আলমনসুরের আদেশ অনুযায়ী ৭৭২-৭৭৩ খৃঃ অব্দে তিনিই আরবীতে অনুবাদ করেন। আলবেরুনীর মতে এর পূর্বেই ৭৭০-৭১ খৃঃ অব্দে সিন্দহিন্দের অনুবাদ হয়। তিনিও দ্বিতীয় ফাজারীর অনুবাদের কথাই উল্লেখ করেছেন কিনা ঠিক বলা যায় না। যা হোক এই অনুবাদখানির কোন সন্ধানই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। খুব সম্ভব এখানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতীয় অঙ্ক লিখন প্রণালী ঠিক কখন কিভাবে মুসলিম জগতে প্রবেশ লাভ করে সে বিষয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এই অনুবাদখানিই সে বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে এবং যতদূর মনে হয় এরই প্রভাবে ভারতীয় প্রণালী ধীরে ধীরে মুসলিম মনীষীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁর পিতা আবু ইসহাক আল ফাজারী জ্যোতিষ সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করেন কিন্তু অনেকে এটিকে পুত্রের রচিত বলেই মনে করেন। দ্বিতীয় ফাজারীও পিতার ন্যায় অসাধারন পণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁরও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরই সিন্দহিন্দের অনুবাদের উপর ভিত্তি করে আলখারেজমি বা মোহম্মদ এবনে মুসা আলখারেজমি তাঁর বিখ্যাত

দ্বিতীয় ফাজারী

জ্যেতির্বিজ্ঞান ফলক (astronomical table) 'ফি-জিজ' প্রণয়ন করেন। আবু আবদুল্লাহ ৭৯৬-৮০৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সঠিক তারিখ জানা যায় না।

ইয়াকুব এবনে তারিক নামক একজন পারসী বৈজ্ঞানিকও এই সময় খলিফার বিদ্বান সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনিও তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের মতই জোতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষের দিকেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষে অন্ততঃ অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম সূচনায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের এক অসাধারন আসক্তি দেখা যায়। অসীম আকাশের অগণ্য নক্ষত্ররাজি চিরকালই মানুষের মনকে আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করেছে, বৈজ্ঞানিকগণও সে আকর্ষণ থেকে বাদ পড়েন নাই। তাঁরাও গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির সঙ্গে মানুষের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, এই সবের অনুসন্ধানে রত হন। আলমনসুরের বিদ্বান সভায় ৭৬৭ খৃঃ অব্দে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কঙ্কের সঙ্গে ইয়াকুব এবনে তারিকের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। খুব সম্ভব তাঁরই অনুপ্রেরণায় তারিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে মন দেন। ফলে ৭৭৫ খৃঃ অব্দে বা তৎসময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং দিনপঞ্জী সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সিন্দহিন্দ অনুবাদে দ্বিতীয় ফাজারীর সাহায্যকারী হিসাবেও তিনি পরিচিত। শুধু অনুবাদে সাহায্য করাই নয় এই অনুদিত গ্রন্থখানির সম্পাদনাও তাঁরই কৃত। এছাড়া গোলক (sphere),

ইয়াকুব ইবনে তারিক

কারদাজার* বিভাগ এবং সিদ্ধান্তের মর্মানুযায়ী জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলক নির্মান সম্বন্ধেও তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোলক সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ৭৭৭ খৃঃ অব্দে রচিত হয়। ৭৯৬ খৃঃ অব্দে এই পারসী বৈজ্ঞানিক এন্তেকাল করেন।

খলিফা আলমনসুরের বিদ্বান-সভার আর কয়েক জন সভ্যের নাম না করলে তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন বা সম্রাট আকবরের নওরতনের ন্যায় তিনি তাঁর বিদ্বান-সভাকে, সভ্যবৃন্দের সংখ্যা নিয়ে, কোন নাম দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না; তবে নাম না দিলেও তাঁর সভায় নবরত্ন কেন নবরত্নের চেয়ে অনেক বেশী রত্নেরই সমাবেশ ছিল। ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় যাঁরা আলোচনা করতেন তাঁদের বাদ দিলেও শুধু বিজ্ঞানের যাঁরা চর্চা করতেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। ইসহাক আলফাজারী, ইয়াকুব এবনে তারিক ছাড়া, আবু ইয়াহিয়া আল বাতরিক, মাশাআল্লাহ প্রভৃতি আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক খলিফার সভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবু ইয়াহিয়া ছিলেন একজন চিকিৎসক। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুস্তকই তিনি প্রণয়ন করেন। বিশুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের চর্চাতেও তাঁর দান বিশেষ উপেক্ষণীয় নয়।

---

* ভারতীয়-বৈজ্ঞানিকদের দেখাদেখি মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণও প্রথম প্রথম প্রত্যেক বৃত্তকে ৯৬ ভাগে ভাগ করতেন। এর প্রত্যেক ভাগের শিঞ্জিনীকে (sine of each of these parts) কারদাজা নামে অভিহিত করা হোত।

তিনি গ্রীক বৈজ্ঞানিক টলেমির (Ptolemy) টেট্রাবিবলস (Tetrabiblos) গ্রন্থখানি অনুবাদ করে, তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন এবং অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। শুধু অনুবাদেই তাঁর খ্যাতি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে নাই। জ্যোতির্বিদ হিসাবেও তিনি পণ্ডিত সমাজে বিখ্যাত ছিলেন। দ্বিতীয় ফাজারীর সিন্দহিন্দ এবং আবু ইয়াহিয়ার ট্রেটাবিবলসের অনুবাদ বিদেশীয় বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। সিন্দহিন্দের চেয়ে টেট্রাবিবলসই বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয় : এর পর মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান আলোচনার মধ্যে গ্রীক বিজ্ঞানের প্রভাবই বেশী দেখা যায়।

আবু ইয়াহিয়া আল বাতরিক

সর্বসাধারণের মত নৃপতির মনের উপরও জ্যোতিষের প্রভাব তখন খুব কম ছিল না। খলিফা আলমনসুরও এর প্রভাব থেকে মুক্তি পান নি। এমনিতে নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও ইসলামে নিষিদ্ধ জ্যোতিষ আলোচনা করতে তাঁর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি লগ্ন ও শুভমূহুর্ত বিচার না করে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। আলনওবখত ছিলেন তাঁর দরবারী জ্যোতিষী। জ্যোতিষবিদ্যাতে যে নওবখত বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে প্রগাঢ় আলোচনাও করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত "কিতাবুল আহকাম" গ্রন্থে। এই জ্যোতিষ বিদ্যা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তিনি সুদক্ষ পণ্ডিত বলে বিখ্যাত ছিলেন।

তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার পরিচয় পাওয়া বাগদাদের ভিত্তি স্থাপনের মধ্যে। অবশ্য বাগদাদের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয় খালেদ এবনে বারমাকের নির্দেশ অনুযায়ী। আল নওবখত ৭৭৬-৭৭ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

আল নওবখতের মত মাশাআল্লাহও তখনকার দিনে বিজ্ঞান আলোচনায় বিখ্যাত ছিলেন। বাগদাদের ভিত্তি স্থাপনের জন্য নওবখতের সঙ্গে তাঁরও ডাক পড়ে এবং এতে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নৃপতির প্রিয় পাত্রে পরিগণিত হন। এছাড়া তিনি ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র (astrology), সূর্য ও নক্ষত্র সমূহের উচ্চতা নির্ণয় করবার যন্ত্র (astrolabe) এবং বায়ুবিজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর astrolabe এর উপর নির্ভর করেই দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—রবির-বেন-এজরা এ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করে যশস্বী হন। নবম শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলফ্রাগানেসের কার্যাবলীতেও এঁর প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এই সমস্ত ব্যতীত তাঁর মূল্য নিরূপায়ক গ্রন্থাবলী (Demercibus), এ সম্বন্ধে আরব বৈজ্ঞানিকদের সর্ব প্রথম গ্রন্থ। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অনুবাদক জোহানেস-ড্য-লুনা হিস্‌পালেনসিস্ (Johannes De Luna Hispalensis) মাশাআল্লাহর কতকগুলি গ্রন্থ লাটিনে অনুবাদ করেন। তাঁর বহু গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরবীতে শুধু একখানারই এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অন্যগুলোর পরিচয়

মাশাআল্লাহ

পাওয়া যায় লাটিন এবং হিব্রু অনুবাদের মধ্য দিয়েই। মধ্য যুগে তাঁর সব চেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ ছিল De scientia motus orbis জিরার্ড কতৃক এখানি অনুদিত হয়। ১৫০৪ এবং ১৫৪৯ খৃঃ অব্দে নিউরেমবার্গে মুদ্রিত "সপ্তবিংশতি" নামক আরবী গ্রন্থের অনুবাদই খুব সম্ভব De scientia motus orbis নামে পরিচিত। এর দ্বিতীয় সংস্করনের নাম দেওয়া হয়েছে De elementis et orbibus Coelestibus এখানি ২৭ পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

অনেকের মতে মাশাআল্লাহ জাতিতে ছিলেন মিশরী ইহুদী। এ ধারণার ভিত্তি কতটা দৃঢ় সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে ; তবে তিনি ইহুদীই হন আর মুসলমানই হন তাতে বেশী কিছু আসে যায় না। মুসলিম নরপতিদের সহায়তায় এবং তাঁদের উৎসাহে যে তিনি বিজ্ঞান সাধনার অবসর ও সুযোগ পান, এবং পরিপূর্ণ চিত্তে বিজ্ঞান আলোচনায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। ইসলামের প্রথম যুগে যখন ধর্মের গোঁড়ামি সমস্ত ধর্মভক্ত মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করা উচিত ছিল এবং কার্যতও গোঁড়ামি ভাবটা বেশী দেখা যেত তখনও যে ধার্মিক মুসলমান বাদশাহগণ মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকেও তাঁদের আশ্রয়ে এবং সাহায্যে বিদ্যালোচনার বিশেষ করে বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ করে দিতেন, এতে তাঁদের উন্নত মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই সময়কার এই অপক্ষপাত আচরন সত্যই বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের আলোচনা যে ধর্মের

গণ্ডীর বাইরে নয়, এ সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে তখনকার দিনে কতখানি মনের জোর থাকা উচিত তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই বিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য ইউরোপেও শুধু জাতীয় উন্মাদনার (ধর্মের উন্মাদনা বা গোঁড়ামী একে বলা চলে না, ধর্মের গোঁড়ামী বলে এদের কিছু নাই) জন্য জগৎ বিখ্যাত আইনষ্টাইনকেও নিজের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে অন্য দেশের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, অথচ যখন, বলতে গেলে ধর্মের গোঁড়ামীই সমস্ত মুসলিম সমাজকে পরিচালিত করছিল তখনও মুসলমান নৃপতিগণ ইহুদী, ক্রিশ্চিয়ান প্রভৃতি মুসলমানের শত্রুদেরও বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য মুসলমানদেরই মত অপক্ষপাত ভাবে সাহায্য করছিলেন। খলিফা আলমনসুরের সময় ধর্মের প্রভাব কতটা ছিল তা এক কথাতেই বুঝা যাবে যে তখন এমাম আবু মোহাম্মদ জাফর ছাদেক এবং এমাম আবু হানিফা জীবিত ছিলেন। মুসলিম নরপতিদের বিদ্যালোচনায় এই অপক্ষপাত কার্যের ফলেই আজও সমস্ত জগৎ গ্রীক, রোম, মিশর ও ভারতের পূর্বেকার যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিচয় পেয়ে থাকে। যদি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত তাঁরাও ধর্মের নিগূঢ় উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেদের ধর্মকেই জগতে বড় করে প্রচার করবার চেষ্টা করতেন এবং প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অধার্মিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে উপেক্ষা করতেন, তা'হলে রাজনীতি হিসাবে তাঁদের কোন্ দোষই দেওয়া যেতে পারত না। তাতে হয়ত মুসলিম প্রতিষ্ঠিত স্পেন আজ মুসলমানশূন্য স্পেনে পরিণত

হোত না বরং মুসলমানশূন্য ইউরোপ ক্রিশ্চিয়ানশূন্য ইউরোপে পরিণত হোত, গ্রীক বিজ্ঞানের নামগন্ধও কেউ জানত না। কিন্তু তা হয় নাই বরং তাঁরাই পুরাকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নূতন করে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। Prof. H. A. Salmon তাঁর Rise and Fall of the Arab dominion এ বলেছেন "The Arabs were the first to introduce Greek writers to the notice of the world. They kindled the lamp of learning which illuminated the dark pages of history and it may be safely assumed that were it not for the Arabs, it would have been long before Europe, the present centre of civilisation and progress, would have been irradiated by the bright light of knowledge." তিনি গ্রীকদের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, ভারতের সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। ভারতবর্ষে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা হয়েছিল সে কথা ইউরোপ জানতে পারে আরবদের মধ্যস্থতায়। আরবদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রচারিত হয়, তবুও সে দিন পর্যন্ত ইউরোপ ভারতের এ দানের কথা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে নাই, বরং একে আরবদের মৌলিক অবদান বলেই ধরে নিয়েছিল।

৮১৫ কি ৮২০ খৃঃ অব্দে (সঠিক তারিখ জানা যায় নি) মাশাআল্লাহ পরলোক গমন করেন। এ হিসাবে তাঁকে

নবম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের পর্য্যায়ে ফেললেই হয়ত ঠিক হোত। তবে তাঁর জীবনের বিখ্যাত কার্যাবলী এবং খলিফা আলমনস্থুরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করে তাঁকে অষ্টম শতাব্দীর পর্য্যায়ভুক্ত করাই হয়ত সঙ্গত হবে। সেই জন্যই তাঁকে অষ্টম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের পর্য্যায়ভুক্ত করা গেল।

নবম শতাব্দী

ধর্মে ভক্তি যে বিজ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করতে বা ঘৃণার চোখে দেখতে শেখায় না; বরং যাঁরা ধার্মিক তাঁরাও ধর্মের প্রতি কোন ত্রুটি না করেও যে বিজ্ঞানের সমাদর করতে পারেন, সে বোঝা যায় ধার্মিক মুসলিম সুধীদের বিজ্ঞানের আলোচনা করা দেখেই। বিজ্ঞান ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা শেখায় বা নাস্তিকতার আশ্রয় দেয় সাধারনতঃ এরূপ মনে হলেও আসলে তা নয়। তেমনি ধর্মের গোঁড়ারা যে বিজ্ঞানের চর্চাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেন সেরূপ করবারও কোন কারণ নাই। আব্বাসীয়-বংশের নরপতিদের (দু একজন ছাড়া) ধর্মের প্রতি অনুরাগের মধ্যে যেমন বিশেষ ত্রুটি-বিচ্যুতির নজির পাওয়া যায় না, তেমনি আবার তাঁদের উৎসাহে বর্ধিত তখনকার বিজ্ঞানের উন্নতির কথাও অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক ওছনার সত্য সত্যই বলেছেন, "We see for the first time, perhaps in the history of the world, a religious and despotic Government attached to Philosophy and pertaking its triumphs." Philosophy অর্থে শুধু দর্শন বুঝলে ভুল হবে। তখনকার দিনে বিজ্ঞানকেও Philosophyর মধ্যে ফেলা হত। ওছনারের Philosophyও বিজ্ঞানকে অনুবর্তী

করেই। ওম্মীয় বংশের ধর্মহীন যথেচ্ছাচারিতার পরে আব্বাসীয়দের আমলে ইসলামের অনুশাসন প্রবর্তন সুরু হয় প্রধানতঃ এমাম চতুষ্টয়ের প্রচেষ্টায়। স্বেচ্ছাচারিতার পরে আইনের বন্ধন আবার যখন আরম্ভ হয় তখন তার মধ্যে থাকে গোঁড়ামিরই প্রাচুর্য। এ সময়েও তার হুর্তি অভাব হয়নি কিন্তু এই গোঁড়ামি বিজ্ঞান আলোচনার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই। ফলে অষ্টম শতাব্দীতে বিজ্ঞান আলোচনার যে ভিত্তি স্থাপিত হয় নবম শতাব্দীতে তাব কাজ চলতে থাকে পূর্ণ উদ্যমে। পরিপূর্ণ জোয়ারের উদ্বেলতা তখন সমগ্র মসলিম সুধী সমাজকে পেয়ে বসেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় তাঁরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে নৃপতিদের বিদ্যোৎসাহিতা ও বিদ্যানুরাগ। খলিফা হারুন-অর-রশিদের সুশাসনের ব্যবস্থার সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, মুসলিম মনীষীদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা যোগায়; এর পরে এসে দেখা দেয় খলিফা আলমামুনের বিদ্যোৎসাহিতা ও বিজ্ঞান আলোচনা। ইসলামিক শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রতি তাঁর অধৈর্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও অন্যদিকে উদার মতাবলীর জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা চলতে থাকে আরও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে। তাঁর রাজত্বে মুসলিম সুধীদের চেয়ে অমুসলিম পণ্ডিতেরাই বেশী আদর ও উৎসাহ পান। খলিফা আলমুতাসিমও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। খলিফা আলমুতওয়াক্কিলের সময় অমুসলিমদের প্রতি এই অতি অনুরাগে ভাঁটা পড়লেও বিজ্ঞান আলোচনা পূর্ববৎ

চলতে থাকে বরং অনেক বিষয়েই পূর্বের চেয়ে আরও বেশী উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। মুসলিম জগৎ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা হয়নি বললেও চলে।

ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞান উভয়ই মুসলিম মনীষীদের সমান আদর পেতে থাকে। প্রথমটির কারণ হোল খলিফা হারুণ-অর-রশিদের অনুরক্তি, দ্বিতীয়টির কারণ হোল খলিফা আল মামুনের উৎসাহ। মুখ্যতঃ এই নৃপতিদ্বয়ের আগ্রহে বহু ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞান, দর্শন গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত হয়। শুদ্ধ অনুবাদেই এই উদ্দীপনার পরিসমাপ্তি হয় নাই। নব নব মৌলিক অবদানে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নব নব অধ্যায় সংযোজিত হতে থাকে।

অঙ্কশাস্ত্রে এই শতাব্দীতে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় তা সত্যই বিস্ময়কর। এর সমস্ত শাখারই এই সময়ে অসাধারন উন্নতি হয়। এই উন্নতির মূলে ছিল মুসলিম নিউটন আলখেরজমির মনীষা ও বিজ্ঞান প্রতিভা। প্রকৃত অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে জ্যোতিষের প্রভাব আপনিই ম্লান হ'য়ে আসে এই শতাব্দীতেই তার সম্যক নিদর্শন পাওয়া যায়। শতাব্দীর শেষের দিকে জ্যোতির্বিদদের সংখ্যা বিরল হ'তে বিরলতর হ'তে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞান মৌলিক অবদানে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬—৮০৯)

খলিফা আলমনস্থরের পর বিদ্যোৎসাহিতার জন্য যাঁর নাম সুপরিচিত তিনি হলেন তাঁর পৌত্র হারুন-অর-রশিদ। মনস্থর তনয় মোহাম্মদ মেহেদী উদার প্রকৃতি, দয়াপ্রবণ ও শান্তিপ্রয়াসী নরপতি হিসাবেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। তিনি বিদ্যালোচনায় বিশেষতঃ বিজ্ঞান আলোচনায় কোন্ অংশ গ্রহণ করেছিলেন বা কতটুকু সাহায্য করেছিলেন সে তথ্য এখনও সম্যক অবগত হওয়া যায় নাই। তবে পিতার সময়কার প্রদীপ্ত জ্ঞানশিখা যে নির্বাপিত হয় নাই বরং পূর্বের মতই চলছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পুত্র হারুন-অর-রশিদের সময়কার বিজ্ঞান চর্চা থেকেই।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ (Aaron, the Just) প্রাচ্য পাশ্চাত্যে যেমন ভাবে পরিচিত তেমন বোধহয় আর কোন নরপতিই পরিচিত নন। বাগদাদ বলতেই হারুন-অর-রশিদের কথা মনে পড়ে, আরব্য উপন্যাসের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মনের স্মৃতি-পটে ভেসে উঠে এক নয়নাভিরাম সুসজ্জিত হর্মাবলীশোভিত সুদৃশ্য নগরী, মর্ত্যে সর্গের নন্দন কানন। দুঃখহীন, ব্যথাহীন, অপত্য-স্নেহে প্রতিপালিত প্রজাপুঞ্জ নিয়ে রাজত্ব করবার প্রবাদ, এক হারুন-অর-রশিদ ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন নৃপতির ভাগ্যে জুটে নাই। হারুন-অর-রশিদের

নামের সঙ্গে বাগদাদ এমন সুখস্বপ্ন বিজড়িত থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে, তখনকার বাগদাদ পরবর্তীকালের অবিখ্যাত নৃপতিদের আমলের বাগদাদের মত সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত ছিল না। আকার এবং সজ্জার দিক দিয়ে খাট হলেও এর এই সময়কার দান সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করেছে। এ সময়ে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা পুনরায় প্রবল ভাবে আরম্ভ হয়। বারমাক বংশীয় মন্ত্রীগণ এই সময় রাজ্য পরিচালনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বালখ প্রদেশ থেকে আগত এই বংশ পূর্বথেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁদের কোন এক পূর্বপুরুষ বালখের বৌদ্ধ মন্দির নওবিহার বা নববিহারের কার্যে নিযুক্ত থাকা কালীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। তখন থেকেই বারমাক বংশ এই প্রাচ্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অসাধারন অনুরাগী ছিলেন।

হারুন-অর-রশিদ

হারুণ-অর-রশিদের রাজত্বকালে, সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পুনর্বার ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন এবং তথাকার বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে বাগদাদে আনয়নের ব্যবস্থা করেন। ভারতের পণ্ডিতদের প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা এই সময়ে মুসলিম সমাজে কত বেশী হয়ে পড়েছিল সে বোঝা যায় রাজকীয় হাসপাতালে (দারুস-সিফা) প্রধান চিকিৎসকের পদে একজন ভারতীয় চিকিৎসক নিয়োগেই। এই ভারতীয় চিকিৎসকের (কবিরাজ) আরবী বিকৃত নাম হোল ইবন-ই-দহন। খুব সম্ভব

এঁর নাম ধনিন। শুধু বিদ্বৎ সমাজ নয় বাদশাহ নিজেও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠেন। তিনি নিজে রীতিমত সংস্কৃত চর্চা করতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এই অমোঘ প্রভাবের মধ্যে শুধু ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি, ফলিত জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতিই বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছিল। শুদ্ধ গণিতশাস্ত্রের তেমন চর্চা হয়েছিল বলে মনে হয় না। গ্রীকবিজ্ঞানের প্রতিও তত মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই। মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে এই সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যেরই আদর হয়েছিল বেশী রকমে। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুবাদ থেকেই তখনকার বিজ্ঞানবিদ্‌দের বিজ্ঞানের এই বিভাগের প্রতি যা একটু আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বীজগণিত এবং অন্যান্য শাখার প্রতি তাঁদের যে কতদূর দৃষ্টি পড়েছিল সে কথা সঠিক জানা যায় না। তবে বোধ হয় খুব বেশী নয়।

এর পূর্বে ইউক্লিডের জ্যামিতি ইউক্লিডের গ্রন্থাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর জ্যামিতির কোন আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নাই। বলতে গেলে খলিফা হারুন-অর-রশিদের রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির সমাদর ত হয়ই নাই বরং অঙ্কশাস্ত্রবিদগণ একে যেন অনেকটা উপেক্ষার চক্ষেই দেখে আসছিলেন। আস্তে আস্তে তাঁর প্রতিভার কথা জগৎ বিস্মৃত হতে থাকে। খৃঃ পূর্ব তিন শত বৎসর আগে অঙ্কশাস্ত্রের উপর ইউক্লিডের যে অমোঘ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাঁর মৃত্যুর পরে সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় শুধু কতকগুলো চামড়ার

কাগজে লিখিত শুকনো পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পরে যে তিনি আর পরবর্তী অনেককাল পর্যন্তই বিদ্বৎ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন নাই, সে তাঁর জন্ম স্থানের অনিশ্চয়তার মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি গ্রীক অথবা মিশরী সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছুই নির্ণীত হয় নাই। দুকুল বজায় রাখবার জন্যে অনেকেই বলেন তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন বটে, তবে তাঁর কার্যস্থান হয় আলেকজেন্দ্রিয়ায়। এথেন্সে কিছুকালের জন্য বিদ্যাভ্যাসের প্রবাদকেও কেউ কেউ নিঃসন্দেহ সত্য বলে স্বীকার করেন। যাঁকে এমনি উপেক্ষা করা হয়েছিল, তাঁকে ছাড়া আজকার সভ্য জগতের সভ্যতা, বিজ্ঞান একপাও চলতে পারে না; এ অবিসম্বাদীরূপে স্বীকার্য। তখনকার দিনের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মত ইউক্লিডের গ্রন্থও চামড়ার কাগজে ছোট ছোট পুস্তকাকার খণ্ডে (Biblia βιβλια বা Bibles) লিখিত হয়ে ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে কেউ সেগুলো খুলে দেখেছিল বলে মনে হয় না। যতদূর জানা যায় এ সম্বন্ধে প্রথম অনুসন্ধান হয় হারুন-অর-রশিদের রাজত্বকালে। এই সময়েই ইউক্লিডের জ্যামিতির কতকাংশ আরবীতে অনুদিত হয়। আল হাজ্জাজ এবনে ইউসুফ এই অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন এবং প্রথম ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ কার্য সমাপ্ত করেন।

ইউক্লিড

শুদ্ধগণিতশাস্ত্র হিসাবে না হলেও সমষ্টিগতভাবে এই সময়কার বিজ্ঞান আলোচনাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরনীয় করে

রেখেছে অমর কীর্তিমান জাবির এবনে হাইয়ানের* (৭২২—৮১৩) কার্যাবলী। তিনি ছিলেন প্রধানত রাসায়নিক। মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক এবং বর্তমান রসায়ন বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা হিসাবেই তিনি পরিচিত। কিন্তু এই রসায়নের গবেষণার মধ্যেও গণিতশাস্ত্র তাঁকে দোলা না দিয়ে ছাড়ে নি। শুদ্ধ গণিত-আলোচনায় আস্তারলব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গেই তাঁর নাম বিজড়িত।

* গ্রন্থকারের "মুসলিম বৈজ্ঞানিক জাবির এবনে হাইয়ান" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

খলিফা আলমামুন (৮১৩-৮৩৩)

খলিফা আলমনসুরের রাজত্বকালে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্য আরম্ভ হয়। তাঁর প্রপৌত্র আলমামুনের সময় সে কার্য আরও পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে আলমামুনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাজত্বকালের প্রথম অংশে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকেও যে তাঁর জ্ঞান পিপাসা নির্বাপিত হয়ে পড়ে নাই, সে বিষয় শান্তির সময়ের বিদ্যোৎসাহিতার পরিমান দেখেই সম্যক্‌ভাবে বোঝা যায়। খলিফা আলমনসুরের রাজত্বকালে যে জ্ঞানরশ্মি প্রজ্বলিত হয়েছিল, আলমামুনের সময় সেই রশ্মি শত সহস্রগুণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কাব্য ও দর্শনের কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের বাস্তবতার আলোচনার মধুর সমাবেশ, এই সময় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। বিদ্বান, দার্শনিক, ও বুদ্ধিমান নরপতি হিসাবে আলমামুন ইতিহাসে বিখ্যাত। নিজে বিদ্বান, এবং বিদ্যোৎসাহী, বিদ্যার ও বিদ্বানের সমাদর যে তিনি করবেন এতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বস্তুত আলমামুনকে শুধু 'আরবীয় আগষ্টাস', বলে, অভিহিত করলেই তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। নরপতিগণের জীবন যে সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের উন্নতিকল্পেই উৎসর্গিত হওয়া উচিত, খোদার বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসাবেই যে তাঁদের দুনিয়ায় আগমন, এবং নৃপতিজীবনের সেই মহান ব্রত সাধন যে একমাত্র শিক্ষাবিস্তার

দ্বারাই হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সর্ব সময়েই সচেতন ছিলেন। বিজ্ঞান সাধনায় তাঁর অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সভাগৃহে সমাবিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যা থেকেই। পিতামহ আলমনস্থর বিদ্বান সভার কোন নাম না দিলেও পৌত্র সে ক্রটিকে সেরে দিয়েছেন। তাঁর বিদ্বান সভার নাম ছিল বয়তুল-হিকমা (Academy of Sciences)। শুধু নামেই যে এর কার্যকলাপ পর্যবেশিত হয় নাই, সে বিষয় বোঝা যায় আলমামুনের সময়কার বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতিতে। হাজ্জাজ এবনে ইউস্থফ কর্তৃক ইউক্লিডের অনুবাদ আরম্ভ হয় খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়, কিন্তু তাঁর সময়ে এ অনুবাদ কার্য সমাপ্ত হয় নাই। তদীয় পুত্র আলমামুনের উৎসাহ, হাজ্জাজকে অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করার অনুপ্রেরণা দান করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান তখনকার অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমাদরের ছিল। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির গতিবিধি ইত্যাদি মানুষের মনে চিরকালই এক অদম্য ঔৎস্থক্য জাগিয়া রেখেছে, তা ছাড়া ভবিষ্যৎ জানবার জন্য এক উদ্দাম আগ্রহও প্রত্যেকের মনে চিরজাগরুক। মানুষের মনের গোপন কোণের এই দুর্বলতা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি এক উৎকট আগ্রহ, প্রথমাবধি অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতিতে রস সিঞ্চন করে এসেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। আলমামুনের সময়ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা পুরা মাত্রায়ই চলছিল। তিনি নিজেও জ্যোতির্বিজ্ঞান

সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী ছিলেন, এবং চর্চাও করতেন। এই উৎসাহ ও আগ্রহই মূর্ত হয়ে উঠে বাগদাদের আল সামসিয়া মহল্লার জুনদিশাহপুর এবং দামস্কাসের ২-২½ মাইল উত্তরে কাসিয়াম পর্বতের মানমন্দির তৈরীর মধ্যে। শুধু মানমন্দির নির্মাণ করেই তাঁর নিজের জানবার আগ্রহটা ঝিমিয়ে পড়ে নাই। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও মানমন্দিরে বসে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করতেন সাধারণ বিজ্ঞানসেবীদের মতই। গ্রীক গ্রন্থাদি সংগ্রহ ব্যাপারে তাঁর যে অপরিসীম বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় সে সত্যই বিস্ময়কর। শুধু পুরাণ গ্রন্থাদি বা হস্তলিখিত পুঁথি সমূহ সংগ্রহের জন্যই তিনি থাইজেনটাইন সম্রাট লিও (Leon the Armenian 813-820)র নিকট অনেকটা হীনতা স্বীকার করেই একটি মিশন প্রেরণ করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য এমনি আগ্রহ দেখালেও ইসলামিক শাস্ত্রনীতির প্রতি তাঁর অধৈর্য সত্যিই অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচায়ক। তিনি ছিলেন গোঁড়া মুতাজলীয় মতাবলম্বী। এই গোঁড়ামিতেই শেষ হয় নি। পদমর্য্যাদার সুযোগ নিয়ে তিনি শক্তি প্রয়োগে ধার্মিক মুসলমানদিগকে এই মতবাদ স্বীকার করিয়ে নিতে বাধ্য করবার প্রচেষ্টা করেন। যাঁরা তাঁর মতাবলম্বী হ'তে স্বীকৃত হন নি তাঁদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করতেও কুণ্ঠিত হন নি। বস্তুতঃ তিনি একাধারে মুক্তবুদ্ধি, উদারমত এবং অধৈর্যের প্রতিমূর্তি। ধর্মভক্ত মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার

করলেও খৃষ্টান, ইহুদী বা অন্যান্য অমুসলিমদের প্রতি তাঁর অনুরাগের অন্ত ছিল না।

গ্রহনক্ষত্রাদির সমস্ত ব্যাপার সম্যক ও সঠিকরূপে জানবার জন্য তখনকার বৈজ্ঞানিকদের যে অপরিসীম আগ্রহ ছিল আধুনিক কালের মতই একই সময়ে দুই তিন জায়গা থেকে নিরীক্ষণ করার ব্যবস্থা হোতেই সে কথা বোঝা যায়। মাধ্যন্দিন রেখা ও পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করবার জন্য খলিফার আদেশে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা সুরু করেন এবং তাতে বিশেষ সুফলও পান বলতে হবে। তখনকার যন্ত্রপাতির অসম্পূর্ণতার বিষয় বিবেচনা করলে, যে সামান্য ভুল ত্রুটি দেখা যায় সেগুলো উপেক্ষণীয় বলেই গণ্য করে নেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করা যায় এক স্থানে বসেই, এ ধারণা নিশ্চয়ই সুস্থতার লক্ষণ নয় বলেই বোধ হয় তখন পর্যন্ত সাধারণে মেনে নিয়েছিল। বস্তুত গ্রীক সভ্যতার শীর্ষকালে এ সম্বন্ধে কেউ কেউ চেষ্টা করলেও গ্রীকদের পরে সাত শ বৎসরের মধ্যে এ কথা কেউ ভেবে দেখে নাই। আলমামুনের রাজত্ব কালেই প্রথম চেষ্টা হয়। মাধ্যন্দিন রেখা (meridian) নিরূপণ করবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকগণ এক মৌলিক উপায় উদ্ভাবন করেন। এ বিষয়ে তাঁদের অবলম্বিত পন্থা গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের অনুসৃত পন্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও অভিনব। এই উপায়টি শুধু মৌলিকতার দিক দিয়েই নয়, এমনিও বেশ কৌতুহলোদ্দীপক এবং প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। মেসোপটেমিয়ার সিজারের ময়দানই এই নিরূপণ কার্যের

কার্যক্ষেত্ররূপে মনোনীত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ দুইভাগে ভাগ হয়ে একই স্থান থেকে, কতক ঠিক উত্তর দিকে এবং কতক ঠিক দক্ষিণ দিকে গমন করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা ধ্রুব নক্ষত্রকে পূর্বস্থানের চেয়ে ঠিক এক ডিগ্রী উপরে এবং ঠিক এক ডিগ্রী নীচে না দেখেন। এই দূরত্ব মেপে নিয়ে তা থেকেই তাঁদের অভীপ্সিত কার্য সম্পন্ন করেন। দুই দিককার দূরত্ব ঠিক সমান হয় নাই, একদিক হয়েছিল ৫৭ মাইল, অন্যদিক ৫৬½ মাইল, এক মাইলের পরিমাণ হোল চার হাজার "কাল হাত" (Black cubits) বা ৬৪৭৩ ফিট। অন্যান্য গণনা থেকে মনে হয় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের পরিমাপের মধ্যফল না নিয়ে, বৃহৎ সংখ্যাকেই সঠিক বলে ধরে নিয়েছিলেন, এখানকার হিসাবে সেই বৃহৎ সংখ্যাটি ৪৭·৩২৫ কিলোমিটার। তাঁরা কেন যে ঠিক মধ্যফল নেননি তার সঠিক কারণ বোঝা যায় না। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। C. A. Nillanoএর মতে বৈজ্ঞানিকগণ মধ্যফলই (mean result) নিয়েছিলেন। এর পরিমাপ হোল ৫৬⅔ আরবী মাইল বা বর্তমানের ৩৬৬৮৭২ ফিট। স্থানটির অক্ষাংশ (N. Lat) ৩৬°—৩৮° মধ্যে। সে হিসাবে এই ফল বর্তমানের স্থিরীকৃত পরিমাপের চেয়ে ২৮৭৭ ফিট বেশী। এই পরিমাপ অনুসারে পৃথিবীর পরিধি হবে ২০৪০০ মাইল এবং ব্যাস হবে ৬৫০০ মাইল।

যা হোক তাঁদের নির্ধারিত ফলের সঙ্গে বর্তমানের স্থিরীকৃত ফলের সামান্য একটু গরমিল দেখে মনে হয় যদিও তাঁরা

উত্তরকালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলিকে নিখুঁতভাবে সর্বাঙ্গীন উন্নত করে তুলতে পেরেছিলেন কিন্তু তখন পর্যন্ত সেগুলো সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠে নাই।

এই তিন মানমন্দিরের নিরীক্ষণ ফল থেকেই পরীক্ষিত ফলক "আলজিজ আল মুমতাহান" বা আলমামুন ফলক (Tested Table or Almamun's Table) নামক সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলক তৈরী হয়। এই ফলক তৈরী করতে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়, সিন্দহিন্দ বা সিদ্ধান্তের অনুকরণে।

বাগদাদের মানমন্দিরে প্রথম থেকেই অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান চর্চা করতেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক পদার্থবিদ আবুল হাসান, এই স্থানেই প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং তাঁরই যন্ত্র কতকটা উন্নত আকারে উত্তরকালে মারাঘা ও কায়রোর মানমন্দিরে খগোল বিজ্ঞানে নবযুগ আনয়ন করে। খলিফা আলমামুনের রাজত্বকালেই বিষুবরেখা ও আয়নমণ্ডলের সংযোগ স্থল (Equinox) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতুর ছায়া (Apparitions of the comets) এবম্বিধ সৌরজগৎ সংক্রান্ত বহু তথ্য নির্ণীত হয়।

যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণের আপ্রাণ সাধনায় এ সমস্ত তথ্য নির্ণীত হয়েছিল দুঃখের বিষয় তাঁদের সব্বার নাম ও কাজের পূর্ণ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। যতদূর জানা যায় মোহাম্মদ এবনে মুসা আলখারেজমি, আলফ্রাগানাস, প্রমুখ অধুনা বিজ্ঞান জগতে সুবিদিত বৈজ্ঞানিকগণ ছাড়াও, ছোটখাট অনেকেই

বিজ্ঞানচর্চায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের কাজ এই সমস্ত সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মত মনীষাসম্পন্ন ও প্রতিভার পরিচায়ক না হলেও, তাঁরা যে এক অদম্য উৎসাহ নিয়েই বিজ্ঞান চর্চা করেছিলেন, এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, বর্তমানে জ্ঞাত তাঁদের সামান্য কার্য থেকেই সে বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। এ সমস্ত অল্পবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান গরিমার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বিজ্ঞানে তাঁদের দানের যে সমস্ত অংশ এতদিন পর্যন্ত নজরে পড়েছে সেগুলোর কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাবে।

"আলজিজ আলমুমতাহ্যান" তৈরী করতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাহায্য করেছিলেন আবু আলি ইয়াহিয়া এবনে আবি মনসুর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন খাঁটি পারস্যবাসী। আলমামুনের বিদ্বান সভায় অবস্থান কালে তিনি তাঁর ধর্মমত বদলিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। গণিতশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানই তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এতে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যেরও পরিচয় দেন। খলিফাও তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভায় ও বুদ্ধিমত্তায় প্রীত হয়ে তাঁকে সামসিয়া মানমন্দিরের সর্বময় কর্তা (Director) নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি আল আব্বাস এবনে সাইদ

আবু আলি ইয়াহিয়া

আল জওহেরী, সনদ এবনে আলি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ৮২৯-৩০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নানা পর্যবেক্ষণ করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এই পর্যবেক্ষণ কার্যের মধ্যেও তিনি

স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন যন্ত্রপাতির মধ্যে চিরাচরিত প্রথাকে অনুসরণ না করে। হিসাবের সুবিধার জন্য তিনি তাঁর কতকগুলি যন্ত্রের প্রত্যেক ডিগ্রীকে ৬ ভাগে ভাগ করে নিয়ে কাজ করেন। পারস্যবাসী হলেও তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ আরবীতেই লিপিবদ্ধ করেন।

৮৩১ খৃঃ অব্দে এই পারসী বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয় এবং হালেব নামক স্থানে তাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত হয়।

ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পরেও তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যের জের টেনে গেছেন তাঁরই পৌত্র হারুন এবনে আলি। এমনিতে গণিতশাস্ত্রে তাঁর মৌলিক অবদানের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু তিনি পিতামহ, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও নিজের পর্যবেক্ষণের ফল স্বরূপ যে ফলক তৈরী করেন, পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের নিকট তার খুবই সমাদর হয়। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর এই ফলকের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া পিতামহের যন্ত্রপাতির অভিনবত্বের আস্বাদও তাঁর কার্যকলাপের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়ে বলা চলে। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা যন্ত্রপাতি নির্মান করেন। ৯০০ খৃঃ অব্দে এই যন্ত্রকুশলী বৈজ্ঞানিক বাগদাদে ইহলীলা সংবরণ করেন।

হারুন এবনে আলি

টলেমির টেট্রাবিলাসের অনুবাদ হয় খলিফা আলমনসুরের রাজত্বকালে তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক আবু ইয়াহিয়া কর্তৃক। কিন্তু তিনি এর কোন ভাষ্য বা টীকা লেখে যান নাই। আলমামুনের সময় আলতাবারী নামে পরিচিত, ওমর ইবনে আল ফাররুখান

আবু হাফিজ আলতাবারী এর প্রথম টীকা লেখেন। পারসী বিজ্ঞান গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করার সঙ্গেই তাঁর নাম বিশেষভাবে বিজড়িত। খলিফা আলমামুনের আদেশে তিনি বহু পারসী গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। এই ভাষ্য এবং অনুবাদ ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ সম্বন্ধেও তিনি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থের নাম "কিতাব অল ওসুল বেল নুজুম" অনেকের মতে এ গ্রন্থখানি তাঁর পুত্র মোহাম্মদ কর্তৃক প্রণীত। আলতাবারী ৮১৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আলতাবারী

পিতার ন্যায় পুত্র মোহাম্মদ আবুবকর মোহাম্মদ এবনে ওমর এবনে আল ফাররুখান আলতাবারী জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধেও তিনি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীতে জোহানেস হিসপালেনসিস কর্তৃক লাটিনে অনুদিত হয়। এই লাটিন অনুবাদখানির নাম হোল "Omar Tiberiadis de Navitatibus et interrogationibus".

আবুবকর

আহম্মদ এবনে মোহাম্মদ আলনাহাওয়ানদী, বা আল নাহাওয়ানদী খগোল ফলক (astronomical table) তৈরী করেন। এই জাতীয় অন্যান্য ফলক থেকে এর একটা পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্যগুলিতে যেমন তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদের নিরীক্ষণ ফলগুলিকে সম্মিলিতভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে এতে

সেই চিরাচরিত পন্থা অনুসৃত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক শুধু নিজের গবেষণার কাজ দিয়েই একে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজিয়ে তুলেছেন। নাহাওয়ানদীর এই ফলক "আলমুশতামাল" তাঁর অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। একক বৈজ্ঞানিকের কাজ হলেও, সম্মিলিত কাজের চেয়ে গুণের দিক দিয়ে এ বিশেষ কম যায় নাই। যা হোক তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ আর কিছুই জানা যায় না। ৮৩৫ খৃঃ অব্দের পরে কোন এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। সঠিক তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে।

আল নাহাওয়ানদী

Almamun's Table বা Tested Table তৈরী করতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে আল মারওয়াররোজী অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম হোল খালেদ এবনে আবদুল মালেক আল মারওয়াররোজী। দামস্কাস এবং বাগদাদের মানমন্দিরে গবেষণা চালানর সঙ্গে সঙ্গে নিজের এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের কার্য ফলাফল বিজ্ঞান সম্মতভাবে টুকে রাখবার ভারও তাঁর উপর পড়ে, তা ছাড়া এগুলো একত্র সন্নিবেশও তিনিই করেন। তাঁর পুত্র মোহাম্মদ এবং পৌত্র ওমরও বিজ্ঞান সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ওমর জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলক প্রস্তুত করেন এবং "আল মুসাত্‌তাহ" নামে আস্তারলব সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

আল মারওয়াররোজী

আলি এবনে ইসা আল আসতারলবি খলিফা আলমামুনের

বিজ্ঞান সভার অন্যতম সভ্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূপৃষ্ঠ পরিমিতি (Geodesy) এবং আস্তারলব সম্বন্ধে তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থই মৌলিকতার দিক দিয়ে, বৈজ্ঞানিকের আসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ। তবে যা তাঁকে সত্যি সত্যিই বৈজ্ঞানিক হিসাবে, বিজ্ঞান জগতে অমর করে রেখেছে, সে হোল জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা কার্যের জন্য সুকৌশলী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও আবিষ্কার। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিমাতা হিসাবে তিনি তখন খুবই বিখ্যাত ছিলেন এবং সে খ্যাতি কোন দিনই ম্লান হয় নাই। তাঁর যন্ত্রপাতি দিয়ে মানমন্দিরের গবেষণা ও নিরীক্ষণের কাজ চালান হোত।

আল আসতারলবি

বাগদাদের অন্যতম স্থপয়িতা মাশাআল্লাহর শিষ্য আবুল খাইয়াতও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর পুস্তক পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ১১৩৬ খৃঃ অব্দে প্লেটো (Plato of Tioli) De Judicus Nativitatum নাম দিয়ে গ্রন্থখানির লাটিন অনুবাদ করেন। ১১৫৩ খৃঃ অব্দে জোহানেস হিসপালেনসিসও এর অন্য এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদখানি ১৫৪৬-১৫৪৯ খৃঃ অব্দে Johann Schoner কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যোতিষও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সম্বন্ধে তিনি

আবুল খাইয়াত

অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু আলি আল খাইয়াত ইয়াহিয়া এবনে গালিব। নাম দেখে মনে হয় দর্জিগিরি তাঁর অথবা তাঁর পূর্বপুরুষদের উপজীবিকা ছিল (আলখাইয়াত—দর্জি)। ৮৩৫ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই সমস্ত ছোটখাট বৈজ্ঞানিকদের কার্যকলাপ ছাড়া, আলমামুনের রাজত্বকাল বিজ্ঞানের দিক দিয়ে যে দুই মনীষীর প্রতিভার দানে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে, তাঁদের নাম হোল আলফ্রাগানাস ও আলখারেজমি। দুইজনেই বর্তমান বিজ্ঞানজগতে সুপরিচিত।

আলফ্রাগানাস

তবে সুখের বিষয়, একজনের নাম যেমন ইউরোপীয়ানদের কল্যাণে বিকৃত হয়ে পড়েছে, সত্যিই মুসলমান কিনা নাম দেখে সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, অন্যজনের ঠিক ততটা বিকৃত হয় নাই। আলফ্রাগানাস আবুল আব্বাস এবনে মোহাম্মদ এবনে কাছির আলফারগানির ইউরোপীয়ান বিকৃত নাম। এই নামের বিকৃতিতে বোঝা যায় যে তিনি অতি সহজে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। গণিত-শাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানেই তিনি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ করেছিলেন বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে শুধু এইটুকু বললেই হয়ত চলবে যে তাঁর প্রণীত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারসংগ্রহ জিরার্ড (Gerard of Cremona) এবং জোহানেস-ড্-লুনা-হিসপ্যালেনসিস কর্তৃক লাটিনে অনুদিত হয়। ইউরোপের

রিনাসাঁর যুগে রেজিওমনটেনাস (Regiomontanous) এই অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন এবং ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে পুনরায় এর অনুবাদ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে মনীষী মেলানক্থন (Melanchthon, the great) রেজিওমনটেনাসের অনুবাদের উপর নির্ভর করে, নিউরেমবার্গ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। জোহানেসের অনুদিত গ্রন্থখানা প্যারিস থেকে ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে পূনর্বার মুদ্রিত হয়। শুধু লাটিন নয়, হিব্রুতেও এর অনুবাদ হয়। আনাটোল (Anatole) এই অনুবাদ কর্তা। এই হিব্রু অনুবাদ খানা জেকব ক্রিষ্টম্যান (Jacob Cristman) পুনরায় লাটিনে অনুবাদ করে ফ্র্যাঙ্কফার্ট থেকে প্রকাশ করেন। আলফ্রাগানাসের এই পুস্তকখানি বিভিন্ন নামে পরিচিত "জামি এলমুল নজুম ওয়াল হরকত আল সামায়িয়া, উস্থূল এলমুল নজুম, আল মুখায়েল ইলা এলমুল হায়াত আল আফলাক এবং কিতাবুল ফুস্থূল আল ছালেছিন।" পুস্তকখানি যে খুবই জন প্রিয় হয়েছিল সে অনুবাদের ঘটা দেখেই বোঝা যায়। জনপ্রিয়তার কারণ হোল সংক্ষেপে অথচ সাধারণের বোধগম্য সুন্দর ভাষায় বর্ণনা। বস্তুত আলফ্রাগানাসের জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থখানা এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আজিও বিবেচিত হয়ে থাকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই পুস্তক ছাড়া astrolabe সম্বন্ধে ও আলফ্রাগানাস দুইখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তক দুইখানির নাম হোল "আল কামিল ফিল আসতারলাব" এবং "ফি সানাত আল আসতারলাব বিল হান্দাসা" (জ্যামিতির সাহায্যে

astrolabe প্রণয়ন)। এই দুই খানির আরবী অনুলিপি অদ্যাপিও প্যারিস এবং বার্লিনে বিদ্যমান।

আলমাজেষ্ট (Almagest) এবং সূর্যঘড়ি (Sundial) সম্বন্ধেও তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এগুলির সঠিক বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব পুস্তকগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় তিনি টলেমির Theory এবং তাঁর স্থিরীকৃত precession-এর হিসাব সঠিক বলেই ধরে নেন। তবে আলফ্রাগানাসের মতে এগুলি শুধু নক্ষত্রের উপরেই প্রযোজ্য নয় গ্রহগুলির উপরেও প্রযোজ্য। পৃথিবীর ব্যাস (তাঁর মতে ৬৫০০ মাইল) গ্রহগুলির ব্যাস এবং গ্রহগুলির মধ্যেকার ব্যবধান নির্ণয়ও তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভার পরিচায়ক। ৮৬১ খৃঃ অব্দে তাঁরই তত্বাবধানে ফুসতাতে নীলোমিটার (Nilometer) স্থাপিত হয়।

এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, খুব সম্ভব, খলিফা আলমুতাওয়াক্কিলের রাজত্ব কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই সমস্ত অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন ছাড়াও আলমামুনের সময়কার মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের গণিতশাস্ত্রের দান সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় আলখারেজমির বিস্ময়কর প্রতিভার অবদানে।

আল খারেজমি

আলখারেজমিই বীজগণিতকে অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে মর্য্যাদা সম্পন্ন করে তোলেন, এবং এর প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারতীয় বীজগণিতের অংশটুকু বাদ দিলে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের পূর্বে বীজগণিতের চর্চা তেমন বিশেষ কিছুই হয় নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রীকদের মধ্যে ডাওফেণ্টই বীজগণিত নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন বলে মনে হয়। এ হিসাবে মুসলিম নিউটন * আলখারেজমিকেই বর্তমান বীজগণিতের সৃষ্টিকর্তা বলা চলে।

আলখারেজমির পূর্ণ নাম হোল আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে মুসা আলখারেজমি। পারস্যের অন্তর্গত আরল হ্রদের দক্ষিনে খিভা প্রদেশে, খারেজমে তাঁর জন্ম, সেই হিসাবেই খারেজমি নামেই তিনি সাধারণত পরিচিত। কেউ কেউ তাঁকে আলমাদজুসী (ম্যাজিয়েনের বংশধর) এবং কুতরুবুল্লী (কুতরুবুলের অধিবাসী, কুতরুবুল তাইগ্রীসের পশ্চিম তীরে বাগদাদের নিকটে একটি গ্রাম) নামেও অভিহিত করেছেন। উত্তরকালে

* The greatest Mathematician of the time, and if one takes all circumstances in to account, one of the greatest of all time was Al Khwarizami.

(Introduction to the History of Science, Sarton Part II, P. 545)

যাঁর প্রতিভায় সমস্ত বিশ্ব বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিল, জন্ম মুহূর্তে তাঁকে কেউ তেমন ভাবে স্বাগত জানায় নাই। বিখ্যাত মনীষীদের যেমন ঘটে তাঁর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। পিতামাতার হাসি ও আনন্দের অভ্যর্থনাই তাঁকে প্রথমে অভিনন্দিত করেছিল, কিন্তু এই অবজ্ঞাত শিশুই গণিতশাস্ত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেন তা সত্যই বিস্ময়কর। আলখারেজমির জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই এ পর্যন্ত জানা যায় নি। যতদূর জানা যায় তিনি খলিফা আলমামুনের লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। হয়ত এই লাইব্রেরীর সংস্পর্শে এসেই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই সময়ে আফগানিস্তানে যে মিশন প্রেরিত হয় আলখারেজমিও সেই মিশনের অন্যতম কর্মীরূপে আফগানিস্তানে গমন করেন। খুব সম্ভব প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ভারতবর্ষও ঘুরে আসেন। আলবেরুনীর উপর ভারতের প্রভাব যেমন ভারতে অবস্থানের জন্যেই, আলখারেজমির বিজ্ঞানের গবেষণার উপর ভারতীয় প্রভাবেরও কারণও হয়ত তেমনি ভারত ভ্রমনই।

গণিতশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত বিভাগেই আলখারেজমির প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বীজগণিতই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলা যেতে পারে। তদানীন্তন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত তাঁরও প্রথম কার্য হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে এবং এ সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্রন্থকারের অসীম জ্ঞানবত্তারই পরিচয় দেয়।

আলফ্রাগানাসের পুস্তকের মতই এঁরও অনেকগুলি পুস্তক প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবেই বিবেচিত হয়; এবং এডিলারড (Adilard of Bath) বা রবার্ট (Robert of Chester) কর্তৃক লাটিনে অনুদিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র, খগোল ফলক, ডায়াল প্রভৃতি প্রস্তুত করার মধ্যেও এসব বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শুদ্ধ গণিতেও (Arithmetic) আলখারেজমির প্রতিভার ছাপ পড়েছে। ভারতীয় গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করে, তিনি শুদ্ধগণিত বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এখানার নাম দেন "কিতাবুল হিন্দ"। "কিতাবুল হিন্দ" ছাড়াও শুদ্ধ গণিত বিষয়ে তিনি আরও কয়েকানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'আলজাম ওয়াল তাফরিক" সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর পুস্তকগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য যে কত অধিক সে বোঝা যায় ইউরোপীয় রিনাসাঁর যুগে, অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থগুলির লাটিনে অনুবাদ হওয়া দেখেই। রবার্ট (Robert of Chester) এবং এডিলারড (Adilard of Bath) এই দুই জনেই আলখারেজমির গণিত-শাস্ত্রের পুস্তকগুলি লাটিনে অনুবাদকারী হিসাবে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। রবার্ট বীজগণিত "এলমুল জাবর ওআল মুকাবেলা"র লাটিন অনুবাদ করেন। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে L. C. Karpinski নিউইয়র্ক থেকে অনুবাদখানি পুনর্বার প্রকাশ করেছেন। গণিত পুস্তক "আলজাম ওয়াল তাফরিক" খানি এঁদের

মধ্যে কে অনুবাদ করেছেন সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। তবে অনেকের মতে রবার্টই প্রকৃত অনুবাদকারক। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে রোম থেকে Trattalid Arithmetica নামক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে Prince Boncompegni কর্তৃক লাটিনে অনুদিত এই গ্রন্থখানি পুনঃ সম্পাদিত হয়। যা'হোক গণিতের এই অনুদিত গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হয় "Algoritmi denumero Indorum" এবং এই থেকেই Algorism, Augrim প্রভৃতি শব্দেরও উৎপত্তি। ইউরোপীয় ভাষার পাল্লায় পড়ে অনেক মুসলমান নামই যেমন চেহারা বদলে কিম্ভুতকিমাকার ধারণ করেছে, আলখারেজমির নামও তেমনি লাটিন অনুবাদে Algorism, Algoritmi, Algorithmএ রূপান্তরিত হয়েছে। বীজগণিতের অন্যতম অংশ Logarithm, আলখারেজমির নাম থেকেই উৎপন্ন।

গণিতের এই গ্রন্থখানিতে প্রথমত সংখ্যার উৎপত্তি নিয়েই আলোচনা হয়েছে। আজকালকার প্রচলিত সংখ্যাগুলির প্রকৃত আবিষ্কারক কে, সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান।*

* With all the painstaking study which has been given to the history of our numerals we are at the present time obliged to admit that we have not even settled the time and place of their origin. At the begining of the present century the Hindu origin of our numerals was supposed to have been established beyond doubt. But at present time several earnest

এ মতভেদের কারণও অনেক। বর্তমানে এ লিখনপ্রণালী Arabic Notation বা আরবের উৎপন্ন বলেই পরিচিত। ইউরোপীয়ানরা যে সংখ্যা লিখনের এই অভিনব প্রণালীর আরবদের নিকট থেকেই সন্ধান পান, সে কথা তাঁরা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেন। এর বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা রোমান সংখ্যা লিখনপ্রণালীর সঙ্গে তুলনা করলেই সম্যক বোঝা যাবে। জবরজঙ্গ গোছের সংখ্যা লিখন যে, অঙ্কশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাইরে এক অপাংক্তেয় শ্রেণীতে তুলে ধরেছিল সে কথা এই বৈজ্ঞানিক যুগের সুষ্ঠু নিয়মবদ্ধ বিজ্ঞানের চক্ষে সহজেই ধরা পড়ে। আষ্টেপৃষ্ঠে কাউকে শক্ত করে বেঁধে সোজা হয়ে হাঁটতে বলার মধ্যে যেমন বুদ্ধির অপ্রাচুর্যে মনে কারুণ্যেরই উদ্রেক করে, রোমান অক্ষরের সংখ্যার ঘাঁটির মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতিও তেমনি ভয়াবহরূপে আশাপ্রতিহতই হয়। রোমান সংখ্যার নাগপাশে বৈজ্ঞানিকদের সহজাত সংযত প্রবুদ্ধ মন যখন হাঁপিয়ে উঠছিল, তখন বিধাতার আশীর্বাদের মতই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সংখ্যা লিখনের নবপ্রণালী বিজ্ঞানের উন্নতির পথ

students of this perplexing question have expressed grave doubts on this point. These investigators—G. R. Kaye in India, Carra de Vaux in France and Nicol Bubnov in Russia—working independently of one another have denied the Hindu origin (A History of Mathematical Notations. F. Cajori vol I. P. 46, 1928).

সহজ সাধ্য করে তোলে। রোমান প্রণালী ছাড়া আরবী অক্ষরমালার প্রত্যেক অক্ষরকে সংখ্যার প্রতীক ধরে গণনার প্রথাও তখন আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখনও উর্দু গণনার প্রণালীতে তার কতকাংশ বিদ্যমান আছে। তবে এ যে বিশেষ সমাদর লাভ করতে পারে নাই, সে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান-সাধনার প্রথম যুগ থেকেই এর নির্বাসন দেখেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। Arabic Notation আরবদের বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম যুগ থেকেই প্রচলিত, তবে তাঁরা যে এর সর্বপ্রথম এবং সর্বময় আবিষ্কর্তা নন সে তাঁদের গ্রন্থাবলী থেকেই বোঝা যায়। আলখারেজমি তাঁর গ্রন্থে এ প্রণালীকে "হিন্দী" প্রণালী বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণত ভারতবর্ষকে "হিন্দ" নামে অভিহিত করা হোত। এ হিসাবে আরবীয়েরা যে ভারতের কাছ থেকেই সংখ্যা-লিখন প্রণালী শিক্ষা করেন, এতে কোন সন্দেহ জাগবার কথা নয় এবং এ মতকে সঠিক বলে বিবেচনা করবার আরও কতকগুলি কারণও বর্তমান। তবে এই হিন্দী শব্দটি ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারা-দ্য-ভো'র মতে আলখারেজমির গ্রন্থে যে হিন্দী শব্দের উল্লেখ আছে সে শব্দটা সত্যি হিন্দী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। প্রায়ই দেখা যায় আরবীতে "হিন্দাসী" শব্দ লিখবার গোলমালে "হিন্দী"তে পরিণত হয়েছে। هندس "হিন্দাসী"র س সিনকে ভুল করে অনেকেই

ى "ইয়া" পড়েছেন ফলে "হিন্দাসী" হিন্দীতে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক স্থানে দেখা যায়, যেখানে "হিন্দী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরা হয়েছে, আসলে কিন্তু "হিন্দাসী" শব্দটিই সেখানে ভাল খাটে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক প্রকার চিহ্নিত বৃত্তের নাম "হিন্দ" অথচ একে "হিন্দাসী" বললেই উপযুক্তভাবে বর্ণনা করা হয়।* উপেক (Woepake) প্রভৃতি সংস্কৃতবিদ পণ্ডিতেরা সংখ্যার গঠন প্রণালী থেকে এর প্রথম উৎপত্তি স্থল নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে খুব সুষ্ঠু বলে মনে করা যায় না। গঠন প্রণালীর উপর খুব বেশী নির্ভর করা তেমন যুক্তি সঙ্গত নয় বলেই মনে হয়। যে সমস্ত স্থানে বর্ণমালাকে সংখ্যার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হোত, সেখানেও অক্ষরের লিখন প্রণালী অনুযায়ী সংখ্যার ক্রমিক নম্বর ও গঠন প্রণালী না হয়ে বরং অক্ষরগুলি ক্রম অনুসারেই (alphabetical order) তাদের সংখ্যা-প্রতীক স্থিরীকৃত হয়েছে। আরবে যে এ রকম সংখ্যা-লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে, গ্রীসেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হোত। সে হিসাবে বর্ণমালার

---

* I have observed the word Hindi is easily confused in Arabic Script with Hindasi which means what relates to geometry or the art of engineer; in various cases in which the word Hindi is used, the meaning of Hindasi fits better." (Legacy of Islām P. 384)

প্রাথমিক চিহ্নগুলি থেকে সংখ্যা গঠন প্রণালীর উৎপত্তি স্থল স্থির করতে যাওয়াকে বিজ্ঞান সম্মত বলা চলে না। যা'হোক এ সম্বন্ধে বিশেষ বাদানুবাদ না করে ভারতবর্ষেই এই সংখ্যালিখন প্রণালীর উদ্ভব হয়েছিল বলে ধরে নিলে কারুর প্রতি অবিচার করা হবে বলে মনে হয় না। মুসলিম বৈজ্ঞানিকরা যে প্রথমে এর আবিষ্কার করেন তেমন কোন প্রমাণ নাই। অন্ততঃ তাঁরা যে সংখ্যা-লিখন প্রণালীর সমস্তগুলির আবিষ্কারক নন সে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আবিষ্কারক যিনিই হোন আরব বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়ে সংখ্যা-লিখন প্রণালী যে বর্তমান বিজ্ঞান সম্মত আকার ধারণ করেছে সে হয়ত কেউ অস্বীকার করবেন না। আরব পদ্ধতি যে অনেক সহজ ও বিজ্ঞান সম্মত, সে সংখ্যাগুলির গঠন প্রণালীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও পরিব্রাজক আলবেরুনী অবশ্য বলেছেন যে আরবেরা সংখ্যা-লিখন প্রণালী ভারতের হিন্দুদের নিকট থেকেই শিক্ষা লাভ করেন এবং আরবদের এই সুন্দর সংখ্যা-লিখন প্রণালী, ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেই প্রবর্তিত হয়, কিন্তু এই লিখন প্রণালী কোন্‌টি, সংখ্যাই বা কোনগুলি সে সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে তিনি কোন কিছুই বলেন নাই। তা ছাড়া তাঁর অভিমতব্যক্তির সময় মুসলমানদের বিজ্ঞান সাধনার তৃতীয় অংশ বলা যেতে পারে। তখন তাঁরা এদিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছেন। তিনি নিজেও এ অভিমতের

কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। যা'হোক আরবদের সংখ্যা-লিখন প্রণালী দেখে মনে হয় তাঁরা এ লিখন প্রণালী যেখানেই শিখে থাকুন না কেন সংখ্যার গঠন প্রণালী, তাঁদের নিজস্ব ও মৌলিক। অন্যগুলির কথা বাদ দিলেও আরব বৈজ্ঞানিকগণ যে অঙ্ক সংখ্যা লিখার মধ্যে 'শূন্য' ব্যবহার করবার নিয়ম-পদ্ধতির আবিষ্কারক এবং সর্বপ্রথম ব্যবহারক, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণই দেখা যায় না। অনেকের মতে আরবেরাই 'শূন্য' এরও আবিষ্কারক। তাঁদের কাছ থেকেই ভারতবর্ষেও 'শূন্য'র আমদানী হয়।* এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

'শূন্য' ব্যবহার কববার এবং অঙ্কের- সংখ্যা লিখার মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে সংখ্যা-লিখন প্রণালী যে জবর জঙ্গ গোছের ছিল সে অনুমান করা বিশেষ কঠিন নয়। দশক, শতক সহস্রক বা তদুর্ধ কোন সংখ্যা লিখতে হ'লে 'শূন্য'র বিশেষ প্রয়োজন। এই ছোট জিনিষটীর কথা না জানা থাকলে সমস্ত সংখ্যা লিখতে হোলে ছোট ছোট শিশুদের

---

* The earliest Muslim Zero knownis the dot (The Arabic zero has remained a dot to this day) in a manuscript dated 873. The earliest Hindu example of a zero is an inscription of 976 at Gwalior (Hindu Arabic Numerals, Smith & Karpinski 52, 56, 138, 1911).

মত এবাকাস (abacus) বা গণনার মেজ ব্যবহার করা দরকার এবং প্রকৃতই হোতও তাই। 'শূন্য' এর কৃপায় হনুমানের বিশল্যকরনীর খোঁজে গন্ধমাদন বহন করবার মত বৈজ্ঞানিকগণও সংখ্যা লিখাতে এবাকাস বহন করার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।
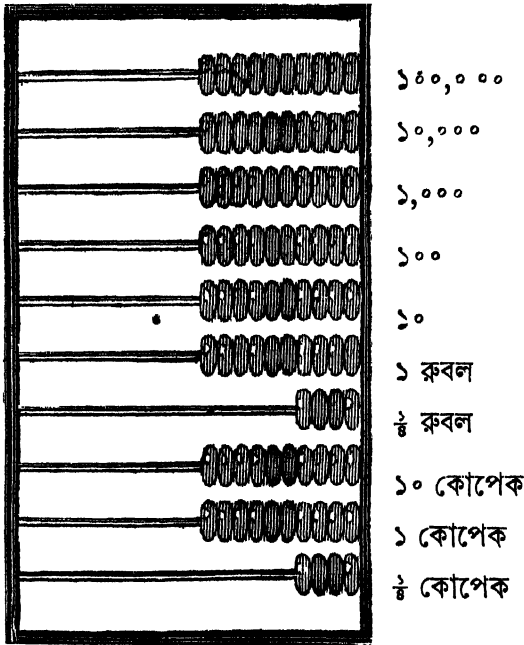
রাশিয়ান এবাকাস

পরপৃষ্ঠার চিত্রে এবাকাসে ২২ ও ১৩৯ এর যোগ দেখান হয়েছে। প্রথম পর্য্যায়ে ২২ এর ২ এর জন্য এককের ঘরে দুইটি গোলক বসান হয়েছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ১৩৯ এর ৯ এর জন্যে এককের ঘরে ৯টি গোলক বসান হয়েছে। এখন এই দুইটি এককের ঘর থেকে দশটি

গোলক সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় পর্য্যায়ে দশকের ঘরে একটি ও এককের ঘরে একটি গোলক বসান গেল। চতুর্থ পর্য্যায়ে ২২ এর দুই দশকের জন্য আরও দুইটি গোলক দশকের ঘরে বসান গেল। এইবার পঞ্চম পর্য্যায় ১৩৯ এর তিন দশকের জন্য আবার আরও তিনটি গোলক
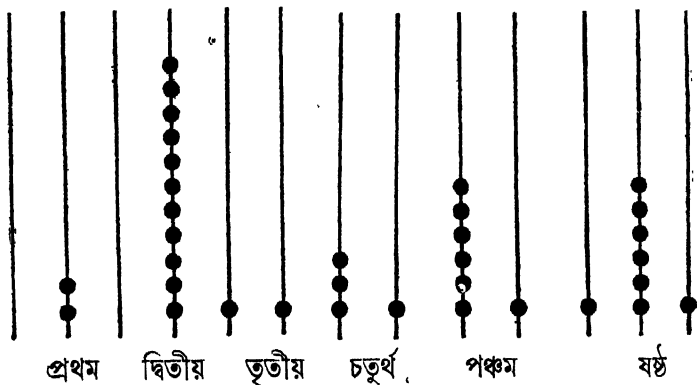
এবাকাসে একটি যোগ

দশকের ঘরে বসান গেল। তারপর ষষ্ঠ পর্য্যায়ে শতকের ঘরে একটি গোলক বসিয়ে দিলেই যোগ সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

এই আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই এবাকাস ব্যবহৃত হোত। রোমের বৈজ্ঞানিক যুগ থেকে আরম্ভ করে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপের সর্বত্রই এই অর্ধ-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংখ্যা-লিখার নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। মধ্যযুগেও যে ইউরোপ বর্তমানের সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত ছিল এমন মনে করবার কোন মুখ্য

কারণ নাই। রোমসভ্যতা নির্বাপিত হওয়ার পরে এবাকাস এর কথাও ইউরোপ সম্পূর্ণ ভুলে যায়। দশম শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক গারবার্ট পুনরায় এই অর্ধ বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলন করেন, তাঁর স্পেনের মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামান্যতম অংশবিশেষের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে। তবে zero বা "শূন্য" সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান একেবারে শূন্যই ছিল। ইউরোপে "শূন্য"র প্রচলন দেখা যায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। দ্বাদশ শতাব্দীতেই এর পূর্ণ ব্যবহার করে সংখ্যা লিখন প্রণালী আরম্ভ হয়। এ প্রথাকে আরবদের উৎপত্তি হিসাবে 'আলগরিথম' (Algorithm) বলা হোত। আলখারেজমির সময় থেকেই যে 'শূন্যে'র ব্যবহার চলে আসছে তার উল্লেখ পাওয়া যায় দশম শতাব্দীতে ইউসুফ প্রণীত "মাফাতিহুল উলুম" (বিজ্ঞান কুঞ্জি) গ্রন্থে। গ্রন্থকার বলেছেন যে যদি কোন গুণীতক শক্তি সংখ্যার মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তা হলে সেই শক্তির স্থানে صفر (sifr) দ্বারা পূর্ণ করা হয় এবং এমনি করেই সংখ্যাটি পূর্ণভাবে লিখিত হয়। কেউ কেউ এস্থানে শুধু একটা বিন্দু ব্যবহার করেন, কেউ কেউ বা তারকিন বা উপরে একটা রেখা ব্যবহার করেন। বর্তমানে 'শূন্য' এর ইংরেজী নাম Cipher আরবী শব্দ صفر থেকেই উদ্ভূত। এর অর্থও হোল শূন্য।

আলখারেজমি ভারতীয় পদ্ধতি সমর্থন করে সংখ্যালিখন প্রণালী প্রচলনের চেষ্টা করেন। এর গুরুত্ব এবং উপযোগিতা

বিশদ ভাবে বর্ণনা করে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ পুস্তিকাখানি Leber Algorism De Numero Indorum নামে সম্ভবত এডিলারড কর্তৃক অনুদিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় আরবীয় বৈজ্ঞানিকগণ তখন তাঁকে সমর্থন করেন নাই এবং এ পদ্ধতিও অনুসরণ করেন নাই।

গণিতশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও বিজ্ঞান জগতে তাঁকে যা অমর করে রেখেছে সে হোল বীজগণিতে তাঁর অপূর্ব অবদান। বস্তুত তাঁরই প্রণীত বীজগণিত থেকেই যে বর্তমানে প্রচলিত বীজগণিত বা Algebraর উদ্ভব, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহই নাই। তিনি তাঁর গ্রন্থগুলির একখানার নাম দেন "এলমুল জাবর ও আল মুকাবেলা"। "আল জাবর" শেষকাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয়ান ভাষাবিদদের কল্যাণে এলজেব্রায় (Algebra) পরিণত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি লাটিনে Ludus algebrac almucgrabalaeque, Gbeba Mutabila প্রভৃতি নামে অনুদিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজী অনুবাদে Algebra and almachabel নাম দেখা যায়। এই সংক্ষেপে দাঁড়িয়েছে Algebra. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৮৩১ খৃঃ অব্দে) F. Rosen এ গ্রন্থখানিকে Algebra of Mohammed Ben Musa নাম দিয়ে অনুবাদ করেন।

আরব বৈজ্ঞানিকদের সময়ে বীজগণিত কতটা উন্নত হয়েছিল সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁরা যে বীজগণিতের

Principle গুলি রীতিমত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, সে এই নাম নির্বাচন ব্যাপারেই বেশ বুঝা যায়। অনেক আবিষ্কর্তা নিজের আবিষ্কৃত জিনিসের প্রকৃত নাম হৃদয়ঙ্গম না করেও তা আবিষ্কার করেছেন, এবং এমন নাম দিয়েছেন যাতে তার স্বধর্মের সঙ্গে কোন বিষয়েই মিল নাই, কিন্তু আরবীয়দের বেলায় বিজ্ঞানের কোন বিভাগেই সে কথা বলা চলে না। 'এল্‌মুল জাবর ও আল মুকাবেলা'কে Smith অনুবাদ করেছেন "The science of reduction and cancellation". এতে সাধারণভাবে বীজগণিত বলে বোঝা গেলেও একে শাব্দিক অনুবাদ ছাড়া প্রকৃত অনুবাদ বলা চলে না। "আলজাবর" এর অর্থ বাংলায় বুঝায় সাধারণ যোগ এর কাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে আলজাবর শব্দের অর্থ হোল, কোন সংখ্যার সঙ্গে অন্য কোন সংখ্যা যোগ করে বা যোগের সাংকেতিক নিয়মানুসারে গুণ করে অন্য কোন সংখ্যার সমান করা। জ্যামিতির এক স্বতঃসিদ্ধ হোল সমান সমান বস্তুর সঙ্গে সমান সমান বস্তু যোগ করলে যোগফলগুলি সমান হয়। জ্যামিতির এ স্বতঃসিদ্ধ বীজগণিতেরও প্রথম সূত্র বটে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে একে ধরা হয় না। "ক" যদি "খ"র সমান হয়, তা হোলে "ক" এর সঙ্গে "গ" যোগ করে যে ফল পাওয়া যাবে, "খ" এর সঙ্গে "গ" যোগ করলেও সেই ফলই হবে। বীজগণিতের নিয়মানুসারে একে লেখা যাবে ক = খ, ক + গ = খ + গ এক কথায় সমান সমান সংখ্যার সঙ্গে, অন্য কোন সংখ্যা যোগ করলে বা তাদিগকে অন্য কোন সংখ্যা

দিয়া গুণ দিলে তাদের যোগফল বা গুণফল সমান হবে, বীজগণিতের প্রথম সূত্রই এই। এই সূত্রকেই সংক্ষেপে "আলজাবর" বলা হয়েছে।

"আলজাবর" শব্দের মত "আলমুকাবেলা" শব্দটিরও প্রকৃত অনুবাদ হয় নাই। মুকাবেলার সাধারণ অর্থ হোল সাক্ষাৎ। বীজগণিতের চিহ্নগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই "মুকাবেলা" শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি হবে। সমান চিহ্নের এক ধার থেকে অন্য ধার নিয়ে দুটাকে একত্র করাকেই, বীজগণিতের দ্বিতীয় সূত্র বলা যেতে পারে। একধার থেকে অন্যধারে নেওয়ার সময় যেটাকে নড়ান হয় সেটার চিহ্ন যায় বদলিয়ে এবং দুটো একত্র হোলে ফল হয়ে যায় শূন্য অর্থাৎ তাদের সাক্ষাৎ হোলেই দুজন একাত্মা হয়ে মিলে যায়। ক=খ এদের মুকাবেলায় হবে ক—খ=০ বীজগণিতের আদ্যন্ত সমস্তই নির্ভর করে এই দুই মূল সূত্রের উপরেই। এই হিসাবে বীজগণিতের আলখারেজমি প্রদত্ত নাম বিজ্ঞানসম্মত ও সমস্ত principle বা মূলসূত্রগুলির পরিচায়ক।

যাহোক পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতবর্ষের সামান্য চর্চা ছাড়া আলখারেজমির পূর্বে অন্য কোথাও বীজগণিতের তেমন আলোচনা হয় নাই। আলখারেজমির গ্রন্থ "এলমুলজাবর ও আলমুকাবেলা" সর্ব বিষয়েই বীজগণিতের সর্ব প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিষয়গুলির পর পর সাজানর মধ্যে গ্রন্থকারের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রস্ফুরিত হয়ে উঠেছে। বীজগণিতের সমস্ত সূত্র, নানাপ্রকার সমস্যায় উদ্ভূত

নানাপ্রকার অঙ্কের সমাধান, এ সমস্ত বিশদ ও সুশৃঙ্খল ভাবেই এতে একের পর এক আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থকার দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের (quadratic equation) সমাধান, নানাপ্রকার সমস্যার উদ্ভাবনা ও তাদের সমাধানে, নিজস্ব নানাপ্রকার পন্থা বিশদভাবে বর্ণনা ও উল্লেখ করার পর, বীজগণিতিক গুণ ও ভাগের কথা আলোচনা করেছেন। এ সমস্ত সাধারণ শুদ্ধ ঔপপত্তিক বিষয় ছাড়াও পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের সংস্কার অনুযায়ী বীজগণিতের বিশুদ্ধতার পরিপন্থী এবং অবান্তর বলে পরিগণিত অনেক বিষয়েরও এতে অবতারণা করা হয়েছে। এতে মনে হয় মুক্তবুদ্ধি আলখারেজমির নিকট পূর্ব সংস্কার বা প্রথা বলে কোন জিনিস আদর পায় নি, সব বিষয়কেই তিনি বিচার করেছেন বৈজ্ঞানিক মূল্য দিয়ে। তাই দৃঢ়চিত্তে তিনি আপাতচক্ষে অবান্তর বলে পরিগণিত হতে পারে এমন বিষয়কেও বিজ্ঞান হিসাবে বীজগণিতে ঢুকাতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। এই অবান্তর বিষয় হোল ভূমির পরিমাণ নির্ণয়, রাজনীতি আলোচনা ইত্যাদি। সমতল ভূমির পরিমাণ স্থিরীকরণ নিয়ে এতে পূর্ণ আলোচনা হয়েছে এবং আলখারেজমি তাঁর স্বকীয় মৌলিক কতকগুলি উপায় উদ্ভাবন করে সেগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উৎসাহ ছাড়া রাজনৈতিক প্রভাবও গ্রন্থকারের উপর কিছু কাজ করেছিল বলে মনে হয়। বীজগণিত গ্রন্থে নানাপ্রকার রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ও সমাধানই এ ধারণার খোরাক যুগিয়েছে বলতে হবে। তিনি অঙ্কের

মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রদেশ বিভাগ ও রাজনৈতিক কঠিন কঠিন সমস্যার অবতারণা করেছেন। এগুলি বেশ জটিল ও কঠিন। তবুও এগুলোর বীজগণিতিক সমাধান হয়েছে খুব সুন্দরভাবে। আজকাল রাজনৈতিক কুটচক্রজালের মধ্যে এ সবের বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও, যখন বীজগণিতের শুধু আরম্ভই হয়েছে বলতে হবে, তখন এই সব জটিল সমস্যা অঙ্কের মধ্যে অবতারণা ও সমাধান করা কতখানি বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি, নিরপেক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক, সে ভাবলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। তখনকার দিনের পণ্ডিতদের যে সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞতা ও প্রায় সমজ্ঞান থাকত, এ সব বিবেচনা করলে, সে কথা ভালভাবেই প্রতীয়মান হয়। আজকাল যেমন পণ্ডিতেরা কোন এক বিশেষ বিষয়েই চর্চা করেন এবং সেই বিষয়েই শুধু জ্ঞান বর্ধনের চেষ্টা করেন ও জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দেন, অন্য বিষয়ে হয়ত বা সেই বিষয়েরই অন্য বিভাগের সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ থাকেন, তখনকার দিনে ঠিক এমন ছিল না। মুসলিম বৈজ্ঞানিকেরা তদানীন্তন প্রায় সমস্ত বিষয়েই জ্ঞান লাভ করতেন, এবং প্রত্যেকেই প্রায় সমস্ত বিষয়ই অল্পবিস্তর চর্চা করতেন। এ ছাড়া অবশ্য কোন উপায়ও ছিল না। তখনকার দিনে পূর্বেকার সঞ্চিত জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া আজকালকার মত সহজসাধ্য ছিল না। দরকার মত অন্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করা পূর্বাপর রীতিমত অধ্যয়ন ছাড়া হয়ে উঠত না। সেই জন্যেই সবাইকে

সমস্ত বিষয়ই অধ্যয়ন করতে হোত। আলখারেজমির বীজগণিতের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনাও এই সর্ববিদ্যা-বিশারদত্বের ফল।

সমীকরণগুলির (equation) শ্রেণী-বিভাগ করত আলখারেজমি কতকগুলি বিশিষ্ট সমীকরণের উল্লেখ করেছেন। শ্রেণী বিভাগ অনুসারে প্রথম হোল প্রথম মাত্রার সমীকরণ। যেখানে অনির্দিষ্ট সংখ্যার শক্তি হোল "এক" যেমন $ax = b$ বীজগণিতের প্রতীক চিহ্নাদি (symbols) প্রচলিত হওয়ার পর, এই সব সাধারণ সমীকরণ সম্বন্ধে কারুর মনে জটিলতার কোন প্রশ্নই জাগে না কিন্তু প্রথমে যাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁদের যে সবগুলোতেই কি হিমসিম খেতে হয়েছিল, সে এই প্রথম মাত্রার সমীকরণের ব্যাপার থেকেই বোঝা যায়। মিশর ও ভারতীয় মনীষিগণ থেকে আরম্ভ করে, নবম শতাব্দীর আলখারেজমি এবং তারপরেও আরও অনেকেই এই সামান্য সমীকরণ নিয়েই হিমসিমের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। আলখারেজমির গ্রন্থে সাধারন সমাধান ছাড়া পূর্বপ্রচলিত পন্থাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে ; একে আরবীতে বলা হয় "হিসাব আল খাত্তায়েন"। আলখাত্তায়েনই ইউরোপের মধ্যযুগে আলকাটায়েম (elchataym) এ রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্যতম ইউরোপীয় গণিতবিদ প্যাসোলি (Paciolio) তাঁর সুমা (Suma) গ্রন্থেও আলকাটায়েম পন্থার উল্লেখ করেছেন। বস্তুত অনেকদিন পর্যন্তই এ পন্থার প্রচলন ছিল, অনাদরের সামগ্রী হয়েছে খুব বেশী দিন নয়।

ইংরেজীতে এ প্রথাকে Rule of position, Rule of false, Rule of double false position প্রভৃতি বলা হোত। ইতিহাস হিসাবেই এর যা খ্যাতি, তা ছাড়া আর কোন সার্থকতাই এর অবশ্য নাই।

এর পর দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণগুলির বিভিন্ন প্রকার প্রতিজ্ঞার শ্রেণী বিভাগ করে, সেগুলোর সহজতম সমাধান প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। আলখারেজমি দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিই আজকালকার বীজগণিতে পরিদৃষ্ট হয়। বর্তমানে প্রচলিত প্রতীক চিহ্নাদি ব্যবহার করলে, এগুলো দাঁড়ায় (১) $ax^2=bx$ (২) $ax^2+c=bx$ (৩) $ax+c=bx^2$ (৪) $ax^2+bx=c$ (৫) $ax^2=b$ (৬) $ax^2=bx+c$ দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণে অনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশের মধ্যে যে সকল প্রতিজ্ঞা উপস্থাপিত হতে পারে, সে সবগুলিই এর কোন না কোনটার মধ্যে পড়বেই। উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে (২), (৩), (৪) সাধারণ দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণ (Quadratic Equation)। এই সাধারণ সমীকরণের সমাধান প্রণালী হিসাবে বর্তমানে দুইটি ফরমুলা স্কুল পাঠ্যপুস্তকে প্রচলিত। তন্মধ্যে একটিই সাধারণত সর্ব সময়ে ব্যবহৃত হয়, অন্যটির ব্যবহার দেখা যায় কচিৎ। এই অল্প ব্যবহৃত সমাধানটি একাদশ শতাব্দীর ভারতীয় মনীষী শ্রীধর আচার্যের প্রবর্তিত। দ্বিতীয় ফরমুলার আবিষ্কারকের নাম পাঠ্যপুস্তক সমূহে উল্লিখিত হলেও, সাধারণত প্রচলিত সহজ

ফরমুলার আবিষ্কর্তার নাম কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। এই সহজ প্রণালীই আলখারেজমি কর্তৃক প্রবর্তিত হয়।

শ্রীধর আচার্যের প্রণালী সম্পূর্ণ ভারতীয়, শুধু অঙ্কের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। ধরা ছোঁয়ার উপযুক্ত কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীত ঔপপত্তিকভাবে সমস্যার সমাধান করা ভারতীয় মনীষীদের কল্পনা প্রবণতারই পরিচায়ক। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণও অবশ্য এদিক দিয়ে কম যান নাই। ঔপপত্তিক সমাধানে তাঁদের চিন্তাশক্তি কত উন্নত ছিল, সে বোঝা যায় আলখারেজমির এই সহজতম সমাধানের উদ্ভাবনেই। আজকালকার চিহ্ন অনুসারে তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালী নিম্নলিখিত ভাবে লেখা যাবে :—

Equation ধরা যাক $x^2+px=q$

গ্রন্থকারের মত অনুসারে অনির্দিষ্ট সংখ্যাটির প্রথম শক্তির গুণীতকের অর্ধেককে বর্গ করে দুই দিকে যোগ করে দিতে হবে। তা হোলে একদিকে হবে একটি পূর্ণ বর্গ। দুই দিকে বর্গমূল করলে সহজেই অনির্দিষ্ট সংখ্যাটি বের হয়ে পড়বে। এস্থলে অনির্দিষ্ট সংখ্যার প্রথম শক্তির গুণীতকের অর্ধেক $\frac{1}{2}p$কে বর্গ (square) করে দুইদিকে যোগ করে দেওয়া হোলে, এ দাঁড়াবে $x^2+px+\frac{1}{4}p^2=q+\frac{1}{4}p^2$.

অর্থাৎ $(x+\frac{1}{2}p)^2=q+\frac{1}{4}p^2$

দুই দিকেই বর্গমূল করলে $x+\frac{1}{2}p=\sqrt{q+\frac{1}{4}p^2}$

অতএব $x=\sqrt{q+\frac{1}{4}p^2}-\frac{1}{2}p$

এই নিয়মটি $\pm$ চিহ্ন সহ সাধারণত প্রচলিত।

আলখারেজমি এবং তাঁর পরবর্তী অন্যান্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ শুধু কল্পনার উপর নির্ভর করে ঔপপত্তিকভাবে এসবের মীমাংসা করেই ক্ষান্ত হন নাই, বাস্তবের সঙ্গেও এদের মিশ খাইয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। সমীকরণগুলির সমাধান যে শুধু উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত কল্পনা সমাহিত সংখ্যারই ইন্দ্রজাল নয়, জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যেও একই সমাধানে উপনীত হওয়া যায়, একথাটি তাঁরা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ হিসাবে গ্রীক পন্থারই অনুসরণ করা হয়েছিল বলা যেতে পারে। আলখারেজমির বীজগণিতের যতটুকু আজ পর্যন্ত জানা গিয়েছে তাতে দেখা যায় প্রায় সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলিই জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে সমাধান করা হয়েছে। জ্যামিতিক অঙ্কনও খুবই সরল। শুধু একটি বর্গক্ষেত্রেরই (Square) সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া অনেক স্থানেই একই চিত্রের সাহায্যে, শুধু স্থানে স্থানে রদ বদল করে এমন সুন্দরভাবে প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞার আলোচনা হয়েছে যে এতে গ্রন্থকারের বীজগণিতে অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভা দেখে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। এই জন্যেই কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে আরবেরা জ্যামিতি ছাড়া বীজগণিতের বিষয় ভাবতেও পারতেন না। জ্যামিতি ছাড়া যে বীজগণিত হতে পারে সে তাঁদের কল্পনারও বাইরে। *

* "Arabs indeed were primarily geometers, they did not then conceive an Algebra existing by itself and not based on geometry" (Lagacy of Islam p. 383).

এ সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। এমনিতে ভারতীয় বীজগণিতের উপর ভিত্তি করেই আরবদের বীজগণিতের উৎপত্তি, এ কথা স্বীকার করলে এ সন্দেহ গোড়াতেই ধূলিসাৎ হওয়া উচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতীয় গণিতবিজ্ঞানে বীজগণিতের নিয়মাবলী সম্পূর্ণভাবে সংখ্যার কাজ নিয়ে। জ্যামিতিক অঙ্কণাদির কোন নামগন্ধও তাতে পাওয়া যায় না। তাঁদেরই জ্ঞান শিষ্য হয়ে আরবীয় বিজ্ঞানবিদ্গণ যে তাঁদের প্রদর্শিত সহজসাধ্য উপায়গুলি একেবারে উপেক্ষা করবেন সে অবিশ্বাস্য। ভারতবর্ষের পুরাকালের গণিতবিদ্ এবং মুসলিম গণিতবিদ্দের বীজগণিতের পার্থক্য আলোচনা করতে যেয়ে Rodet বলেছেন "The Hindus were more analytical than the Arabs, less pure geometers; *they had in addition the idea of double sign; they transfer more easily a term from one side of an equation to the other,* method with them is thus beginning to generalise. It must, however, be recognised that as regards exposition, their language, pompous and encumbered by its verse form, has not the clearness, exactness and scientific simplicity of that of the Arabs" [Legacy of Islam P. 383].

উপরোক্ত মন্তব্যের নিম্নরেখ মতবাদের উপর ভিত্তি করেই

কারা-দ্য-ভো মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, আরবীয়েরা সমচিহ্নের একধার থেকে অন্যধারে সংখ্যা পরিবর্তন করতে অঙ্কের যোগবিয়োগ চিহ্নের যে রদবদল হয় সে কথা সম্পূর্ণভাবে বুঝতেন না। এরূপ মন্তব্য যে সম্পূর্ণ আনুমানিক, Algebraর আরবী নামকরণ থেকেই সে কথা উপলব্ধি করা যায়। "আলমোকাবেলা', শব্দের তাৎপর্য ভুল অনুবাদের জন্যই যে এই ভ্রমপূর্ণ মতবাদের উৎপত্তি সে বললে অন্যায় হবে না। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ যে যোগ বিয়োগের চিহ্নের রদবদলের কথা ভালভাবেই জানতেন সে আলখারেজমির Quadratic equationএর solution থেকেই ভালভাবে বোঝা যায়। এই সাধারণ প্রচলিত সমাধান ছাড়া, দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের আলখারেজমি প্রদত্ত অন্যান্য সমাধানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একথা আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে। জ্যামিতিকে যেমন বীজগণিতের সমস্যা সমাধানের জন্য টেনে নেওয়া হয়েছে বীজগণিতকে এমন কি শুদ্ধ গণিতকেও তেমনি জ্যামিতিক সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই দিক দিয়ে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের গুরু গ্রীক এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকে একেবারে ছাড়িয়ে গেছেন বলা যেতে পারে। বীজগণিত, গণিত এবং জ্যামিতির মধ্যেকার সামঞ্জস্যের কথা এখন আর কাউকে বিশেষ করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। একের ছাড়া অন্যের অগ্রসর হওয়া অসম্ভব কিন্তু পুরাকালের বৈজ্ঞানিকগণ এদের এমনি মিশ খাইয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁরা অঙ্কশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখাকে ভিন্ন ভিন্ন

কুক্ষিগত করে রেখে অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথা প্রচলন করে ফেলেন। এরই পাল্লায় পড়ে অঙ্কশাস্ত্রও মুক্ত উদার পথে এগিয়ে যেতে পারেনি বরং পথে পথে বাধা পেয়েছে। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের হাতেই এর মুক্তি হয়।*

আলখারেজমির জ্যামিতিক সমাধানের অভিনবত্ব অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে তাঁর স্থান অনেক উচ্চেই স্থাপন করেছে। জ্যামিতির সাহায্য নিয়ে সাধারণ দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের (Quadratic Equation) তিনি কিরূপ সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন, একটি উদাহরণ দিলে সে কথা বেশ বোঝা যাবে।

$x^{২}+১\ x=৩৯$ সমীকরণটীর সোজা বীজগণিতিক নিয়মে আলখারেজমির প্রথা ব্যবহার করলে সমাধান দাঁড়াবে

$$x=-\frac{১০}{২}+\sqrt{\frac{১০০}{৪}+১\times ৩৯}$$
$$=-৫+\sqrt{২৫+৩৯}=\sqrt{৬৪}-৫=৮-৫=৩,$$

---

* In the use of Arithmetic and Algebra in Geometry and vice versa, the solution of Algebraic problems with the aid of Geometry, the Arabs far outstripped the Greeks as well as the Indians. To the Arabs is due the honour of having recognised and emphasised as an obstacle the strict distinction between arithmetical (discontinuous) and geometrical (continuous) magnitude which had so severely impeded the fruitful development of Mathematics among the Greeks. (Encyclopædia of Islam. Article Handasa by Suter.)

এটি হোল সংখ্যার রদবদল দিয়ে, বাস্তবে এর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। একেই যে জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে বাস্তবের মধ্যে সুন্দর ভাবে ফলিয়ে তোলা যায়, এই সাধারণ সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে, গণিতবিদ সেটিও দেখিয়ে দিয়েছেন। যে জ্যামিতিক অঙ্কনের অনুসরণ করা হয়েছে সেটিও বেশ কৌতুহলপ্রদ। প্রথমেই সমীকরণটিকে কাটখোট্টা অঙ্কশাস্ত্রের শুদ্ধ সংখ্যার মারপ্যাঁচ হিসাবে না নিয়ে, সরস করে তোলবার জন্যে একটি সমস্যা হিসাবেই উপস্থিত করা হয়েছে। কোন একটি বর্গ এবং তার বর্গমূলের দশগুণ একত্রে মিলে উনচল্লিশ দিরহামের সমান। এই বর্গটির মূল্য কত এবং তার বর্গমূলই বা কত? একটি বর্গকে সেই অনির্দিষ্ট বর্গ ধরা যাক। মনে করুন "ক" সেই অনির্দিষ্ট বর্গ। "ক"এর প্রত্যেক বাহুই তা হলে এক এক বর্গমূল হবে। প্রত্যেক বাহুকে যে কোন একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণ ফল হবে পূর্বের বর্গের সঙ্গে ততগুলি ৪ বর্গমূল যোগ করার যোগফল।
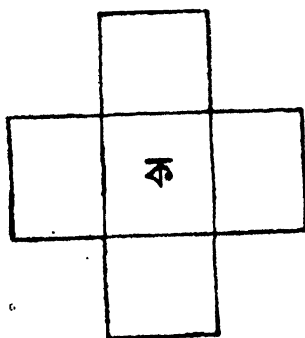
(১)

যেমন মনে করুন "ক" এর প্রত্যেক বাহু হল x এই x কে যদি ৩ দিয়ে গুণ করে উদ্ভূত জ্যামিতিক অঙ্কনটি সম্পূর্ণ করা যায়

তা হলে এই বর্গের প্রত্যেক ধারে ৩x পরিমাণের একটি আয়তক্ষেত্র হবে অর্থাৎ "ক" এর সঙ্গে সর্বসমেত ১২x যোগ করার মত হবে। ফল কথা যত দিয়ে গুণ করা যাবে তার চার গুণ সব সময়েই পাওয়া যাবে। আমাদের সমস্যার মধ্যে ১০ বর্গমূলের মূল্য দেওয়া হয়েছে। 'ক' বর্গের সঙ্গে ১০ বর্গমূল যাতে যোগ করা যায় তারই ব্যবস্থা করার দরকার। পূর্বে দেখা গিয়েছে যে যত দিয়ে গুণ করা যাবে তার চার গুণ পাওয়া যাবে। ১০ পেতে হলে, ১০ এর ৪ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২·৫ দিয়ে প্রত্যেক বাহুকে গুণ করলেই হবে। "ক" এর প্রত্যেক বাহুর উভয় দিকে ২·৫ গুণ বর্ধিত করে প্রথম চিত্রটি শেষ করলে যে ক্ষেত্রটি দাড়াবে তার পরিমাণ ফল হল x^2+১০x (১নং) চিত্রের বহির্দেশের অংশ সম্পূর্ণ করলে এও একটি বর্গ
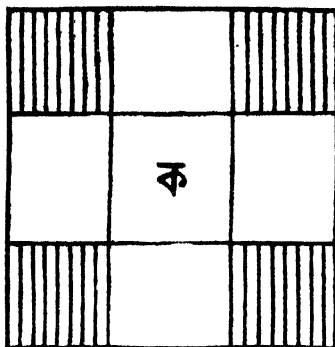
(২)

(square) দাঁড়াবে (২নং চিত্র)। তার ক্ষেত্রফল হল (x^2+১০x) এর সঙ্গে চারদিকে ২·৫ পরিমাণের ৪টি বর্গ। এই ছোট ছোট বর্গের ক্ষেত্রফল হোল ২·৫ × ২·৫ = ৬·২৫, ৪টি বর্গের ক্ষেত্রফল হবে ২৫। তা হোলে বৃহত্তম সম্পূর্ণ বর্গটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে (x^2+১০$x+$২৫)। আমাদের সমস্যা অনুসারে x^2+১০x এর

মূল্য হোল ৩৯। অতএব বৃহত্তম বর্গটির সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল হবে ৩৯+ ২৫=৬৪। যে বর্গের বর্গফল ৬৪, তার বর্গমূল হোল ৮, এ সাধারণ নিয়ম অনুসারেই জানা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে বৃহত্তর বর্গের, এক একটি বাহুর পরিমান হোল ৮, এর দুইদিককার অংশ হোল পূর্বেকার ক্ষুদ্রতর বর্গের বর্ধিত অংশ মাত্র, অর্থাৎ প্রত্যেক দিক ২.৫ করে। তা হোলে সর্বসমেত দুইদিককার বর্ধিত অংশের পরিমাণ হোল ৫। অতএব অনির্দিষ্ট বর্গের বাহু হবে (৮—৫)=৩। এ থেকেই প্রমাণ হোল যে সমীকরণের অনির্দিষ্ট সংখ্যার মূল্যও ৩। প্রথম প্রথম একে একটু ঘোরাল বলেই মনে হয়। তবে এ ঠিকই যে এতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে পঙ্গু করে রাখা হয় নাই, বরং তাদের সহজাত অনুসন্ধিৎসা আরও উদ্দীপ্ত করে তোলা হয়েছে এমনি ভাবে সমাধানের ব্যবস্থা করে। ফ্রমুলার মত বিধিবদ্ধ একটি নিয়ম থাকলে আর কোন উপায় নির্ধারণ করবার প্রবৃত্তি সর্বসাধারণের হয় না, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ. চর্বিত চর্বন সব সময়ে প্রশংসার যোগ্য নয়; তাতে তাদের প্রকৃতিগত বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

অন্যপ্রকার দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণেরও প্রায় সবগুলিতেই যে আলখারেজমি জ্যামিতির সাহায্য নিয়েছেন সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর নানা প্রকারের সমীকরণের মধ্যে অন্যতম একটির রূপ, বর্তমানে প্রচলিত প্রতীক চিহ্নাদির ব্যবহারে দাঁড়াবে $x^2+q=px$ এটি আমাদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে দ্বিতীয়

শ্রেণীর। এটিকে যে রকম ভাবে সমাধান করা হয়েছে তার বিশ্লেষণে সংক্ষেপে দাঁড়ায় :—

$$(\tfrac{1}{2}p)^2-(\tfrac{1}{2}p-x)^2=x(p-x)=px-x^2=q$$

এ থেকে $x=\tfrac{1}{2}p+\sqrt{\tfrac{1}{4}p^2-q}$ ৩নং চিত্র

উপরোক্ত সমীকরণে ব্যবহৃত একটি জ্যামিতিক সমাধান উল্লেখ করা হয়ত এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যদিও প্রথম প্রকারের সমীকরণের মতই এখানেও একটি বর্গ ক্ষেত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তবুও এর মধ্যে বেশ একটু অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। অন্যগুলির মতই সমীকরণটিকে সমস্যা হিসাবে উল্লেখ

(৩)
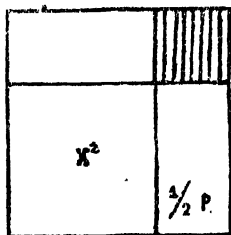
করা হয়েছে। সমস্যাটি হোল, একটা বর্গ একুশ দিরহামের সঙ্গে যোগ করলে যোগফল হয় দশ বর্গমূলের সমান। বর্গমূলটি কত? বীজগণিতিক ভাষায় এ দাঁড়াবে $x^2+২১=১০x$ গ্রন্থকার বিষয়টিকে সাধারণের বোধগম্য করবার জন্যে কি আয়াস স্বীকার করেছেন সমাধানগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই সে কথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই সমস্যাটির গ্রন্থকার বর্ণিত সমাধানের পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া গেল, এ থেকেই বোঝা যাবে এ দিকে তাঁর কি নিবিড় আগ্রহ ছিল।

"কগ কে প্রদত্ত বর্গ ধরে নেওয়া যাক্। এর সঙ্গে অন্য এমন একটি আয়ত ক্ষেত্র যোগ করে দেওয়া যাক্ যার প্রস্থ কগ

বর্গের বাহুর সমান। টখ যেন সেই আয়তক্ষেত্র। এর টঠ বাহু কগ বর্গের বাহুর সমান। এই দুইটি মিলিত ক্ষেত্র লম্বায় টঘ এর সমান। টঘ এর দৈর্ঘ দশ সংখ্যার সমান হবে, কেননা প্রত্যেক বর্গের বাহু ও কোণগুলি সমান। এর এক বাহুকে এক
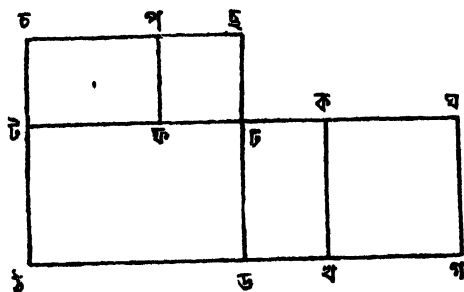
দিয়ে গুণ করলে, বর্গের বর্গমূলের সমান হবে, দুই দিয়ে গুণ করলে, বর্গমূলের দ্বিগুণ হবে। সমস্যায় বলা হয়েছে যে, একটি বর্গ এবং একুশ সংখ্যা একত্রে মিলে দশ বর্গমূলের সমান। এ থেকে ঠিক ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, টঘ এর দৈর্ঘ দশ সংখ্যা কেননা কগ বর্গের প্রত্যেক বাহু এক বর্গমূলের সমান। টঘ রেখাকে ঢ বিন্দুতে সম দুই ভাগে ভাগ করা যাক্, তা হোলে ঢঘ রেখা টঢ রেখার সমান হবে। আবার ডঢ, গঘ এর সমান। এখন ডঢ এর সঙ্গে, ঢঘ থেকে ডঢ় এর বিয়োগ ফলের সমান অংশ যোগ করে দিয়ে বর্গটিকে সম্পূর্ণ করা যাক্। তা হোলে ডছ রেখা চছ রেখার সমান হবে। চড বর্গটিই নূতন বর্গ, এর প্রত্যেক বাহু ও কোণগুলি পরস্পর সমান। এক্ষণে ডছ বাহু হোল পাঁচ

অতএব, বর্গের অন্যান্য বাহুগুলিও পাঁচ। তা হোলে বর্গটি হবে পঁচিশ। সমস্যার বর্গমূলের সংখ্যার অর্ধেককে সমসংখ্যা দিয়ে গুণ দিলেই এটি পাওয়া যাবে কেননা ৫×৫=২৫। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত আয়ত ক্ষেত্রটি হোল একুশ। টখ আয়তক্ষেত্রের ডছ রেখা দ্বারা একটি অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে (ডছ, চড বর্গের এক বাহু) এখন মাত্র ডক অংশটুকু বাদ আছে। চছ থেকে ঢছ সমান করে ছপ অংশ কেটে নেওয়া যাক্। তা হোলে, পচ, ডঢ এর সমান হবে। তা ছাড়া ছচ থেকে কর্তিত অংশ ছপ ও ছঢ এর সমান ; অতএব চফ আয়তক্ষেত্র, ডক আয়তক্ষেত্রের সমান। দেখা যাচ্ছে টড আয়তক্ষেত্রে সঙ্গে চফ ক্ষেত্রটি যোগ করলে যোগফল টখ আয়তক্ষেত্রের সমান হবে। কিন্তু টখ আয়তক্ষেত্র হল একুশ, আবার চড বর্গটি হোল পঁচিশ। এখন চড বর্গ থেকে টড আয়তক্ষেত্র এবং চফ আয়তক্ষেত্র বাদ দিলে ছোট্ট পঢ বর্গটি পাওয়া যাবে। অতএব পঢ বর্গটি হবে (২৫—২১)=৪ অতএব বর্গমূল হোল দুই, এই বর্গের বর্গমূল, ফঢ রেখা দ্বারা প্রকটিত; ফঢ, ঢক এর সমান। প্রথমেই দেখা গেছে ঘঢ রেখা হোল সমস্যার বর্গমূল সংখ্যার অর্ধেক, এ থেকে ঢক বাদ দিলে কঘ রেখা পাওয়া যাবে, অতএব কঘ হবে (৫—২)=৩, এই হোল পূর্বেকার বর্গের বর্গমূল। এখন যদি ঘঢএর সঙ্গে ঢফ যোগ করে দেওয়া যায় তা হোলে, ঘফ পাওয়া যাবে। অতএব ঘফ হবে ৫+২=৭ এ হবে অন্যতম বৃহত্তর বর্গের

বর্গমূল। এই বৃহত্তর বর্গের সঙ্গেও একুশ যোগ করলে যোগফল হবে দশ বর্গমূলের সমান।”

এ গ্রন্থে শুদ্ধ বীজগণিত ছাড়া যে অন্য জিনিসেরও অবতারণা করা হয়েছে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তবে অবান্তর হোলেও সেগুলোর গণিতিক মূল্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। উদাহরণ স্বরূপ পরিমিতির (mensuration) কথা বলা যেতে পারে। পরিমিতি হিসাবে ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, বৃত্ত, পিরামিড প্রভৃতির আয়তন, পরিধি ইত্যাদি নিরূপণের প্রণালী নিয়ে গ্রন্থকার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এগুলির গণিতিক মূল্য কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। গ্রন্থে আলোচিত পরিমিতির কিছু উধৃত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

বৃত্তের পরিধি সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন “বৃত্তের ব্যাসকে (Diameter) ৩$\frac{১}{৭}$ দিয়ে গুণ দিলে পরিধি পাওয়া যাবে; এ যে গণিতিক নিখুঁত তা বলা চলে না। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে একে অনুসরণ করা চলবে। জ্যামিতিবিদরা অন্য দুইটি পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হোল ব্যাসকে বর্গ করে সেই বর্গকে ১০ দিয়ে গুণ করলে যে গুণ ফল পাওয়া যায় তারই বর্গ মূল আর একটি হোল ব্যাসকে ৬২৮৩২ দিয়ে গুণ করে ২০০০০ দিয়ে ভাগ দেওয়ার ভাগ ফল। শেষোক্তটি জ্যোতির্বিদরাই বেশী ব্যবহার করেন তবে এই দুইটির ফল প্রায় একই রকমেরই”। জ্যামিতিবিদ বলতে গ্রন্থকার কাদের লক্ষ্য করেছেন স্পষ্ট বোঝা যায় না এই তিনটি ফরমূলা সংক্ষেপে দাঁড়াবে :—

(১) পরিধি $= ৩\frac{১}{৭}$ ব্যাস $=$ ৩·১৪২৮ ব্যাস

(২) পরিধি $= \sqrt{১০\ (\text{ব্যাস})^{২}} =$ ৩·১৬২২৭ ব্যাস

(৩) পরিধি $= \frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ ব্যাস $=$ ৩·১৪২১ ব্যাস

আলখারেজমির মতে "বৃত্তের পরিধির অর্ধেককে ব্যাসের অর্ধেক দিয়ে গুণ করলেই, বৃত্তের আয়তন (area) পাওয়া যাবে কেননা প্রত্যেক সমবাহু ও সমান কোণ বিশিষ্ট বহুভূজই যথা, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, পঞ্চভূজ প্রভৃতির আয়তন, সেই বহুভূজেরই মধ্যবৃত্তের (middle cricle that may be drawn through it) ব্যাসের অর্ধেককে পরিধির অর্ধেক দিয়ে গুণ করলেই পাওয়া যায়। যদি কোন বৃত্তের ব্যাসকে বর্গ করে তা থেকে $\frac{১}{৭}$ অংশ এবং $\frac{১}{৭}$ এর $\frac{১}{২}$ অংশ বাদ দেওয়া যায় তা হোলেও একই ফল পাওয়া যাবে।" সংক্ষেপে গ্রন্থকারের মতে বৃত্তের আয়তন হোল :—আয়তন $= \pi \frac{(\text{ব্যাস})^{২}}{৪} = \frac{২২}{৭ \times ৪} (\text{ব্যাস})^{২} =$ $(১ - \frac{১}{৭} - \frac{১}{২} \times \frac{১}{৭})\ (\text{ব্যাস})^{২}$।

গ্রন্থকার চতুর্ভূজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে তাদের আয়তন বের করবার উপায় নির্ধারণ করেছেন। পাঁচটি ভাগ যথাক্রমে (১) বাহুগুলি পরস্পর সমান এবং কোণগুলি প্রত্যেকটি এক সমকোণ squre □; (২) কোণগুলি সমকোণ তবে বাহু অসমান Rectangle ▭; (৩) বাহুগুলি সমান কিন্তু কোণগুলি অসমান Rhombus ◇ ; (৪) বিপরীত বাহুগুলি সমান কিন্তু কোণগুলি অসমান Rhomboid ▱ ; (৫) কোণ ও বাহু সবই

অসমান ▯। শুধু চতুর্ভুজ নয়, ত্রিভূজের বেলায়ও এমনি প্রথমে ভাগ করে নিয়ে তারপর তাদের প্রত্যেকটির আয়তন নির্ধারণ করবার প্রণালী স্থির করেছেন। ত্রিভূজকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন, সূক্ষ্মকোণী, স্থুলকোণী ও সমকোণী। সমকোণী ত্রিভূজের কর্ণের বর্গ যে অন্য দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান গ্রন্থকার প্রথমেই সেকথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এইটি হোল এর বিশেষত্ব।* ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ ছাড়া পিরামিড প্রভৃতির সম্বন্ধেও গ্রন্থে সবিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত জ্যামিতিক সমস্যা সমূহে বীজগণিত ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রিভূজের তিনটি বাহু থেকে তার দৈর্ঘ নির্ণয় করতে তিনি বীজগণিতের মত একটি অজ্ঞাত সংখ্যার (unknown quantity) আমদানী করে একটি সমীকরণের উদ্ভব করেছেন এবং তা থেকেই এর সমাধানও করেছেন।

দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধানে যে সমস্ত পন্থা আলখারেজমি তাঁর বীজগণিতে বর্ণনা করে গেছেন অদ্যাবধি সেগুলো অভ্রান্ত বলেই চলে আসছে। তবে এখন তাঁর জ্যামিতিক সমাধানের কোন প্রাধান্যই দেওয়া হয় না। বিদ্যার্থীর

---

* (The peculiarity of the rectangular triangle is that if you multiply each of its two short sides by itself and then add together, then the sum will be equal to the long side multiplied by itself. Translation of Algebra of Muhammad Ben Musa ; F, Rosen. Page 77).

সুকুমার মনের উপর কতকগুলো ফরমুলা চাপিয়ে দিয়ে আজকাল বীজগণিতের প্রথম শিক্ষা সুরু হয়। বাস্তবে এদের কতটুকু মূল্য আছে কিংবা বাস্তবের সঙ্গে এদের মিশ খাইয়ে দেওয়া যায় কি না সে সম্বন্ধে কোন প্রচেষ্টাই হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পীসার বিখ্যাত গণিতবিদ Leonardo Fibonacciর মতে আরব বৈজ্ঞানিকদের বীজগণিত ভারতীয় এবং গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের বীজগণিত অপেক্ষা অনেক উন্নত, সুশৃঙ্খলিত ও বিশদভাবে আলোচিত। তিনি মিশর, সিসিলি, সিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করে আরবদের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। নিজে বিশিষ্ট বীজগণিতবিদ, তাই এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতায় সন্দেহ করবার কিছু নাই। সে হিসাবে তাঁর মতকে নিতান্ত উপেক্ষা করা যায় না। লিওনার্ডোর বিখ্যাত গণিত পুস্তক Liber Abaci পনর পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এর শেষ পরিচ্ছেদে বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় তিনি হুবহু আলখারেজমিকে অনুসরণ করেছেন। আলখারেজমি দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণগুলিকে যে ছয় ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন, লিওনার্ডোও সেই ছয় প্রকারের কথাই উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের বেলায়। এতে মনে হয়, তিনি আলখারেজমির পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছেন। লিওনার্ডোর মত আলখারেজমির পরবর্তী আরবীয় বৈজ্ঞানিকদের উপরেও এই গ্রন্থখানির বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। সিনান বিন ফতেহ, আবু আবদুল্লাহ বিন আল সৈয়দানি, আবুলওয়াফা, আবু কামিল সুজা

বিন আসলাম, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণ তাঁদের গ্রন্থে বহুবার আলখারেজমির বীজগণিতের কথা উল্লেখ করছেন। তা ছাড়া তাঁর ব্যবহৃত সমীকরণ $x^2+১০x=৩৯$, আবু কামিল, আলকারখি, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি গণিতবিদগণ তাঁদের বীজগণিতেও ব্যবহার করেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলখারেজমির দানের কথা পূর্বেই কিছু উল্লিখিত হয়েছে। নিজস্ব গ্রন্থ ছাড়া তিনি "সিন্দহিন্দ"এর দুই সংস্করণ সম্পাদন করেন এবং এর একখানা সংক্ষিপ্তসারও প্রণয়ন করেন।

নিজের এবং সহকর্মী অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার ফল নিয়ে তিনি যে ফলক তৈরী করেন, তার নাম দেওয়া হয় "ফিজিজ"। এই জাতীয় অন্যান্য পুস্তকের মত, "ফিজিজ" শুধু "জিজ" বা ফলক (table) দিয়েই সমাপ্ত হয় নাই, গ্রন্থকার ঔপপত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুন্দরভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নাতিবৃহৎ এক উপক্রমণিকাও এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। তাতে এ বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এবনে আবি ইসাইবার মতে, একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাসলাম বিন আহাম্মদ আল মাজরিতি এই গ্রন্থখানি নিজে সম্পাদন করে পুনর্বার প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রকাশিত সংস্করণটিই লাটিনে অনুদিত হয়। এতে ত্রিকোণমিতি ফলক (Trigonometrical Table)ও দেওয়া হয়েছে। এই ফলকে শিঞ্জিনী (Sine)এর আরবী প্রতিশব্দ "জাইব"এর বহুবার

উল্লেখ দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এই ত্রিকোণমিতি ফলক আলমাজরিতিই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলক নির্মাতা হিসাবে আলখারেজমি তৎকালে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই সময়ে এবং পরবর্তী কালেও আরব বৈজ্ঞানিকগণ তাঁকে "সাহেব-অল-জিজ" নামে অভিহিত করতেন। খুব সম্ভব তিনি অন্য একখানা গ্রন্থে চান্দ্র মাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তা ছাড়া বিখ্যাত পণ্ডিত ইয়াকুতের মতে তিনি পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিন্তু "ফিজিজ" গ্রন্থে এ সব সম্বন্ধে কোন আলোচনাই দেখা যায় না। মনে হয়, এ পুস্তকগুলির অদ্যাপিও সন্ধান হয় নাই।

আলখারেজমি astrolabe সম্বন্ধেও দুইখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। একখানিতে এই বিষয়ের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করবার কৌশল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যখানিতে হয়েছে তাদের ব্যবহার করবার নিয়মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথমখানার নাম হোল "কিতাবুল আমল আলআসতারলাব" (astrolabe প্রস্তুত করবার নিয়ম) দ্বিতীয়খানার নাম হোল "কিতাবুল আমল বিল আসতারলাব" (astrolabe ব্যবহার করবার নিয়ম কানুন)। দুঃখের বিষয় পুস্তক দু'খানার কোন একখানারও মূল আরবী গ্রন্থ বা লাটিন অনুবাদের সন্ধান এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন কারণই নাই। আলফ্রাগানাস "ফি সানাত আল

আসতারলাব বিল হান্দাসা" গ্রন্থে অনেক খগোল সম্বন্ধীয় সমস্যা astrolabeএর সাহায্য নিয়ে সমাধান করেছেন। এ সব সমাধানে আলখারেজমির astrolabeএর পুস্তক দুখানার বহু উল্লেখ দেখা যায়।

সূর্যঘড়ি (আলরুখাম:, sundial) বিষয়েও আলখারেজমির হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এ সম্বন্ধে একখানা পুস্তকও প্রণয়ন করেন, কিন্তু এরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রথম প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা। আলখারেজমিও এদিক দিয়ে কম যান নাই বলে মনে হয়। পণ্ডিতপ্রবর আলতাবারীর গ্রন্থে, আলখারেজিমির জ্যোতিষ চর্চার এক বিবরণ পাওয়া যায়। গল্পটি হোল খলিফা আলওয়াছিক সম্বন্ধে। খলিফা তাঁর শেষ রোগশয্যায় রাজসভার জ্যোতির্বিদগণকে ডেকে পাঠান রোগের ফলাফল জানবার জন্যে। এই জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে আলখারেজমিও ছিলেন। তাঁরা অনেক গবেষণার পরে, খলিফা রোগমুক্ত হয়ে আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন বলে রায় দেন। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয় নাই। কিছুদিন পরই খলিফা মারা যান। আলখারেজমির পরবর্তী নবম শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আবুলমাশারের গ্রন্থেও অনুরূপ একটি গল্প পাওয়া যায় তাঁর জ্যোতিষ আলোচনা সম্বন্ধে। আলখারেজমি নাকি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর জন্ম তারিখের

সঙ্গে তাঁর পয়গম্বর হওয়ার মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্য আছে সেকথা জোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ আলোচনার সুবিধার জন্যে, খলিফা আলমামুনের প্রেরণায় তিনি অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্য নিয়ে আকাশ এবং ভূমণ্ডলের মানচিত্র প্রণয়ন করেন। আকাশের মানচিত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। ভূমণ্ডলের মানচিত্র গ্রন্থকারের ভৌগলিক জ্ঞানের পয়িচয় প্রদান করে। তাঁর ভূগোল গ্রন্থ "কিতাব সুরাত আল আরদ" (পৃথিবীর আকার সম্বন্ধীয় পুস্তক) এর পাণ্ডুলিপি এখনও ষ্ট্রাসবার্গে বিদ্যমান অছে। এর উপরেই ভিত্তি করে এইচ, কনজিক (H. Von Mzik) পুরাকালের আফ্রিকার ম্যাপ তৈরী করেন।

আলখারেজমির সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া এ স্থানে সম্ভবপর নয়। আলমামুনের রাজত্বকালে যে সমস্ত বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন, আলখারেজমি তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাঁর সম্বন্ধে এইটুকুই শুধু এখানে বলা চলবে। আলখারেজমি ও অন্যান্য দুই একজন ছাড়া, এই সময়কার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্যে জগতে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নাই। তাঁদের বিজ্ঞান প্রতিভা এখনও অনাবিষ্কৃত ও উপেক্ষিত গ্রন্থাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সম্পূর্ণ তথ্য উদঘাটিত হবার পর তাঁদের সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হবে।

আলমামুনের মৃত্যুর পরেও প্রায় ১৪ বৎসরকাল আলখারেজমি জীবিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত ৮৪৭ খৃঃ অব্দে এন্তেকাল করেন।

আলখারেজমির সমসাময়িক অন্যান্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আলকিন্দি পাশ্চাত্য জগতে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত। বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি তৎকালীন প্রচলিত বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগই তাঁর মৌলিক দানসম্ভারে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তবে যা তাঁকে সব চেয়ে বেশী খ্যাতি জুগিয়েছে সে হোল দর্শন এবং ধর্মশাস্ত্রীয় আলাচনা। আলকিন্দির পূর্ণ নাম হোল আবু ইউসুফ ইয়াকুব এবনে ইসহাক আল আব্বাস আলকিন্দি। তিনি কুফা নগরে এক সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই আরব পরিবারটি অনেক পূর্বেই কুফায় এসে বসতি স্থাপন করে এবং শিক্ষা দীক্ষার গুণে সমাজের উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করে। কুফায় জন্মগ্রহণ করলেও, আলকিন্দির শিক্ষা আরম্ভ হয় বাগদাদ নগরীতে। এখানকার সুধীজনের সংস্পর্শে এসে তিনি শিক্ষার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। যা'হোক অন্যান্য মুসলমান নামের মত তাঁর নামও শেষ পর্যন্ত "আলকিন্দাস" এ পরিণত হয় ইউরোপীয় ভাষাবিদ্‌দের কল্যাণে। খলিফা আলমামুনের ভ্রাতা মুতাসেমের রাজত্বকালেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় বলতে হবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিই এই সময় রচিত।

আলকিন্দির গ্রন্থাবলীর একটি বিশেষত্ব হোল এই যে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও ভাষার কমনীয়তা একে যেমন সুখপাঠ্য তেমনি চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। অন্যান্য পণ্ডিতদের মত তিনি জটিল বিষয়গুলিকে শুধু পণ্ডিতদের বোধ্য ভাষায়ই অবতারণা করেন নাই। এ হিসাবে সুবিখ্যাত পরিব্রাজক বৈজ্ঞানিক আলবেরুণীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আলবেরুণীর সমস্ত গ্রন্থই সাধারণের দুর্বোধ্য কঠিন আরবীতে লিখিত। সেইজন্যই তাঁর গ্রন্থাবলী সাধারণের মধ্যে তেমন সমাদর লাভ করতে পারে নাই, পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আলকিন্দির গ্রন্থাবলী গ্রন্থকারের জীবিতাবস্থাতেই সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে পড়ে এবং তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়।

আলকিন্দি

আলকিন্দির প্রায় দুইশত সত্তর খানা গ্রন্থের পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে ; তবে শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে খুব বেশী গ্রন্থ তাঁর নাই বলেই মনে হয়। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, জ্যামিতি এবং সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মত, এগুলোও নানা-রকম তথ্য ও ঘটনার সমাবেশে সুখপাঠ্য হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থ ছাড়া, বিজ্ঞানের অন্য বিভাগের মধ্যে পদার্থবিদ্যা এবং গান সম্বন্ধেও তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্গে এদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা মনে করে এই দুই বিষয়ে আলকিন্দির ঔপপত্তিক আলোচনার কথা বিবেচনা

করলে তাঁর অপূর্ব প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। গানের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পরিমাপ সম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয় তিনি প্রায় আটখানা গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। যতদূর জানা যায় আরবদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এরূপ কঠোর দৃষ্টিতে এই সুমধুর বিষয়কে পরীক্ষা করেছেন। পদার্থবিদ্যাতে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা থেকেই। এ সব সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

সাধারণের দুর্বোধ্য জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে সুখপাঠ্য করে তুলতে, এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থকারের কতখানি জ্ঞান এবং আরবীর মত দুর্গম ভাষার উপর কতখানি অধিকার থাকার প্রয়োজন, সে ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। অধীত এবং আলোচিত বিজ্ঞান এবং দর্শন সম্বন্ধে সুবিশেষ জ্ঞান, সেই সঙ্গে গ্রীক এবং আরবী ভাষায় সবিশেষ পাণ্ডিত্যই এই সমস্ত গ্রন্থাবলীকে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেকটা সাহায্য করেছিল বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। বস্তুত তিনি তৎকালে গ্রীকভাষাভিজ্ঞ হিসাবে খুবই সুবিখ্যাত ছিলেন। গ্রীক এবং ভারতের পূর্বেকার মনীষীদের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় এবং আলখারেজমি প্রভৃতি সমসাময়িক প্রতিভার সাক্ষাৎ দর্শন, এ দুয়ের সমাবেশে আলকিন্দির মত অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু শিক্ষাব্রতী যে দর্শন ও বিজ্ঞানে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। তবে বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনেই তাঁর

সমধিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পশ্চাত্য জগতে সেইজন্য "Philosopher of Arab" বা আরবের দার্শনিক হিসাবেই তিনি সুপরিচিত। ৮৭৪ খৃঃ অব্দে এই মনীষীর মৃত্যু হয়।

আলমামুনের পরবর্তী নৃপতিগণের মধ্যেও তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক বাদবিসম্বাদে ঈর্ষা বিদ্বেষের সৃষ্টি সত্বেও এবং অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও শিক্ষার প্রচলনে সব্বার সমপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এ হিসাবে মুসলমান নৃপতিদের সহিষ্ণুতা রাজনীতির দিক দিয়ে কতটা উন্নত চিত্তের পরিচায়ক সে বিষয় অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বিবেচনা করিলেই বেশ বোঝা যাবে। তবে এঁদের অনেকেরই রাজত্বকাল এত কম যে, কার সময়ে বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি হয়ে ছিল সে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সুকঠিন। হয়তো একই বৈজ্ঞানিকের জীবনকালে অনেকগুলি নৃপতির অভ্যুত্থান ও পতন হয়েছে, শুধু একই নৃপতির প্রভাব, বা পৃষ্ঠপোষকতা হয়ত কারুর সারাজীবনের উপর কার্যকরী হয় নাই। তাই আলমনসুর বা আলমামুনের মত কোন খলিফারই বৈশিষ্ট বিশেষভাবে প্রতিভাত হতে পারে নাই। সমগ্রভাবে বিজ্ঞান আলোচনার মধ্যে তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কোন স্থান অধিকার করে রয়েছে নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁদের দু'চার জন যে কাজ করেছেন তাঁদের নিজস্ব সেই কাজের কথাই উল্লেখ করা যাবে।

আলখারেজমির পরে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত যে সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রবিদ বাগদাদের শিক্ষাব্রতের ইতিহাসে অমর কীর্তি রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে আলমাহানী, বনিমুসা ভ্রাতৃত্রয়, ছাবেত এবনে কোরা, আবুল মাশার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সময় থেকেই জ্যামিতি এবং Conics এর দিকেও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়ে এবং অঙ্কশাস্ত্রের এই দুই শাখায়ও আলোচনা আরম্ভ হয়। অবশ্য পূর্বেও যে এর আলোচন হয় নাই তা নয়, কিন্তু এই সময় থেকে ছাবেত এবনে কোরার নেতৃত্বে জ্যামিতির আলোচনা এক নূতন আকার ধারণ করে বলা যেতে পারে।

আলমাহানী বা আবু-আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে ইসা আলমাহানী বাগদাদের তৎকালীন জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থ ছাড়া আর্কিমেডিসের প্রবর্তিত প্রথা অনুসারে গোলক (sphere) সম্বন্ধে গবেষণাই তাঁকে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গোলক সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি অধুনা প্রচলিত সর্ব প্রকার প্রথারই ব্যবহার করেছিলেন এবং সে হিসাবে তাঁকে এগুলির সৃষ্টিকর্তাও বলা চলে। আয়তনের কোন নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে গোলক খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করবার কতকগুলি পন্থা আর্কিমেডিস দেখিয়ে দিয়ে যান, সেইগুলির উপর ভিত্তি করে আলমাহানীও গোলক খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং সে সম্বন্ধে অনেকগুলি অভিনব প্রথারও উদ্ভাবনা করেন। এ প্রথাগুলি এখনও

অঙ্কশাস্ত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। আলমাহানীর প্রতিভার অন্য কোন বিশিষ্ট পরিচয় না থেকে শুধু তাঁর গোলক সম্বন্ধীয় গবেষণাটুকু পৃথিবীতে বর্তমান থাকলেই তিনি বিজ্ঞান জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

অনেক সময়েই দেখা যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা একমুখী না হয়ে বহুমুখী হয়। আলমাহানীর বেলায়ও সে কথা খাটে। অঙ্কশাস্ত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য শাখায়ও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের (Cubic equation) সম্পাদ্যে ত্রিকোণমিতির (Trigonometry) সাহায্য নেওয়া তৎকালে অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌দের ধারণাতীত ছিল বলেই মনে হয়। অন্তত অন্য কেউ যে সে ভাবে কোন সম্পাদ্যের সমাধান করেন নাই, তখনকার অঙ্কশাস্ত্রের যতটুকু পরিচয় এপর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে তাই ধারণা হয়। আলমাহানীই এদিক দিয়ে প্রথম পথ দেখান। গোলক (Sphere) সম্বন্ধে আলোচনা করতে যে বীজগণিতিক ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের উদ্ভব হয়েছে, তার সমাধানে তিনি ত্রিকোণমিতির চিহ্ন, কোণের শিঞ্জিনী (sine) ব্যবহার করেছেন।* বলতে গেলে ত্রিকোণমিতির যখন সূত্রপাতই

আলমাহানী

* [In his stereometric solution of the cubic equation involved in this problem, he made use of the sine of a trihedral angle. History of Mathematics, Smith, Vol. I, P. 171].

হয় নাই সেই সময়ে অন্য একটি জটিল বিষয়ে এর ব্যবহার করা অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলখারেজমি বীজগণিতের দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণ (Quadratic equation) নিয়েই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল কি না জানা যায় না। বোধ হয় তিনি এতদূর পর্যন্ত এগোন নাই। বীজগণিতের এই অন্যতম প্রধান সমস্যার সমাধানের ভার পরে আলমাহানীর উপর। এর পূর্বে ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের কোন আলোচনাই হয় নাই বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। আর্কিমেডিসের গোলক খণ্ড করার মধ্যেই এরূপ সমীকরণের উদ্ভব হয়। যতদূর জানা যায় তিনি conics এর সাহায্যে এর সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে আলমাহানীই এর প্রথম সমাধান করেন। তিনি এ সমস্যাকে এরূপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন যে $x^3+a^2b=cx^2$ এই সমীকরণটি আলমাহানীর সমীকরণ (Al Mahani's equation) নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। এ ধরণের সমীকরণগুলির সমাধান কত জটিল ও দুরূহ সে একটি কথাতেই বোঝা যাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেই এ সবের আলোচনা হয়। নীচের দিকে এদের ধার দিয়েও ঘেঁসা হয় না। দুঃখের বিষয় আলমাহানীর এই সমাধান পন্থাটির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি যে এর সাধারণ সমাধান বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন

কারণই নাই। তাঁর নামে প্রচলিত হওয়াতেই বোঝা যায় যে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই কিছু করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ওমরখৈয়ামের মতে আলমাহানী এর সমাধান করতে সমর্থ হন নাই; সমাধান করেন আবু জাফর আল খাজিন।

ইউক্লিডের জ্যামিতি অনেক পূর্বেই আরবীতে অনূদিত হয়েছিল কিন্তু এ নিয়ে খুব বিশেষ আলোচনা হয়েছিল বলে মনে হয় না। তখন পর্যন্ত হয়ত বৈজ্ঞানিক সমাজ এর মধ্যে গূঢ়ভাবে প্রবেশ করেন নাই। তাই আলমাহানীর পূর্ব পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তেমন উচ্চবাচ্য দেখতে পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায় তিনিই সর্বপ্রথম ইউক্লিডের পঞ্চম ও দশম খণ্ডের ভাষ্য লেখেন। আর্কিমেডিসের গোলক (sphere) এবং cylinder সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর অনুবাদের বেলায়ও সেই একই কথা বলা চলে।

গ্রীকবিজ্ঞানে আর্কিমেডিসের স্থান অনেক উচ্চে কিন্তু তাঁকে ভুলে যেতে গ্রীকদের বেশী সময় লাগেনি। তাঁর আসল নাম আর্কিমেডিসই কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কি ভাবে তিনি এই নামে পরিচিত হন সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। গণিত বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তার জন্যে তিনি গোলমাল সহ্য করতে পারতেন না। এদিকে তার পত্নীর অনেকগুলি দাসী ছিল; তারা অনবরত গজগজ করে তাঁর কাজের ব্যাঘাত ঘটাত। সেইজন্যে তিনি মধ্যে মধ্যে সিঁড়ির কাছে এসে বলতেন, "দেখ মেয়েরা (Hark ye maids) তোমরা যদি ঠাণ্ডা না হও তা হোলে

তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দেব।” “Hark ye maids” কথাটা তিনি এতবার ব্যবহার করতেন যে দাসীগুলো তাঁকে পড়বার ঘরে দেখলেই বলাবলি করত, “ঐরে ঐ Hark ye maids রয়েছে, আয় ভাই আমরা আস্তে আস্তে কথা বলি”। এইরূপে ঐ নূতন নামটা পাড়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আর্কিমেডিস নামে পরিচিত হন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানবজীবনের অন্তত মনীষীজীবনের পরিণামেরও তেমনি পুনরাবৃত্তি ঘটে বলেই বোধ হয়। রাজনৈতিক প্রভাব এড়িয়ে লোকখ্যাতির অন্তরালে যাঁরা নিজেদের মত কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতিভার সমাদর খুব কমই হয় অন্তত তাঁদের জীবনের গোণা কয়টি দিনের মধ্যে। পুরাকালের প্রত্যেক রাজনৈতিক বিপ্লবের সময়েই শিক্ষার এবং শিক্ষিতের প্রতি বর্বর অভিযান ঘটত। আর্কিমেডিসও এমনি একটি বিপ্লবের সময়ে শোচনীয় ভাবে নিহত হন। সভ্যতা-গর্বী রোমানরাই এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। রোম সাম্রাজ্যর মধ্যে কোন সময়েও তাঁর প্রতিভার আদর হয়েছিল বলে মনে হয় না, যদিও এখন তাঁকে অঙ্কশাস্ত্রের দেবতা বলেই রোমেও তাঁর পূজা হয়।*

আর্কিমেডিস

* (One of the Italian historian of Mathematics uses the happy phrase that he had "a genius more divine than human" and Pliny calls him "the God of Mathematics" a phrase which one of his French translators felicitously renders as the Homer of Geometry. History of mathematics, Smith, Vol. I, Page iii).

আর্কিমেডিসের প্রতিভার আদর হয় মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের কাছেই। আলমাহানীর পূর্ব পর্যন্ত আর্কিমেডিসের মতবাদ নিয়ে কেউ বিশেষ আলোচনা করেছেন বলে জানা যায় না। তিনিই প্রথম মুসলিম বৈজ্ঞানিকদিগকে আর্কিমেডিসের উদ্ভাবিত Sphere ও Cylinder সংক্রান্ত অঙ্কশাস্ত্রের এই জটিল শাখার সন্ধান দেন এবং আর্কিমেডিসের গ্রন্থাবলীর উপর ভিত্তি করে নিজের মৌলিক উদ্ভাবনগুলির দ্বারা অঙ্কশাস্ত্রকে নূতন পথে পরিচালনা করেন। এ হিসাবে বর্তমানের অঙ্কশাস্ত্র, অন্তত যে শাখায় Sphere ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়, আলমাহানীর নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

এবনে আল নাজিম "ফিহরিস্ত" গ্রন্থে বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিষয় আলমাহানী আলোচনা করেছেন তার এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে আলমাহানী (১) ইউক্লিডের পঞ্চম পুস্তকের ভাষ্য, (২) সমতা (Proportion) (৩) ইউক্লিডের প্রথম পুস্তকের ২৬ সম্পাগ্য (৪) নক্ষত্র সমূহের অক্ষরেখা (৫) ইউক্লিডের দশম গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং এ সমস্ত ছাড়া বহু গ্রন্থাদিও প্রণয়ন করেন।

বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়

পিতা পুত্র একই প্রকার মনীষা সম্পন্ন বা একই দিকে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, এমন ঘটনা অনেক সময়েই দেখা যায়। বংশানুক্রমে মনীষা ও প্রতিভা বিস্তারের উদাহরণও দুর্লভ নয়, কিন্তু কোন বংশের একই পুরুষের (generation) সবাই একই প্রকার কৃতিত্ব সম্পন্ন, এরূপ ঘটনা জগতের ইতিহাসে বিরল। সহোদর ভ্রাতাদের মধ্যে চেহারার সমসাদৃশ্য যতই থাকুক না কেন, রুচি বা বিদ্যানুরাগে সমসাদৃশ্য কুত্রাপি দেখা যায় না। রুচি বা মানসিক অবস্থার বিসাদৃশ্য স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় কদাচিৎ। নবম শতাব্দীর বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় এই অতি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। বাল্মীকির জীবনের বাগদাদে পুনরভিনয় হয় ভ্রাতৃত্রয়ের পিতা মুসা বিন শাকীরের জীবনে; বাল্মীকির কবিত্ব প্রতিভা, মুসা বিন শাকীরের বিজ্ঞান প্রতিভায় পর্যবসিত হয়ে। তাঁর প্রতিভার পূর্ণ স্ফূরণ হতে পারে নাই নানা কারণে; তবে পিতার এই অস্ফুট প্রতিভা পুত্রত্রয়ের মধ্যেই পূর্ণভাবে বিকাশ পায়। খোরাসানের পথে পথে দস্যুতা, অর্থলোভে নরহত্যা, পথিকের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করাই শাকীর প্রথম জীবনের ইতিহাস। ঘটনাক্রমে খোরাসানে তিনি খলিফা আলমামুনের সংস্রবে এসে পড়েন। তাঁর জীবনেরও পরিবর্তন ঘটে। তিনি আলখারেজমির সঙ্গে খলিফার জ্যোতির্বিদদের দলভুক্ত হয়ে,

বাগদাদে উপস্থিত হন। পূর্বেকার দস্যুবৃত্তির প্রতিভা তখন থেকেই শিক্ষার প্রতি নিয়োজিত হয়। এতদিনের সুপ্ত প্রতিভা নীরব সাধনার উজ্জ্বল দিব্য আলোকে স্নাত হয়ে দস্যুকে সাধক জ্ঞানী হিসাবে জগতের পূজ্য করে তোলে। অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি পড়ে। নীরব দর্শক বা পাঠক হিসাবেই এর শেষ হয় নাই। জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা তাঁর নামকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে জীবিত রেখেছে। তবে সে প্রতিভা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে না, এ বললে অন্যায় করা হবে না।

পিতার অস্ফুট প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় পুত্রত্রয়ের মধ্যে। এই পুত্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে আবু জাফর মোহাম্মদ, আবুলকাসিম আহম্মদ এবং আলহাসান এবনে মুসা বিন শাকীর। তাঁরা যখন নিতান্ত শিশু সেই সময়েই মুসা বিন শাকীরের মৃত্যু হয়। খলিফা আলমামুন ভ্রাতৃত্রয়ের ভার নেন এবং তদীয় বিজ্ঞান সভার অন্যতম সভ্য ইয়াহিয়া বিন আবি মনসুরের হাতে তাঁদের শিক্ষার ভার সমর্পণ করেন। অতি শৈশবকাল থেকেই ভ্রাতৃত্রয় তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্রবে এসে পড়ায়, তাঁদের প্রতিভাও বিজ্ঞানের দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর আস্তে আস্তে যখন খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ হতে সুরু হয়, ভ্রাতৃত্রয় তখন অন্তর্নিহিত জ্ঞানস্পৃহাকে সফল করে তোলবার জন্যে সমস্ত ধন সম্পদ নিয়োজিত করতে থাকেন। তাঁরা পূর্বেকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানের জন্য

গ্রীস, বাইজান্টাইন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তা ছাড়া অর্থ দিয়ে লোক নিযুক্ত করেও দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থ করায়ত্ত করেন। এই পরিভ্রমণের সময়েই হাররানে মোহাম্মদের সঙ্গে মুসলিম বিজ্ঞান জগতের অন্যতম প্রতিভাদীপ্ত ভাস্কর ছাবেত এবনে কোরার সাক্ষাৎ হয়।

ভ্রাতৃত্রয় প্রায় সমস্ত কাজই এক সঙ্গে করে গেছেন, কারুর কোন বিশেষ বিষয়ে একক কাজের সন্ধান পাওয়া যায় না। সমস্ত গ্রন্থাবলী, মৌলিক গবেষণা, প্রায় তিন ভাইএর নামে অথবা অন্তত দুই ভাইএর নামে পাওয়া যাবেই। এতে তাঁদের ভিতরকার সৌহার্দেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কাউকে ছেড়ে বড় হওয়া কি খ্যাতি লাভ করা ভালবাসেন নাই, তাই যা করেছেন সবই একত্রে। যাহোক তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদই সর্বাধিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন বলে মনে হয়। সব শাস্ত্রেই তাঁর সমজ্ঞান ছিল এবং সর্ববিষয়েই তিনি সমান প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। গণিতবিদ হিসাবে আলহাসান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আর আহম্মদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং যন্ত্রকুশলী (especially interested in mechanical and technical problems).

পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৃথিবীকে যখন চ্যাপ্টা ও সমতল প্রমাণ করবার প্রচেষ্টা চলছিল, মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ তখন পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি পরিমাপের চেষ্টা করছিলেন। অধুনাকার ভূগোলের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার কেন্দ্রস্থল গ্রীণউইচ তখনকার ইতিহাসে অজ্ঞাত। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার কল্পনা করে বনিমুসা

ভ্রাতৃত্রয় লোহিত সাগরের তীরে নির্ভুলরূপে ডিগ্রী মেপে পৃথিবীর প্রকৃত আকার ও আয়তন সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরা ডিগ্রীর যে মাপ সঠিক বলে গ্রহণ করেন আরবদের নির্ধারিত মাপের সাথে তার পার্থক্য অতি সামান্য; ঐতিহাসিক গিবনের মতে উহা সম্পূর্ণ ঠিক।*

এর পূর্বে পৃথিবীর আকার ও আয়তন নির্ণয় করবার কল্পনাকে দুঃসাহস ছাড়া বোধ হয় আর কিছু বলা হোত না। সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ না করে আয়তন পরিমাপ করার কল্পনা পাগলামি বই কি? বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের এই অভিনব পরিকল্পনা থেকেই তখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞান কতটা উন্নত হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। অন্য একটি বিষয় যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে হোল তাঁদের পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ধারণা। পৃথিবীর পরিধি ও আয়তন পরিমাপ করবার প্রচেষ্টা যে, পৃথিবীকে চ্যাপ্টা সমতল ধরে নিয়ে, একস্থানে বসেই কেউ করতে পারে না এ হয়ত কেউ অস্বীকার করবেন না, কিন্তু পৃথিবী যে গোলাকার এ সত্য যে কোন্ সময়কার এবং কার প্রথম আবিষ্কার সে সঠিক জানা যায় না। পাশ্চাত্য জগৎ তখন পৃথিবীকে চ্যাপ্টা প্রমাণ করবারই চেষ্টা করছে, গোলাকার বলে তাদের মস্তিষ্কে কোন কল্পনাই

* (The measurement of a degree which they effected approximates very nearly to the one accepted by modern science; Scott, III 460. "His mathematicians accurately measured a degree" Gibbon VI 35).

স্থান পায় নাই। ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধার করা মতবাদ একে বলা যায় না। এই সময়েই মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর গতি সম্বন্ধেও স্থির নিশ্চয় হন। কিন্তু এর সাত শত বৎসরেরও অধিককাল পরে পৃথিবী ঘুরছে বলে প্রচার করায় ব্রুনোকে ইটালী থেকে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়। ইতালীতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং অবশেষে তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। "সূর্য স্থির পৃথিবী গতিশীল" এই মতবাদের জন্য গ্যালিলিও ইংকুইজিশানের হাতে নানা প্রকার অপমান ও দীর্ঘ কারা যন্ত্রণা ভোগ করেন। ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে পড়েন এবং কিয়ৎকাল পরে বধিরও হন। ১৬৪২ খৃঃ অব্দে বন্দীশালাতেই তাঁর মৃত্যু হোলে, ইংকুইজিশানের কর্তারা দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ভূমিতে তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করতে নিষেধ করেন। তাঁর বন্ধুরা শান্তাক্রজে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে চাইলে পোপের আদেশে তাও নিষিদ্ধ হয়। এর সঙ্গে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অদৃষ্টের কথা বিবেচনা করলে সত্যিই স্তম্ভিত হতে হয়। তখনকার মুসলমানদের ধর্মোন্মাদনা কম ছিল না কিন্তু কোন মুসলমান বৈজ্ঞানিকই ধর্মমত ছাড়া শুধু বৈজ্ঞানিক মতবাদের জন্যেই ধর্মের নামে কোন নিগ্রহ সহ্য করেন নাই। শুধু ধর্মমত ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে পূর্বেকার মতাবলীর সঙ্গে বিসাদৃশ্যের জন্যই কোন প্রকার নির্যাতন কারুর উপর হয় নাই বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

যাহোক পৃথিবীর আকার ও গতি সম্বন্ধে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের কোন অস্পষ্ট ভাবের জড়তা ও সন্দিগ্ধতা যে ছিল না আলমামুনের সময়কার বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টা থেকেই সে বিষয় স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। ভারতবর্ষে এ সত্যের আবিষ্কার হোলেও প্রচার হোতে পারে নাই কেন বোঝা যায় না। ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পুথির পাতার মধ্যেই এ নিবদ্ধ ছিল। সর্বসাধারণে বা বৈজ্ঞানিকেরাও এ সত্যকে বিশেষ আমল দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না; মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বনিমুসা ভ্রাতৃত্রয়ই একে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে নিয়েছেন। তবে তাঁরাই এ মতবাদের প্রকৃত আবিষ্কারক কি তাঁদের পূর্বেই অন্য কেউ এর সন্ধান পেয়েছিলেন সে সন্দেহাতীতভাবে নির্ণীত হয় নাই। তাঁরা এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই পৃথিবীর আয়তন ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা কার্য চালান।

এই সময় বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ করে বনিমুসা ভ্রাতৃত্রয়ের কার্যকারণের ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্টই ধারণা হয় যে বর্তমান বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অপেক্ষা তাঁদের প্রণালী কোন প্রকারেই নিকৃষ্ট ছিল না! বরং তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকদের অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করলে আজকালকার অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান প্রতিভার চেয়ে তাঁদের প্রতিভা অনেক উচ্চ স্তরের বলেই স্বীকার করতে হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। দূরবীক্ষণ ছাড়াও শুধু চোখে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করা কম

প্রতিভার পরিচয় নয়। এ সত্ত্বেও তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ শুধু যে তখনকার দিনের জন্যেই সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছে তা নয়, পাশ্চাত্য জগতের বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতিতে নিরূপিত ফলাফলের সঙ্গে সেগুলোর খুব সামান্যই গরমিল আছে।

ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা (The obliquity of the Ecliptic) সম্বন্ধে এখন কারও সন্দেহের অবকাশ নাই কিন্তু পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের সে সম্বন্ধে জ্ঞান খুব অল্পই ছিল এমন কি ছিল না বললেই চলে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা হয় এই ভ্রাতৃত্রয়ের দ্বারাই। চক্রবাল থেকে চন্দ্রের তুঙ্গত্বের হ্রাস বৃদ্ধির পরিলক্ষণ (variation of the lunar altitude), Apogee, Perigee প্রভৃতি আরও কয়েকটি নব আবিষ্কারের জন্য মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। মানুষের জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এঁদের পূর্বে এসব বিষয়ে কারুর নজর পড়ে নাই। বৎসরের দুইদিন দিবারাত্রি সমান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে সেই দুই দিনই বিষুবরেখা ও আয়নমণ্ডলীর সংযোগস্থল। সূর্যের আহ্নিকগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংযোগস্থলেরও পরিবর্তন হয় এ বর্তমান বিজ্ঞানের নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত। পুরাকালের বিজ্ঞানে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা দেখা যায় না। এ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের দ্বারাই। তাঁদের

মধ্যে কে এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন সে ঠিক জানা যায় না। যতদূর মনে হয় তিন ভ্রাতা এক সঙ্গেই গবেষণা করতেন, এক সঙ্গেই মানমন্দিরে সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করতেন শেষকাল পর্যন্ত তিন ভ্রাতার নামেই সমস্ত আবিষ্কার লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম আবশ্যকীয় প্রতিজ্ঞা হোল Apogee এবং Perigee, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরতম ও নিকটতম স্থান। এই Apogee এবং Perigee সাধারণের মতে স্থির থাকা উচিত কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মতে তারা একেবারে স্থির নিশ্চল নয়। এদের ভ্রাম্যমান অবস্থা আজকালকার পরীক্ষিত সত্য কিন্তু নবম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। প্রথম বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ই এ বিষয় বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানগোচর করেন। যতদূর জানা যায় তাঁরা প্রথম সামারাকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিরীক্ষণ কার্যের কার্যক্ষেত্ররূপে মনোনীত করেন এবং এই স্থানেই তাঁদের প্রথম গবেষণার কাজ চালান। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবনে ইউনুসের গ্রন্থে তাঁদের প্রণীত জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলকের ও সূর্য সম্বন্ধীয় নানা তথ্যের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই তিন ভ্রাতার কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় নবম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। তাঁদের মৃত্যুর সঠিক তারিখ এখনও জানা যায় নাই। তবে যতদূর জানা যায় আবু জাফর মোহাম্মদ ৮৭২-৩ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গ্রীক বিজ্ঞানের অমোঘ প্রভাবের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

যদিও অনেক আগে থেকেই গ্রীকবিজ্ঞান গ্রন্থাবলী আরবীতে অনুদিত হওয়া সুরু হয়েছিল তবুও নবম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তার মোহ শেষ হয় নাই। বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ও গ্রীকবিজ্ঞানের কতকগুলি বিখ্যাত ও দরকারী গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করেন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনায় একই সঙ্গে মনোনিবেশ করা তখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের এক ধর্ম ছিল। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান আলোচনার সুরু থেকে প্রায় প্রত্যেক স্তরেই এই মিশ্রিত আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। তখনকার দিনে এর যতই দরকার থাক না কেন, এতে যে বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ সফলকাম হন নাই সে ঠিকই। একই বিষয়ে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলে যেমন সুবিধা হোত, জ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁদের নিকট যতটা উন্মুক্ত হোতে পারত, নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করায় তা হোতে পারে নাই। তবে একটি বিশেষত্ব তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ প্রশংসার বিষয়। যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন তবুও তাঁদের মধ্যেকার অধুনা পরিচিত বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞানের কোন বিভাগের দানই উপেক্ষার নয়। মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের বিজ্ঞানে দানের কথা বিবেচনা করলেই একথা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের অন্ধ অনুকরণে ভ্রাতৃত্রয়ও বাদ যান নাই। তাঁরাও চিকিৎসা প্রণালী, জ্যামিতি, Conics, পরিমিতি (mensuration) প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন

করেন। তাঁদের সমতলভূমি ও গোলকখণ্ডের পরিমাপ সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলির একখানি জিরার্ড "Liber Trium Fratrum" নাম দিয়ে লাটিনে অনুবাদ করেন। পুস্তকখানি গ্রন্থকারদের পরিমাপ বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বুঝাবার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

বিজ্ঞানের প্রায় সব বিভাগেই ভ্রাতৃত্রয়ের প্রতিভার নিদর্শন বিদ্যমান। পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া জ্যামিতি ও বলবিজ্ঞানেও তাঁদের উচ্চ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী থেকেই। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এঁদের পূর্বে কেউ বলবিজ্ঞান (mechanics) নিয়ে আলোচনা করেন নাই। বস্তুত গ্রীক বৈজ্ঞানিক হীরো (Heron) এর পরে মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত অন্য কোন বৈজ্ঞানিক বলবিজ্ঞানে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে হয় না; এমন কি Pappus ছাড়া আর কেউ এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনাই করেন নাই। পপাসও কোন বিশিষ্ট মৌলিক পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন বলে জানা যায় না। এক কথায় বলবিজ্ঞান হীরোরই উদ্ভাবিত এবং মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর প্রচারিত নিয়মাবলী ও তথ্যগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। হীরোর গ্রন্থাবলী প্রধানত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে। যন্ত্রপাতির নির্মাণ কৌশলে এর যতটুকু প্রয়োজন তার মধ্যেই এ সীমাবদ্ধ। মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের গ্রন্থাবলী ঠিক হীরোর পন্থা অনুসরণ করে নাই; বলবিজ্ঞানের ঔপপত্তিক নিয়ম কানুন,

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির নির্মাণ কৌশল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মৌলিক দান সম্ভারে তাঁদের গ্রন্থগুলি পরিপূর্ণ। বর্তমান বলবিজ্ঞানের, বিজ্ঞান হিসাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের হাতে। হীরোর গ্রন্থই তাঁদের এ নূতন পথে অনুপ্রাণিত করেছিল কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। তবে এই সময়েই কুস্তা-বিন-লুকা আলবালবেকী কর্তৃক হীরোর গ্রন্থখানি আরবীতে অনুদিত হয়। এই কাকতালীয় সম্বন্ধের উপর নির্ভর করেই অনেকে মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে হীরোর নাম করেন। যা হোক এই গ্রন্থখানিই মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল বলে ধরে নিলেও, তাঁদের অনুসৃত পন্থা যে হীরোর প্রচারিত তথ্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। হয়ত গুরুকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেই শিষ্যেরা নিজেদের পথ রচনা করেন এবং মত সুপ্রতিষ্ঠিত করে Mechanics এর নবজীবন দেন। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বয়ং গতিশীল (automata) যন্ত্রপাতি নির্মাণে তাঁদের অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত শুধু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ই নয়, সাধারণত আরব বৈজ্ঞানিকেরা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণে বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যন্ত্রপাতি নির্মাণে এই অসাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি দেখে অনেকেই তাঁদের ঔপপত্তিক উন্নত চিন্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন। এ সন্দেহ যে কতখানি অমুলক সে হয়ত আর বলতে হবে না।

জ্যামিতি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের পূর্ব হতেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং উত্তরোত্তর নব নব জ্ঞান ও নব নব আবিষ্কারে উচ্চ পথেই চলছিল। এই ক্রমপরিবর্ধমান শাখা মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের কৃতিত্বে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কোণকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করা অধুনা ম্যাট্রিকের ছাত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য। এর উদ্ভাবন কর্তা হলেন ইউক্লিড। এই দ্বিখণ্ড হতে চতুর্খণ্ড করা বা তার দ্বিগুণ চতুর্গুণ ইত্যাদি খণ্ডে বিভক্ত করা সম্ভবপর; কিন্তু কোন কোণকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা 'জ্যামিতির একটি অতি উচ্চাঙ্গের বিষয়। এ সম্বন্ধেও মুসা ভ্রাতৃত্রয় আলোচনা করেন। Conchoid ব্যবহার করে কোণকে ত্রিখণ্ডিত করা সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে বোধ হয় তাঁরাই প্রথম পথ প্রদর্শক।

মুসা ভ্রাতৃত্রয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে যে সমস্ত অপূর্ব রত্নসম্ভার উপহার দিয়েছেন তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এস্থানে সম্ভবপর নয়, তা ছাড়া সবগুলির পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই। তাঁদের প্রণীত সমস্ত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ প্রকাশিত হোলে বুঝা যাবে তাঁদের সাধনা কত উচ্চাঙ্গের। এ পর্যন্ত তাঁদের যে সমস্ত গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে পূর্বে বর্ণিত গ্রন্থাবলী ছাড়া ফারাস্তুন (the book on the balance) sphere এর পরিমাপ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ (The book on the measurement of the sphere), দুইটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যেকার সমানুপাত নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ (the book on the determination of mean proportionals between two given quantities) প্রধান। অঙ্কশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন

বিভাগের মধ্যেকার কৃত্রিম পার্থক্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের হাতে নির্মূলভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাই শুদ্ধ জ্যামিতি বা শুদ্ধ বীজগণিত বলতে তাঁদের কারুর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। আংশিকভাবে ভারতীয় এবং গ্রীক পন্থার অনুসরণে শুদ্ধ জ্যামিতির আলোচনা হয়েছে এ পর্যন্ত এমনি দুইখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর একখানা এই ভ্রাতৃত্রয়েরই কৃত। এর ইংরেজী অনুবাদের নাম হোল "The book of the science of the mensuration of plain and spherical figures" এখানা জিরার্ড কর্তৃক লাটিনে অনুদিত হয়। এই লাটিন অনুবাদ ভিত্তি করে M. Curtze একখানি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। এতে সর্বসমেত ১৮টি প্রবন্ধের সমাবেশ করা হয়েছে। বৃত্তের পরিধি, ত্রিভূজের তিনটি বাহু থেকে তার পরিধি নির্ণয়, শঙ্কুর (Cone) আয়তন, গোলকের বাহির ও আভ্যন্তরীন আয়তন, কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ প্রভৃতি বিষয় সম্পূর্ণ গ্রীক ধারানুযায়ী বীজগণিতের ছোঁয়াচ এড়িয়ে এতে আলোচিত হয়েছে। Conics সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করেই এ সম্বন্ধে এখানে সমাপ্ত করা যাবে। উপবৃত্ত (Ellipse) গঠন-প্রণালীতে মৌলিক এক পন্থার উদ্ভাবনের সঙ্গেই এই ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিজড়িত। দুইটি কেন্দ্রের সঙ্গে রশি জড়িয়ে উপবৃত্ত অঙ্কন করবার যে নিয়মটি আজকাল সাধারণের পরিচিত সেটির আবিষ্কর্তা হলেন এই ভ্রাতৃত্রয়ই। উপবৃত্তের সাধারণ ধর্মগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই অঙ্কন

প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণত জ্যামিতিক অঙ্কনের গঠনের উপর নির্ভর করে ধর্মের বিচার হয় কিন্তু উপবৃত্তের বেলায় সে নিয়ম খাটে নাই। এখানে ধর্মের উপর নির্ভর করেই গঠন-প্রণালী স্থিরীকৃত হয়েছে।

বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় রাজনীতিতেও এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং বোধ হয় এই জন্যেই রাজজ্যোতির্বিদ হিসাবে তাঁরা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। তবে বিজ্ঞানে অনুরাগ তাঁদের এই অর্থ ভোগবিলাসে ব্যয় হতে দেয় নি। গ্রীক গ্রন্থাদি সংগ্রহ এবং পূর্বেকার বিজ্ঞান অনুশীলী স্থান সমূহে পরিভ্রমনের নেশা অল্প বয়স থেকেই তাঁদের পেয়ে বসে। এতে যে তাঁদের কোষাগারের একটি মোটা অঙ্কে টান পড়ত সে ঠিকই। এ ছাড়া মানমন্দির নির্মান এবং পর্যবেক্ষণাদি কার্যের জন্যও বেশ ব্যয় হোত। নিজেদের বিজ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্ত করবার জন্যে রাজকীয় মানমন্দির থাকা সত্বেও তাঁরা বাগদাদে নিজেদের গৃহেই তাইগ্রীসের পারে "বাবেল তাকে" একটি মানমন্দির স্থাপন করেন এবং ৮৫০ থেকে ৮৭০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত অক্লান্ত অশ্রান্ত ভাবে পর্যবেক্ষণ কার্য চালান। এমনি অধ্যবসায়ের মধ্যে ভোগ বিলাসের আকাঙ্খা যে ক্ষীণ উঁকি দিতেও সাহস পায়নি সে বলাই বাহুল্য। ভ্রাতৃত্রয়ের আরব্ধ কার্যাবলী তাঁদের পরেও তাঁদের শিষ্যবর্গ কর্তৃক অনুসৃত হোতে থাকে। শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আল নাইরেজী এবং মোহাম্মদ এবনে ইসা আবু আবদুল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাড়া শিক্ষিত সমাজেও চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে। শিক্ষিত সমাজেও এই সময় থেকে আদিব ও আলেমের প্রভেদ গড়ে উঠে। যাঁরা বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি কোন এক শাখায় বিশেষত্বের পরিচয় দিতেন বা কোন এক বিষয় নিয়ে গবেষণায় রত থাকতেন তাঁদের বলা হোত আলেম; এবং যাঁরা কোন এক বিশেষ বিষয় না নিয়ে সমস্ত বিষয়েই সাধারণভাবে আলোচনা করতেন তাঁদের বলা হোত আদিব। তবে আলেম ও আদিবের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা মুস্কিল। যদিও সাধারণত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ও বৈজ্ঞানিকগণকে আলেম শ্রেণীতে ফেলা হোত তবুও তাঁদিকে অন্তত বৈজ্ঞানিকগণের প্রায় সকলকেই, তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে সমজ্ঞানের অধিকারী হওয়াতে এবং কোন এক বিশেষ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ না থেকে সর্ব বিষয়ে আলোচনায় যোগ দেওয়াতে, আদিবের মধ্যেও গণ্য করা যায়। যাহোক এ নিয়ে বিশেষ চুলচেরা কোন হিসেব করা হোত বলে মনে হয় না।

ছাবেত এবনে কোরা

সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে বাইরের সাহায্যেরও অনেক সময় দরকার। অন্তত যেখানে নানা ঘাত প্রতিঘাতের নিষ্পেষণে প্রতিভার স্ফুটনের কোন সুযোগই হয় না, অখ্যাত অজ্ঞাত থেকে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে দরকার কারুর মঙ্গলস্পর্শে আত্মঅবিশ্বাসের হাত থেকে সে প্রতিভাকে নিষ্কৃতি দেওয়া; তবেই সে ফুটবার সুযোগ পায়। উপযুক্ত সুযোগ না পেয়ে অনেক প্রতিভা অমানিশার অন্ধকারের অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে বাইরের সূর্যের আলো দেখবার সুযোগ আর জীবনে আসে নাই। এ শুধু যুগ বিশেষের কথা নয়, সময় বিশেষের কথা নয়, প্রতি যুগে যুগেই এমনি চলে আসছে। কেউ হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে সেই অস্ফুট প্রতিভার সংস্পর্শে এসে পড়লেই হয় তার মুক্তি, জগৎ পায় তার সন্ধান, তার কীর্তিকলাপ হয় ভাস্বর ও দীপ্তিময়। এমনিভাবেই নবম শতাব্দীর অন্যতম মুসলিম গৌরব ছাবেত এবনে কোরার সুপ্ত প্রতিভার মুক্তি ঘটে এবং তিনি বিজ্ঞান জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করতে সমর্থ হন।

ছাবেত এবনে কোরার পূর্ণ নাম হোল আবু হাসান ছাবেত এবনে কোরা এবনে মারওয়ান আলহাররানি। মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত হাররানে জন্ম গ্রহণ করেন বলে আলহাররানি নামেও তিনি পরিচিত। হাররান তখনকার দিনে গ্রহ উপগ্রহের

পূজার পীঠস্থান বলে খুবই বিখ্যাত ছিল। এখানকার এক অভিজাত বংশে ছাবেতের জন্ম হয়। অভিজাত বংশের বংশধর হিসাবে প্রথম বয়সে তিনি বাগদাদে যেয়ে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করেন। প্রধানত দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্র তাঁর অধ্যয়নের বিশেষ বিষয় ছিল। দেশে ফিরে এসে তিনি প্রথম প্রথম টাকার দালালির (Money changer) ব্যবসা করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দর্শনের মতবাদ প্রচার করা সুরু করেন। ব্যবসা সহ্য হোলেও তাঁর দর্শনের উদার মতবাদ আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসীর সহ্য হোল না। তিনি বিচারালয়ে অভিযুক্ত হোলেন। আদালতের রায় হোল সমস্ত মতবাদ পরিবর্তন করতে হবে। প্রতিভা যার মধ্যে থাকে তাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না। আদালতের রায়ের মর্ম শুনে ছাবেত হাররান থেকে পালিয়ে সুদূর দারার নিকটবর্তী কাফারতুসায় চলে গেলেন এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করলেন। এইখানেই মোহাম্মদ বিন মুসা বিন শাকীরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মোহাম্মদ গ্রীক পণ্ডিতদের বিজ্ঞান গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধানে বাইজানটাইন ভ্রমণ করে তখন বাগদাদে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে এই অস্ফুট জ্বলন্ত প্রতিভার সঙ্গে সাক্ষাৎ। জহুরী জহর চেনে। প্রথম আলাপেই ছাবেতের বুদ্ধিমত্তা ও প্রগাঢ় জ্ঞানস্পৃহা দেখে, মোহাম্মদ তাঁকে সঙ্গে করে বাগদাদে নিয়ে আসেন। তখন থেকে জীবনের অধিকাংশ কালই ছাবেত এখানেই অতিবাহিত করেন। তবে সুদূর পল্লীর জন্মভূমি তাঁর মনের ভিতর এক আগ্রহ সব সময়েই উন্মুখ করে

রেখেছিল। তাই জীবনের শেষ অংশে শস্যশ্যামল পল্লীর ক্রোড় তাঁকে সহরের বিলাসিতা ও আরাম ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে শেষ কয়েক বৎসর তিনি হাররানেই অতিবাহিত করেন। ছাবেতের বংশে উত্তরকালে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দশম শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতবিদ ইব্রাহিম এবনে হিলাল এবনে জহরুন আবু ইসহাক আলহাররানী এই হাররানেরই অধিবাসী এবং ছাবেতের অধস্তন পুরুষ।

ছাবেত খুব সম্ভব আলমামুনের রাজত্বকালে ৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (অনেকের মতে তাঁর জন্ম সন হোল ৮৩৬ খৃষ্টাব্দ) এবং ৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ৭৫ বৎসর বয়সে বাগদাদেই এন্তেকাল করেন। যতদূর মনে হয় খলিফা আলমুতাজিদ খলিফার পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই তাঁর সঙ্গে ছাবেতের সাক্ষাৎ ঘটে মোহাম্মদের কল্যাণে। মোহাম্মদ তাঁর প্রতিভার কথা উল্লেখ করে রাজকীয় সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। মুতাজিদ তখনও পিতার অধীন। পিতা যদিও প্রকারান্তরে খলিফা, তবুও খেলাফত অন্যের নাম পরিচালিত তা ছাড়া মুতাজিদও ইদানীং পিতার অসন্তোষ ভাজন হয়ে পড়েছিলেন। অধিকন্তু তখন পর্যন্ত ছাবেতের বিজ্ঞান প্রতিভারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তাই খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুতাজিদ ছাবেতকে তেমন সাহায্য করতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর অকর্মন্য পিতৃব্য সিংহাসন হতে

অপসারিত হোলেই, মুতাজিদ নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রতিভার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ছাবেতের রাজকীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।

বিজ্ঞানের পূর্বাপর সমস্ত খবর না রাখলে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। উদ্ভাবনের ইতিহাস যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন তাঁর পক্ষে কোন্ প্রণালীতে কি দোষ কোন্ প্রণালীতে কি গুণ জানা যেমন সম্ভবপর, পূর্ব-ইতিহাস অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তেমন নয়। বিজ্ঞান পড়তে হোলে বিজ্ঞানের ইতিহাসও জানা দরকার। তখনকার দিনের বিজ্ঞান বলতে যা কিছু প্রায় সবই গ্রীক ভাষায়। যাঁরা গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হোতেন তাঁদের পক্ষে পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানের চর্চা করারও সুবিধা হোত। গ্রীসে অঙ্কের নানা শাখা প্রশাখার মধ্যে জ্যামিতিরই সব চেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছিল বলা চলে। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাঁরা জ্যামিতিতে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের সব্বাই গ্রীকভাষায় খুবই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছাবেতও সেই দলেরই। তিনি গ্রীক ও সিরিয়ান ভাষায় খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তীকালের ওমর খৈয়াম আসলে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হয়েও এবং তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিখ্যাত থেকেও বর্তমানে যেমন কবি হিসাবে সুপরিচিত; ছাবেতও তেমনি তখনকার দিনে একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী চিকিৎসক হিসাবেই পরিচিত থাকলেও উত্তরকালে দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। অঙ্কশাস্ত্রের

মধ্যে জ্যামিতিতে তাঁর অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় হিসাবে এইটুকু বললেই চলে যে অনেকেই তাঁকে আরবীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যামিতিক বলে মনে করেন।

জ্যামিতির প্রথম শিক্ষা ইউক্লিডের জ্যামিতির সাহায্যেই সর্বত্র হয়ে থাকে। ছাবেতও প্রথমে সেই দিকেই মনোনিবেশ করেন। তাঁর সমসাময়িক, চিকিৎসা বিজ্ঞানে অন্যতম পারদর্শী বৈজ্ঞানিক ইসহাক এবনে হোনায়েন (ইনি ৯১০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন) ইউক্লিডের জ্যামিতির আরবী অনুবাদ করেন। ছাবেত অনুবাদখানি সংশোধন করে এর সঙ্গে একটি উপক্রমণিকা জুড়ে দেন। এই উপক্রমণিকাতেই তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু এই উপক্রমণিকা লেখাই নয়, তিনি জ্যামিতির অনেক নূতন নূতন মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব হোল পুরাকালের মনীষীদের কার্যাবলীর উল্লেখ। বিজ্ঞান শিখতেও ইতিহাসের দরকার। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্যকরূপে অবগত হোতে হোলেই তার পূর্বেকার ইতিহাস জানা দরকার। এ হিসাবে ছাবেতের গ্রন্থাবলী খুবই শিক্ষাপ্রদ বলতে হবে, তাছাড়া প্রত্যেক বিষয়ে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করাও এর আর এক বিশেষত্ব। ছাবেতের জ্যামিতিক কার্যাবলী খুবই উচ্চাঙ্গের।

তৎকালীন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত ছাবেতও বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিভাগেই হস্তক্ষেপ করেছিলেন। আলমাজেষ্ট (Almagest) জ্যোতির্বিজ্ঞান, conics, ম্যাজিক স্কোয়ার

(Magic Square), Amicable Numbers প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর কতকগুলি গ্রন্থ আছে। ম্যাজিক স্কোয়ার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ; তার মধ্যে সাধারণ, নাসিক, সেমিনাসিক, এসোসিয়েট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাসিক, সেমিনাসিক প্রভৃতি নাম হয়েছে এর ভারতবর্ষে প্রথম উদ্ভাবনের জন্যেই। অনেকেই মনে করেন বোম্বাই-এর অন্তর্গত নাসিকের কোন অঙ্কশাস্ত্রবিদ দ্বারাই এগুলির প্রথম প্রচলন হয়। তবে এই নাসিক, সেমিনাসিক ছাড়া অন্যগুলির প্রথম উদ্ভাবন কোথায় হয় সে বিষয় সঠিক কিছুই জানা যায় না। খুব সম্ভব চীনেই এর প্রথম আবিষ্কার। চীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য পূর্বকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। অনেকের মতে চীনেই অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম উদ্ভব। যা'হোক চীনের পঞ্চশাস্ত্র (five canons) Wu king পুরাকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্বলন্ত সাক্ষ্য। এই পঞ্চশাস্ত্রের মধ্যে, ওন ওয়াঙ্গ (Won Wang) কর্তৃক লিখিত 1-king পুরাণত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানীয়। তিনি খুব সম্ভব খৃঃ পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। পাকুয়া Pakua বা অষ্ট trigrames কে তিনি শেষ পর্যন্ত চৌষট্টি Hexagram পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন। পাকুয়া আমাদের অপরিচিত নয়। পথের ধারে ধারে উপবিষ্ট ভাগ্য-গণনাকারীদের হাতে যে সমস্ত পিতলের গুটি দেখা যায় তার উপরে টেলিগ্রাফের সাংকেতিক নিয়মে টরে টক্কার মত লিখিত আঁকগুলিই পাকুয়া। এখানে এদের স্বরূপ দেওয়া হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

স্বর্গ (সঞ্চিতজল), অগ্নি, বজ্র, বায়ু,

বন (চন্দ্র), পাহাড়, পৃথিবী বৃষ্টির জল।
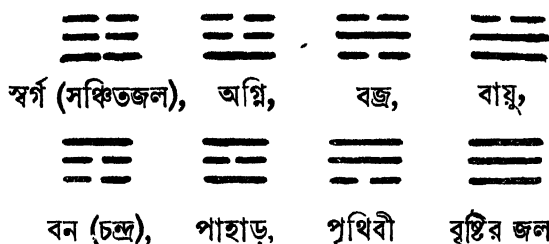
এই পাকুয়া থেকেই ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার উদ্ভব। I-king (আইকিং) এর বিবৃতি অনুসারে এই ম্যাজিক স্কোয়ারের আবিষ্কর্তা হোলেন চীন সম্রাট ইউ (yu)। তিনি নাকি একদিন পীতনদী পার হবার সময় স্বর্গ থেকে প্রেরিত এক কচ্ছপের পিঠে ম্যাজিক স্কোয়ার দেখতে পান এবং সেগুলো প্রজামণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করেন। যা হোক এর গল্পাংশটুকু বাদ দিলে যে সারটুকু পাওয়া যায় তার মর্মার্থ হোল যে চীনে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অধুনা প্রচলিত Permutation, Combination এবং Magic Square প্রচলিত ছিল। তবে I-king এর ম্যাজিক স্কোয়ার আর এখনকার ম্যাজিক স্কোয়ারে অনেক পার্থক্য। তখনকার দিনে সংখ্যা জানা ছিল না তাই ম্যাজিক স্কোয়ারের রূপও অন্য রকম। পরপৃষ্ঠার উদাহরণ থেকেই ব্যাপারটি ভালভাবে বোঝা যাবে।

যা'হোক I-king এর ম্যাজিক স্কোয়ারের আলোচনার পর ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও এর তেমন আলোচনা হয় নাই, ছাবেতের পূর্ব পর্যন্ত। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। চীনের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল বলে

মনে হয় না। যদিও চীন তখনও জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল, তবু তার প্রকৃত স্বরূপ আরব বৈজ্ঞানিকদের নিকট ছিল কিংবদন্তীর মতই। চীনের জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁদের
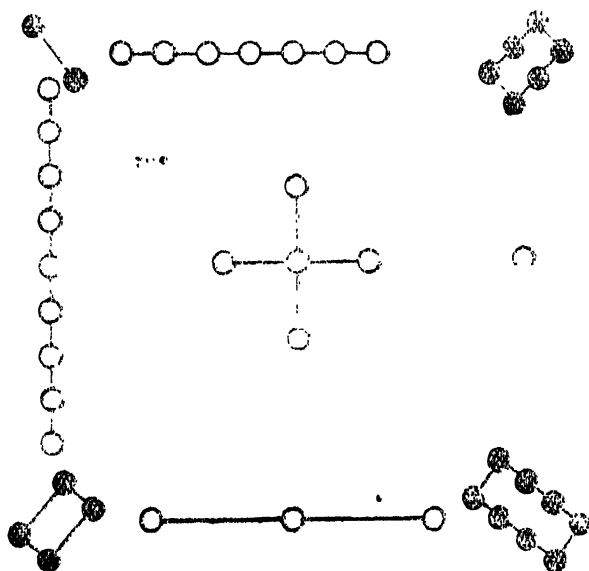
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। তাই একে চীনের ধার করা বিদ্যা বলা চলে না। অবশ্য অঙ্কশাস্ত্র হিসাবে যদিও ম্যাজিক স্কোয়ার উচ্চাঙ্গের কিছুই নয়, তবুও গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এও যে একটি গণনীয় শাখা সে সম্বন্ধে কারুর সন্দেহই করবার কিছু নাই। তা ছাড়া এর স্বতন্ত্রতাও কোন প্রকারেই উপেক্ষণীয় নয়। ছাবেতই বর্তমান ম্যাজিক স্কোয়ারের একটা স্পষ্ট রূপ দিয়েছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আলখারেজমি যেমন বীজগণিতের প্রতিপাদ্য প্রমাণ করবার জন্যে জ্যামিতি বিশদ ভাবে ব্যবহার করেছেন, ছাবেত ঠিক তাঁর উল্টোমতে বীজগণিতিক সমস্যা সমূহ জ্যামিতিতে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর পূর্বে কেউ এমনভাবে বীজগণিতিক সমস্যাকে জ্যামিতির প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে ঢোকান নাই। জ্যামিতির দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলেও বীজগণিতকে যে তিনি সম্পুর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলেন এমন মনে করবার কোন কারণ নাই। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আলমাহানীর তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধান প্রচেষ্টা তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনিও তৃতীয় মাত্রার কতকগুলি বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান প্রচেষ্টা করেন। তন্মধ্যে তৃতীয় মাত্রাকে দ্বিত্ব (Dulplication of the cube) করবার পন্থা একটি। জ্যামিতির সাহায্যে এগুলোর সমাধান খুবই সুন্দর এবং বিজ্ঞান-সম্মতভাবেই হয়েছে। তবে এর কোন সাধারণ সমাধান প্রণালী তিনি ঠিক করতে পেরেছিলেন কিনা সে ঠিক জানা যায় না।

অঙ্কশাস্ত্রের অন্যতম উচ্চশাখা Calculasএর প্রচলন করবার প্রচেষ্টাকারীদের মধ্যে ছাবেতের নামও উল্লেখ যোগ্য। Paraboloid এর ঘনফল নির্ণয় করতে যেয়ে তিনি আধুনিক Calculas এর পথ প্রদর্শন করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ছাবেতের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় সূর্যের তুঙ্গত্ব (altitude of the sun) সৌর বৎসর এবং সূর্য

ঘড়ি বা ছায়াঘড়ি সম্বন্ধীয় অলোচনায়। তিনি বাগদাদের মানমন্দিরে দিনের পর দিন গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন এবং পরে সেই সব ফলাফল থেকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সৌর বৎসরের দৈর্ঘ, সূর্যের তুঙ্গত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এতে তিনি যে সমস্ত তথ্য রেখে গেছেন সেগুলো আজও তাঁর অমর কীর্তি জগতে বিঘোষিত করছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর গণনায় একটি ভুল হয় কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ ভুলের সংশোধন হয় নাই। ছাবেতের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ এমন কি কোপার্নিকাস পর্যন্ত এ ভুলকেই ঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। ছাবেতের বৈজ্ঞানিক বিচক্ষণতার অভাবই যে এ ভুলের জন্য দায়ী এ রকম ধারণা করা খুবই অন্যায় হবে। প্রথম আবিষ্কর্তার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। অজানিতকে জানার মধ্যে টেনে আনতে ভুল-চুক হওয়া বিস্ময়কর নয়। সে হিসাবে ছাবেতের গণনায়ও একটু আধটু ভুল থাকা স্বাভাবিক কিন্তু তাতে তাঁর প্রতিভার ন্যুনতা প্রকাশ পায় না। গ্রহ উপগ্রহাদির গতি সম্বন্ধীয় টলেমির মতবাদকে উন্নত ও সংশোধিত করবার জন্য বিষুবরেখা ও আয়নমণ্ডলের সংযোগস্থলের (কাল্পনিক) কম্পনকে (Trepidation Of Equinoxes) প্রমান করতে, তিনি টলেমির অষ্টমগোলকের সঙ্গে অন্য একটি গোলক সংযোগ করে দেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি উন্নততর করবার জন্যেও তাঁর

প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত নূতন ধরনের গোলাকার আসতারলব (Spherical astrolabe) নির্মাণে। ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। আলবাত্তানীর হাতে ত্রিকোণমিতির যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় তার সুত্রপাত হয় ছাবেতের আলোচনার মধ্যেই। মৌলিকতা ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সূর্য-ঘড়ি দ্বারা সময় নিরূপণ করবার প্রণালী প্রথম উদ্ভাবিত হয় মিশরে। খুব সম্ভব খৃঃ পূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে এই ছায়া-ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়। বার্লিনের যাদুঘরে সেই ছায়া-ঘড়ির একখণ্ড এখনও বর্তমান। মিশরের সভ্যতা বিলুপ্ত হবার পর গ্রীক-বিজ্ঞানে ছায়া-ঘড়ি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল বটে তবে তেমন বিশেষ কিছুই হয় নাই বলেই মনে হয়। মিশরের ছায়া-ঘড়ির সঙ্গে গ্রীসের ছায়া-ঘড়ির বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। তেমনি আবার মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত ছায়া-ঘড়ি এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও অভিনব। আলফ্রাগানাস ও আলখারেজমির ছায়া-ঘড়ির অনুসরণ করেই ছাবেত সূর্য-ঘড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করেন তবে এতে তাঁর নিজস্ব মৌলিকতারও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

Irrational transversal figure সম্বন্ধে ছাবেতের কতিপয় গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থের মত এগুলিতেও পূর্বেকার মনীষীদের বিশেষত ইউক্লিড এবং প্লেটোর

অনেক নিয়ম পদ্ধতির উল্লেখ হয়েছে এবং তাঁদের প্রবর্তিত কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করে, গ্রন্থকার নিজের উদ্ভাবনা যোগ করে দিয়েছেন। Amicable numbers সম্বন্ধেও ছাবেতের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি amicable numbers এর পূর্বপ্রচলিত Theory গুলিকে ঝালিয়ে নিয়ে অভিনবভাবে পুনঃ সম্পাদন করেন। তাঁর মতে যদি $P=3\cdot2^n-1$, $Q=3\cdot2^{n-1}-1$ এবং $R=9\cdot2^{2n-1}-1$ হয় এবং P, Q, R মৌলিক সংখ্যা হয়, তা হোলে 2^nPQ এবং 2^nR, amicable numbers হবে।

অনুবাদকারী হিসাবেও ছাবেত কম যান নাই। তিনি এপোলোনিয়াসের Conics-এর পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ করেন ও ভাষ্য লেখেন। এ ছাড়া আর্কিমেডিস, ইউক্লিড, থিওডেসিস এবং টলেমির কতকগুলি গ্রন্থও অনুবাদ করেন। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে ছাবেতের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। তুলাদণ্ডের ব্যবহার পৃথিবীতে কোন সময়ে প্রথম প্রচলিত হয় সে সঠিক ভাবে বলা যায় না। কিন্তু একটি কথা বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে নির্দোষ তুলাদণ্ড পাওয়া বা তৈরী করা খুবই কঠিন। কিরূপ ভাবে বিজ্ঞান সম্মত নির্দোষ তুলাদণ্ড তৈরী করা যায় সে সম্বন্ধে আজকালও অনেক গবেষণা চলছে। নবম শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞানের সবেমাত্র সূত্রপাত হয়েছে বললেই চলে, তখন তুলাদণ্ডকে কিরূপভাবে বিজ্ঞানসম্মত সম্পূর্ণ নির্দোষ করে প্রস্তুত করা যায় সে বিষয়ে

কোন অবতারণা করা বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছাবেতই সর্বপ্রথম তুলাদণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন ও একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই সময়েই বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ও তুলাদণ্ড সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জিরার্ড কর্তৃক ছাবেতের গ্রন্থখানি লাটিনে অনুদিত হয়। এই লাটিন গ্রন্থখানির নাম হোল Liber carastonis sire destarbera. জিরার্ড এবং জোহানেস ছাবেতের অনেকগুলি গ্রন্থ লাটিনে অনুবাদ করেন।

আবুল মাশার নবম শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিক। অন্যান্য কতিপয় মুসলমান নামের মত তাঁর নামও ইউরোপে ঠিক ভাবে নীত বা গৃহীত হয় নাই। তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট আলবু মাছার নামে পরিচিত। আবুল মাশারের পূর্ণ নাম হোল আবুল মাশার জাফর এবনে মোহাম্মদ এবনে ওমর আলবালখি। খোরাসানের বলখ প্রদেশে, খুব সম্ভব খলিফা হারুন-অর-রশিদের রাজত্ব কালে ৭৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ কাল বাগদাদে অতিবাহিত করে, ওয়াসিতে তিনি ৮৮৬ খৃঃ অব্দে ৮ই মার্চ তারিখে (২৭২ হিঃ ২৮শে রমজান) প্রাণত্যাগ করেন। সুদীর্ঘ একশত বৎসর কাল ব্যাপী জীবনে তিনি নানা কার্যেই ব্যাপৃত ছিলেন। অন্য সাধারনের সাধারন কার্যের মত সেগুলিও আজ জগতে অখ্যাত অজ্ঞাত ; সে সব জানবার কেউ কোন দরকারও বোধ করে না। যা তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে সে হোল তাঁর বৈজ্ঞানিক

প্রতিভার দান। প্রথম জীবনে তিনি ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন এবং হাদিস শরীফের টীকা লেখে পণ্ডিত সমাজে স্থান লাভ করতে সমর্থ হন।

আবুল মাশার

সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। যে সময়ে বৃদ্ধের ধর্ম-প্রবণতা মানুষের মনে এসে উদয় হয় সেই সময়ে তাঁর বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ বিস্ময়কর বটে। শুনা যায় এই সময়ে তিনি ঘটনাক্রমে বিখ্যাত দার্শনিক আলকিন্দির সংস্পর্শে এসে পড়েন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আলকিন্দিরই অনুপ্রেরণায় তিনি বিজ্ঞান আলোচনায় রত হন। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতিষই তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করে এবং মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি, অস্ত উদয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা সেই সম্বন্ধে গবেষণাতেই তাঁর অঙ্কশাস্ত্রের দান অনেকটা সীমাবদ্ধ। তাঁর প্রণীত "জিজ আবি মাশার" বা আবুল মাশারের ফলক তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচায়ক। এই ফলকে তিনি যে সমস্ত তথ্যাদি রেখে গেছেন সেগুলি সত্যিই বিস্ময়কর। অধুনা যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে ; কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে, যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর সঙ্গে আবুল মাশারের জিজএর তথ্যাদির খুব সামান্যই গরমিল আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে তিনি ত্রিকোণমিতিও কিছু কিছু আলোচনা করেন।

আবুল মাশার বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনেকগুলির এ পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যে কয়েকখানির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত ছয়খানিই প্রধান। (১) কিতাবুল মদখল আল কবির বা কিতাবুল মদখল ইলা এলম আহকাম আল নজুম (জ্যোতিষ উপক্রমণিকার বৃহৎ পুস্তক) এখানির পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডে বিদ্যমান। জোহানেস ডা লুনা হিসপালেনসিস্ এবং হারমানাস সেকাণ্ডাস্ (Hermanus Secundus) পুস্তকখানি লাটিনে অনুবাদ করেন। হারমানাসের অনুবাদখানি Introductorium in astronomium Albumasaris Abalachii octo continens Libros Partiales নামে ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে অগসবার্গ (Augsburg) থেকে প্রকাশিত হয় এবং ১৪৯৫ ও ১৫০৬ খৃঃ অব্দে ভেনিস থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি মধ্যযুগে ইউরোপে খুব বেশী সমাদর লাভ করে। এতে প্রধানত জোয়ার ভাটা সম্বন্ধে কতকগুলি জ্যোতিষী theory বর্ণিত হয়েছে। (২) কিতাবুল কিরানাত (নক্ষত্রাদির অবস্থান বিষয়ক পুস্তিকা) প্যারিস ও অক্সফোর্ডে দুইখানি মূল গ্রন্থ বিদ্যমান। (৩) কিতাবুল আহকামে সিনিল মাওয়ালিদ (জন্ম বৎসরের পরিবর্তন বিষয়ক পুস্তিকা) পুস্তকখানি "Albumasar de Magnis conjunctionibus et annorum revolutionibus ac eorum profectionibus octo continens tractatus" নামে লাটিনে অনুদিত হয়। (৪) কিতাবুল উলুফ ফি বয়ত আল এবাদত

(ধর্ম গৃহ সম্বন্ধীয় সহস্র কাহিনী)। পৃথিবীতে সে সমস্ত ধর্মগৃহ ও বিখ্যাত সৌধাদি নির্মিত হয়েছে তারই বর্ণনা। আলবেরুনী প্রণীত প্রাচীন বিজ্ঞান গ্রন্থাবলীর তালিকাতে এখানির উল্লেখ দেখা যায়। (৫) কিতাবুল মাওয়ালিদ আল রিজাল ওয়াল নিসা, খুব সম্ভব এইখানাই বার্লিন, ভিয়েনা ও ফ্লোরেন্‌স থেকে "জন্ম-পুস্তক" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কায়রো থেকে প্রকাশিত "আল কিতাব ফি তামাম ওয়াল কামাল" নামে আবুল মাশারের অন্য যে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেখানা খুব সম্ভব এই "কিতাব মাওয়ালিদ আলরিজাল ওয়াল নিসা"। পুস্তকের বহিরাবরণ খানি নষ্ট হয়ে যাওয়াতেই এই নামের বিভ্রাট ঘটেছে। (৬) অগসবার্গ থেকে প্রকাশিত "The Flores Albumasaris" বা "Flores astrologiae" নামেও অন্য একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর আরবী নাম কি তা জানা যায় নাই।

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানই প্রথম প্রথম মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আকৃষ্ট করেছিল। নবম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি এই অত্যধিক আকর্ষণ সমভাবেই বিদ্যমান দেখা যায়। প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিকই জ্যোতির্বিজ্ঞানে কিছু না কিছু চর্চা করেছিলেন, শুধু শিক্ষার জন্য নয় বরং এ বিষয়ে রীতিমত গবেষণা করতেন। আবুল মাশারের মত শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করেছেন, এমন অনেক বৈজ্ঞানিকের নাম পাওয়া যায় বিজ্ঞান ইতিহাসে। বর্তমান মারভের অধিবাসী

আলমারওয়াজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আবুল মাশারের মত তিনিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে ত্রিকোণমিতিরও আলোচনা করেছিলেন। আল মারওয়াজী জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চার উপযোগী যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আহম্মদ এবনে আবদুল্লাহ আলমারওয়াজী। কিন্তু আরব বৈজ্ঞানিকগণ অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞানের জন্য তাঁকে হাবাশ আল হাসিব নামে অভিহিত করতেন। হাসিব সর্বসমেত তিনটি খগোল ফলক (astronomical table) প্রণয়ন করেন। প্রথমটি প্রণীত হয় ভারতীয় পন্থা অনুসরণ করে। দ্বিতীয়টির নাম হোল পরীক্ষিত ফলক (Tested table) এইটিই সবদিক দিয়ে উন্নত ধরণের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। আলমামুনের সময়কার ফলকের সঙ্গে এর অনেক মিল আছে।[১] তৃতীয়টিকে বলা হয় নৃপতির ফলক।

আলমারওয়াজী

আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণমিতির আলোচনা করলেও এতেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তাঁর মত এখন পরিত্যক্ত হয়েছে তবুও ইতিহাসের দিক থেকে এর বিশেষ মূল্য আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞা সমূহের হাবাশের আলোচনাই ত্রিকোণমিতির দিকে পরবর্তী মুসলিম বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে মনে হয়। এর পূর্বে আর

কেউ এমন স্পষ্ট খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করেন নাই। Sine, cosine এর উদ্ভব হয় নমন (gnomon) এর আলোচনায় ; এই "নমন"-কে বার ভাগে ভাগ করা হোত এবং সেই অনুসারেই ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞাদির পরিমাণ নির্ধারণ করা হোত। হাবাশ কিন্তু একে বার ভাগে ভাগ না করে যাট ভাগে ভাগ করেন। এরূপ বিভাগের ফলেই প্রতিস্পর্শজ্যা (co-tangent) এর ফরমুলা দাঁড়ায় $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} 12$. এর সঠিক ফরমুলা হোল $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$. এই হিসাবেই সূর্যের তুঙ্গত্ব (altitude of the sun) নির্ধারিত হয়—$\sin(90-\alpha) = \frac{\cot\alpha \; 60}{\sqrt{(12^2+\cot^2\alpha)}}$ ফরমুলার সাহায্যে। পূর্বেই বলা হয়েছে হাবাশের এ মত গৃহীত হয় নাই এবং এগুলোর বিশেষ প্রচলনও হয় নাই। তবে ক্রমবিবর্ধনের ইতিহাসে এই ভ্রান্তি, অভ্রান্তির যে একটি মূল্য আছে সে হয়ত কেউ অস্বীকার করবেন না। এগুলি ছাড়া স্পর্শজ্যা (tangent) এবং প্রতিস্পর্শজ্যা (co-tangent) এর একটি তালিকাও তিনি প্রস্তুত করেন। তাঁর তালিকাটিই ত্রিকোণমিতির তালিকা (trigonometrical table) হিসাবে সর্বপ্রথম। তিনিই Cosecant এবং Secant এরও প্রচলন করেন। হাবাশের ভুল দেখাতে বর্তমানে প্রচলিত প্রতীক চিহ্নাদির ব্যবহার করা হোল। নবম শতাব্দীতে যে ঠিক এরূপ চিহ্নাদি ব্যবহার করা হোত, এরূপ ধারণা করা নিশ্চয়ই

হবে না। এর অনেক পরে প্রতীক চিহ্নাদির ব্যবহার আরম্ভ হয়। একাদশ শতাব্দীতে অঙ্কশাস্ত্রবিদগণ অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনায় প্রতীক চিহ্নাদির প্রথম উদ্ভব ও পরিণতি সম্বন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ করেছেন। এমনিতেও এগুলো বেশ আমোদজনক। যথাস্থানে এগুলোর উল্লেখ করা যাবে। হাবাশের পুত্র আবু জাফরও পিতার পদাঙ্ক অনুসরন করেন। বিজ্ঞান আলোচনায় তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় হোল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মানেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

আলখারেজমি, ছাবেত, আলফ্রাগানাস প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত অঙ্কশাস্ত্রবিদ ছাড়া আরও ছোটখাট অনেক বৈজ্ঞানিক নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনায় রত ছিলেন। যদিও তাঁরা বিশেষ সুপরিচিত নন তবুও তাঁদের দানকে নিতান্ত উপেক্ষা করা যায় না। তাঁদের প্রতিভার কথা সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি; তাঁদের প্রতিভা নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী, কি নিজ আত্মবলে চালিত, সে কথাও সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তখনকার দিনের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা কার্যে, তাঁদের বর্তমানে পরিচিত কার্যাবলী যে অনেক সাহায্য করেছিল, এবং সে হিসাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির পথ প্রভূত পরিমাণে সহজসাধ্য করে তুলেছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না কোন প্রকারেই। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ কার্যাবলী এখনও পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। হয়ত সমস্ত তথ্যগুলি পরিপূর্ণ এবং প্রকট ভাবে প্রকাশ পেলে এখন যাঁদের ছোটখাট

বৈজ্ঞানিক বলে ধরে নেওয়া হয় তাঁদের অনেকেরই প্রতিভা আলখারেজমি, ছাবেত প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না বলেই প্রকাশ পাবে।

এই সব ছোট খাট বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিখ্যাত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক আলকিন্দির শিষ্য আহম্মদ এবনে আলতাইয়েব, আল দিনওয়ারী প্রভৃতি মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণ ছাড়াও সহল এবনে বিসর, আবুল তায়েব প্রভৃতি ইহুদী ও খৃষ্টান মনীষিগণের নাম করা যেতে পারে; এঁরাও এই সময়ে বাগদাদের রাজসভার বিজ্ঞান বিভাগ অলঙ্কৃত করেছিলেন। আহম্মদ এবনে আল তাইয়েবের পূর্ণ নাম হোল আবুল আব্বাছ আহম্মদ এবনে মোহাম্মদ এবনে মারওয়ান আল সারখসি। তবে তৎকালে ইনি

আহম্মদ এবনে আল তাইয়েব

আহম্মদ এবনে আল তাঁইয়েব নামেই পরিচিত ছিলেন। আল তাইয়েব বীজগণিত, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গান সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আলদীনওয়ারীর পূর্ণ নাম হোল. আবু হানিফা আহম্মদ এবনে দাউদ আলদীনওয়ারী। তিনি যে ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করতেন তার নাম হোল দীনওয়ার, তা থেকেই তিনি দীনওয়ারী নামে পরিচিত

আল দীনওয়ারী

হন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত নগরীর বিলাসিতা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নাই। সারা জীবন এই ক্ষুদ্র গণ্ড গ্রামে বাস করে বিজ্ঞান সাধনায় লিপ্ত থাকা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বলেই বোধ হয়। হয়ত সেই জন্যেই তাঁর প্রতিভা পূর্ণভাবে স্ফুরিত হবার সুযোগ পায় নাই। সভ্যতা ও

কৃষ্টির সংস্পর্শহীন এই ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে বাস করেই দীনওয়ারী যে সমস্ত অমর কীর্তি রেখে গেছেন, সেগুলো তাঁর অন্তর্নিহিত জ্বলন্ত প্রতিভারই পরিচয় দেয়। তিনি বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং হিন্দু গণনা পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সহল ইবনে বিসর জাতিতে ছিলেন ইহুদী। ইহুদী হোলেও তিনি বাগদাদের রাজসভায় সমসাময়িক মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের সমান প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হন শুধু নিজের

সহল এবনে বিসর

প্রতিভা বলেই। বাগদাদে আগমনের পূর্বেই তিনি খোরাসানে জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া বীজগণিতেও তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুঃখের বিষয় গ্রন্থগুলির কোন সন্ধানই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ইহুদী ও খৃষ্টান বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের সমস্ত স্বত্বা ভুলে গিয়েই যে এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সে বুঝা যায় তখনকার দিনের ধর্মের দ্বেষ বিদ্বেষের হাত এড়িয়ে মুসলিম বাদশাহদের অধীনে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের সাথে জ্ঞান চর্চা করায়। তাঁদের নামগুলিও শেষ পর্যন্ত আরবীয় নামের মতই হয়ে পড়ে। সহল এবনে বিসরের পূর্ণ নাম হোল সহল এবনে বিসর এবনে হাবিব এবনে হানি আবু ওছমান। ধর্মের উন্মাদনার সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নত চিন্তার কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়; যেখানে থাকে সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির ধারা ব্যাহত হয়ে পড়ে। সে হিসাবে মুসলমান আমলের

বৈজ্ঞানিকরা যে ধর্মের গোঁড়ামীকে সর্বথা পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন, তজ্জন্য তাঁদিগকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। সহলের পুস্তকের কতকগুলি ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে ভেনিসে অনুদিত হয়। আর কতকগুলি প্রায় ৪০ বৎসর পরে ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে রাসেলে অনুদিত হয়।

সহল এবনে তাবারী নামে অন্য একজন ইহুদীও এই সময় বিজ্ঞান চর্চায় যোগ দেন। তিনি আলমাজেষ্টের আরবী অনুবাদ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন বলে জান যায়।

আবুল তাইয়েব প্রথম জীবনে ইহুদী ছিলেন পরে মুসলমান হন। তিনি খগোল ফলক এবং গণিতশাস্ত্রের অন্যান্য বিষয় বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তা ছাড়া ত্রিকোণমিতিতেও তাঁর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া পদার্থ বিদ্যা আলোচনাতেও তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। আবুল তাইয়েবের পূর্ণ নাম হোল আবুল তাইয়েব সনদ এবনে আলি। তিনি বাগদাদে একটি কানিসাও (observatory) প্রস্তুত করেন। ৮৬৪ খৃঃ অব্দে এই বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন।

সনদ এবনে আলি

অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসে নবম শতাব্দীকে সম্পূর্ণ মুসলিম শতাব্দী বললেও কোন অত্যুক্তি করা হবে না। এ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ কোন আলোচনা হয়েছে, কি, অন্য কোন প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর অঙ্কশাস্ত্রে কোন

মৌলিক দান আছে বলে জানা যায় না। এ যেন শুধু মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের জন্যই কালের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ছিন্ন এক অংশ বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মৌলিক গবেষণা ছাড়াও গ্রীক, ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুবাদ, এই শতাব্দীর মুসলিম সাধকদের জ্ঞানপিপাসার জ্বলন্ত নিদর্শন। প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই দুই তিনটি ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মৌলিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই অন্য দেশের বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থগুলিকে, আরবীতে অনুবাদও করতে থাকেন। মাতৃভাষা ছাড়া যে শিক্ষার সুপ্রসার হওয়া সম্ভবপর নয় সে তাঁরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতেন বলেই এ অনুবাদ কার্যও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হোতে থাকে। অনুবাদ কার্যে যাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আল হাজ্জাজ, আল জাওহেরী, হোনায়েন এবনে ইসহাক, তাঁর পুত্র আল আরজানি, আল হিমসি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আল হাজ্জাজ বা আল হাজ্জাজ এবনে ইউসুফ এবনে মাতার সর্বপ্রথম ইউক্লিডের সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ করেন; তন্মধ্যে ছয়খানির অস্তিত্ব বর্তমান। তিনি দুইবার এই অনুবাদ কার্য করেন; প্রথমবার হারুণ-অর-রশিদের আদেশে দ্বিতীয়বার আলমামুনের আদেশে। প্রধানত তাঁরই অনুবাদের মধ্যস্থতায় আরব বৈজ্ঞানিকগণ শুদ্ধ জ্যামিতির সঙ্গে পরিচিত হন। টলেমির আলমাজেষ্ট (কিতাব আল মাজিসতি) ও তিনিই সর্বপ্রথম ৮২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে আরবীতে

আল হাজ্জাজ

অনুবাদ করেন। তাঁর প্রদত্ত নাম থেকেই বর্তমান আলমাজেষ্ট নাম প্রবর্তিত হয়। যতদূর জানা যায় ৮৩৫ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আল আব্বাছ এবনে সাইদ আল জাওহেরী ৮২৯-৩০ খৃঃ অব্দে বাগদাদে সনদ এবনে আলি, ইয়াহিয়া এবনে আবি মনসুর প্রভৃতির সঙ্গে এবং ৮৩২-৩৩ খৃঃ অব্দে আল আসতারলবি, আল মারওয়াররোজী প্রভৃতির সঙ্গে দামস্কাসের মানমন্দিরে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয় বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। তবে ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্বন্ধে তিনি যে ভাষ্য লিখে গিয়েছেন সে হয়েছে অপূর্ব। জ্যামিতিতে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই ভাষ্যখানিতে।

আল আব্বাছ

আবু সাইদ আলদারির আল জুরজানি এই সময়কার অন্যতম বৈজ্ঞানিক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতিও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নানা জ্যামিতিক সমস্যা নিয়ে তিনি একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। মাধ্যন্দিন রেখা সম্বন্ধে জিজএর মধ্যে আলোচনা হলেও বিস্তারিত ভাবে এর কোন আলোচনাই কেউ করেন নি। আল দারিরই এই বিষয়ে সর্বপ্রথম। তিনি এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই বৈজ্ঞানিকের আল দারির (অন্ধ) খেতাবের কোন কারণই পাওয়া যায় না। পূর্বতম পুরুষের কারুর অন্ধত্বই হয়ত পুরুষানুক্রমে বংশের খেতাবে পরিণত হয়েছিল। বিজ্ঞান প্রীতির সঙ্গে দেশ

আল জুরজানি

প্রীতিও দেখা দিয়েছে নামের বেলায়। জুরজান দেশের অধিবাসী হিসাবেই তিনি আলজুরজানি নামে অভিহিত। জুরজান কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্বে অবস্থিত।

নবম শতাব্দীতে বিজ্ঞান গ্রন্থ অনুবাদকারী হিসাবে হোনায়েন বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু জাইদ হোনায়েন এবনে ইসহাক। ৮০৯ কি ৮১০ খৃঃ অব্দে হীরানগরীতে এক অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম হয়। জন্মভূমিতে তাঁর কতদিন কেটেছিল সঠিক বলা যায় না তবে যতদূর মনে হয় এখানে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করবার সুযোগ পান নাই। সে সুযোগ ঘটে জুনদিশাহপুরে। আজকালকার মত তখনও বোধ হয় রাজধানীর মোহ কম ছিল না। হোনায়েনের জীবনেও এ মোহ প্রভাব না করে ছাড়ে নাই। জুনদিশাহপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হোলেও এখানে তিনি বেশীদিন তিষ্ঠে থাকতে পারেন নাই, কিছুকাল পরে বাগদাদে যেয়েই বসবাস স্থাপন করেন এবং সেখানেই ৮৭৩ খৃঃ অব্দে জীবনলীলা সংবরণ করেন।

হোনায়েন পেশাতে ছিলেন চিকিৎসক। পেশাতে তৎকালীন সমব্যবসায়ীদের মধ্যে তাঁর স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে অন্য সাধারণ চিকিৎসকের মত শুধু অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবেই তিনি চিকিৎসা বিদ্যার ব্যবহার করেন নাই এর বিজ্ঞানতত্ত্বও তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। চিকিৎসা বিষয়ে নানা মৌলিক গবেষণা তাঁকে অমর করে রেখেছে। যা'হোক হোনায়েনও তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের

ধর্মকে অবহেলা করেন নাই। চিকিৎসা বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য এবং মোহ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে নাই তিনি অন্যদিকেও মন দেন। এর মধ্যে দর্শন অন্যতম। দর্শনে পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি সাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট বিদ্বান হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর দর্শনের মতবাদগুলিও বিশেষ উপেক্ষণীয় নয়। এই দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের চাপের মধ্যেও বিজ্ঞানের অন্য শাখার প্রতি তাঁর যে অন্তর্নিহিত 'অনুরাগ জীয়ন্তই ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রীক বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে। প্রথম জীবনেই তৎকালীন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সংস্পর্শে এসে পড়াতেই তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি এই অনুরাগ প্রকটিত হয়েছিল বলতে হবে। অতি সুকুমার বয়সেই হোনায়েন, বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় কর্তৃক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে নিযুক্ত হন এবং তখন থেকেই অনুবাদ কার্যও সুরু করেন। যখন তাঁর বয়স সতের বৎসর মাত্র তখনই তিনি কতকগুলি গ্রন্থ সিরিয়ান এবং আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে অবশ্য অন্যান্য সহকারীদের সাহায্যেই অনুবাদ কার্য সম্পাদন করতেন।

হোনায়েন এবনে ইসহাক

বিজ্ঞান জগতের কার্যের গতি অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক জগতে এই সময়ে বেশ উলোট পালোট দেখা দেয়। উদার মতাবলম্বী আলমামুন ও আলমুতাসিমের স্থলাভিষিক্ত হন গোঁড়া সুন্নী আলমুতাওয়াক্কিল। ধর্মের বিষয়ে তাঁর গোঁড়ামি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রকাশ পায় বলতে হবে। মুতাজলীয় মতাবলম্বীদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু

জ্ঞানবিজ্ঞানের বেলায় এসে এ গোঁড়ামি একেবারে থমকে দাঁড়িয়েছে। এখানে ধর্মের মতবাদ কোন স্থানই পায়নি। মুসলিম, অমুসলিম, শিয়া, সুন্নী সকলকেই তিনি সমানভাবে উৎসাহ দিয়েছেন জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার জন্যে। বিদেশীয় মূল্যবান গ্রন্থাবলীগুলি যাতে সহজবোধ্য হয় সেইজন্যই তিনি এক অনুবাদ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজকীয় বৃত্তি দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে অনুবাদ কার্যে নিযুক্ত করেন। হোনায়েনের উপর এর পরিচালনা ও পরিদর্শন ভার অর্পিত হয়। মুসলিম জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিতে হোনায়েন এবং তাঁর শিষ্যবর্গ ও সহকারীদের এই অনুবাদ কার্য যে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল সে বলাই বাহুল্য। অনুবাদ যাতে সুন্দর ও সঠিক হয় হোনায়েন তজ্জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করতেন। প্রথমত যাতে খুব ভাল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তারই চেষ্টা হোত। সেগুলির প্রচলিত (যদি কিছু থাকে) সিরিয়ান ও আরবী অনুবাদের সঙ্গে মূল গ্রন্থের কোথাও অনৈক্য আছে কিনা তা দেখে নিয়ে হোনায়েন পুনরায় অনুবাদ করতেন। এর পূর্বে অনেক অনুবাদেই অনৈক্য পাওয়া যেত, সেইজন্য তাঁর সহকারীরা যে অনুবাদ করতেন, সেগুলো প্রকাশিত হবার পূর্বে তিনি নিজে আর একবার মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। তাঁর অনুবাদ প্রণালী বর্তমান অনুবাদ প্রণালীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক সততার প্রশংসা না করে পারা যায় না। তিনি তাঁর প্রথম জীবনের নিজ কৃত অনুবাদগুলিও পরে সংশোধন করেন।

হোনায়েনের প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ কার্যের সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এগুলি মধ্যযুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি নিজে পঁচানব্বইখানা গ্রন্থ সিরিয়ান ভাষায় এবং উনচল্লিশখানা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের মধ্যে গ্যালেন, এরিষ্টটল, ডিসকোরাইডিস, টলেমির গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজে চিকিৎসক হিসাবে, চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর তাঁর একটু বেশী রকম স্নেহ ছিল, তাই চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলির অনুবাদও হয়েছে অনবদ্য।

অনুবাদেই যে তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিঃশেষ হয় নাই তার নিদর্শন হোল তাঁর মৌলিক গবেষণা। মৌলিক গবেষণাতেও তিনি কম যান নাই। এদিক দিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যতীত জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে জোয়ার ভাটা, উল্কাপাত, রামধনু প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। এ আলোচনায় তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

হোনায়েনের পুত্রও পিতার ন্যায় বিজ্ঞান ইতিহাসে সুপরিচিত। তিনিও পিতার মতই চিকিৎসা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন এবং চিকিৎসক হিসাবে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পেশা হিসাবে শুধু পিতাকে অনুসরণ করাতেই তাঁর জীবনের কার্যকলাপ শেষ হয় নাই। পিতার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানানুরাগ পুত্রতেও পূর্ণ মাত্রায় সংক্রমিত হয়েছিল। তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতি, ড্যাটা, আলমাজেষ্ট,

ইসহাক এবনে হোনায়েন

আর্কিমেডিসের গোলক (Sphere ও Cylinder) এবং ম্যানিলসের Spherics ও আরবীতে অনুবাদ করেন। বিজ্ঞানের পুস্তক ভাষান্তরিত করতে যে শুধু ভাষা জ্ঞানেরই দরকার হয় তা নয়, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও যে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার সে কথা অস্বীকার করা চলে না। যাঁরা এইরূপ বিজ্ঞান গ্রন্থ অনুবাদ করে গেছেন তাঁরা যে এ সব বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন সে সন্দেহাতীত। দ্বিতীয় ইসহাকের বিজ্ঞান জ্ঞান তাঁর অনুবাদ কার্য থেকেই প্রতিভাত হয়। তাঁকে নবম শতাব্দীর না বলে দশম শতাব্দীর লোক বলাই হয়ত ঠিক হবে। তিনি দশম শতাব্দীর প্রথম দশকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু ইয়াকুব ইসহাক এবনে হোনায়েন এবনে ইসহাক আল ইবাদি।

আল আরজানি ও আল হিমসি, হোনায়েন প্রভৃতি অনুবাদকদের মত সুপরিচিত নন বটে তবুও তাঁদের কার্যাবলীকে বিশেষ উপেক্ষা করা চলে না। আল আরজানি, ওমর খৈয়ামের স্বগ্রামবাসী। নিশাপুরের পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধির সূত্রপাত হয়, হয়ত আল আরজানির বিদ্যোৎসাহিতার উদাহরণেই। ইউক্লিডের দশম পুস্তিকার সম্বন্ধে তিনি একখানি ভাষ্য লেখেন। এই ভাষ্যখানি তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়। আল আরজানি বা ইবনে রাহইয়েহ আল আরজানি নিজ গ্রামেই ৮৫২-৫৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

আল আরজানি

আল হিমসি সিরিয়ার অধিবাসী। তাঁর পূর্ণ নাম হোল হিলাল এবনে আবি হিলাল আল হিমসি। এপোলোনিয়াসের

প্রথম পুস্তক চতুষ্টয় অনুবাদের সঙ্গেই তাঁর নাম সাধারণ ভাবে বিজড়িত। আহম্মদ এবনে মুসা বিন শাকীরের অনুপ্রেরণাই তাঁকে অনুবাদ কার্যে প্রেরণা যোগায় এবং প্রধানত আহম্মদের জন্যই তিনি এগুলো অনুবাদ করেন। আল হিমসি ৮৮৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

আল হিমসি

অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত রাজজ্যোতিষী নওবখতের বংশধরদের মধ্যেও যে বিজ্ঞান চর্চায় ভাঁটা পড়ে নাই তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পুত্র আবু সহল আলফজল এবনে নওবখতের কার্যের মধ্যেই। আলফজল ছিলেন খলিফা হারুন-অর-রশিদের প্রধান লাইব্রেরীয়ান। লাইব্রেরীর কাজের মধ্যেও তিনি বিজ্ঞান চর্চায়ও মনোনিবেশ করেন। প্রধানত খলিফার জন্যেই তিনি বহু পারসী বিজ্ঞান গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তাঁর অন্যতম জ্যোতিষ গ্রন্থের জিরার্ড কৃত লাটিন অনুবাদের নাম হোল "Liber Alfadhol i est arab de bachi". আলফজল ৮১৫-১৬ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আলফজল

এই বংশের আরও দুইজন জ্যোতিষীর নাম পাওয়া যায়। একজন হোলেন আল হাসান এবনে সহল এবনে নওবখত অন্যজনের নাম হোল আবদুল্লা এবনে সহল এবনে নওবখত। খুব সম্ভব এঁরা আলফজলের ভ্রাতুষ্পুত্র। আল হাসানও বহু পারসী গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন।

নবম শতাব্দীতে বাগদাদ ছাড়া মুসলিম রাজ্যের অন্য কোথাও অঙ্কশাস্ত্রের তেমন কোন আলোচনা হয় নাই বলে মনে হয়। স্পেনে তখন সবেমাত্র মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; তা ছাড়া আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিবাদে প্রায় প্রত্যেক নৃপতিরই রাজত্বের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হচ্ছিল, তাই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি নজর দেবার অবসর তাঁদের ঘটে নাই। মুসলিম ব্যতীত ইউরোপীয়ান অন্যান্য জাতির মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা বলে কিছু ছিল না বললে অত্যুক্তি করা হয় না। জ্ঞানের নামে ধর্মোন্মাদনা মৃত্যুবিভীষিকা নিয়ে সমস্ত ইউরোপীয়ান নরনারীর হৃদয়ে বিরাজ করত। বিজ্ঞানের এখানে আদর হয় নাই অনেক দিন পর্যন্তই, বরং পূর্ব মনীষীদের সাধনালব্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানকে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই চলছিল।

তবে এই সময়ে মিসরে বিজ্ঞান আলোচনা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিল বলে মনে হয়। বাগদাদের প্রভাব ধীরে ধীরে কার্যকরী হোতে থাকে। অতীতের বৈজ্ঞানিক মিসর আবার বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ফিরায়। অঙ্কশাস্ত্রে মিসরের নবম শতাব্দীর ইতিহাসে যে বৈজ্ঞানিক, মৌলিক অবদানের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন তাঁর নাম হোল আহম্মদ এবনে ইউস্‌ুফ। তিনি দশম শতাব্দীর প্রথম দশকে (৯১২ খৃঃ অব্দে) মৃত্যুমুখে পতিত হন। সে হিসাবে তাঁকে দশম শতাব্দীর লোক বললেই হয়ত ঠিক হোত ; কিন্তু তাঁর জীবনের প্রসিদ্ধ কার্যাবলী প্রায় সমস্তগুলিই নবম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। তাই তাঁকে নবম শতাব্দীর লোক বলাও বিশেষ

অযৌক্তিক হবে না। আহম্মদের পিতা ইউসুফ এবনে আহম্মদ আল দারা বাগদাদের রাজসভায় অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে বেশ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি দামাস্কাস ও বাগদাদে অনেক দিন অতিবাহিত করে শেষ জীবনে মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন। পুত্র আহম্মদ স্বীয় প্রতিভা বলে মিসরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হন এবং তদানীন্তন তুলানীদ বংশীয় নৃপতিগণের অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন।

আহম্মদ এবনে ইউসুফের পূর্ণ নাম হোল আবু জাফর আহম্মদ এবনে ইউসুফ এবনে ইবরাহিম আলমিসরী। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান Proportion (লাটিন অনুবাদ De Proportione et Prpertionalitate) এবং Similar arcs (লাটিন অনুবাদ De Similibus arcubus) সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই Proportion সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি ইউরোপের রিনাসাঁর যুগে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। লিওনার্ডো এবং জর্ডনাস নিমোরারিয়াস (Jordnus Nemorarius) এর অনুবাদের মধ্যস্থতায়ই এর প্রসার লাভ হয়েছিল বলতে হবে। এ ছাড়া তিনি মেনিলসের ত্রিভূজ খণ্ডন (Triangle cut by a transversal) সম্বন্ধীয় উপপাদ্য, Alquatta, sector প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করেন এবং টলেমির Centiloquiumএর একখানা ভাষ্যও লেখেন।

আহম্মদ এবনে ইউসুফ

দশম শতাব্দী

নবম শতাব্দীতে মুসলিম রাজ্যগুলিতে নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানের যে পূর্ণোদ্যম আলোচনা চলছিল দশম শতাব্দীতেও তার কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে মুসলিম জগতের শিক্ষা ও সভ্যতা এই সময়ে সর্বত্র সর্বতোভাবে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই প্রাধান্য সব দিক দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। রাজনীতি ক্ষেত্রে শৌর্যে বীর্যে মুসলিম জাতির অপ্রতিহত গতি একদিকে যেমন অমুসলিমদের মনে ভীতির সঞ্চার করে তুলেছিল অন্যদিকে দেখা দিয়েছিল জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনায় শ্রেষ্ঠতার জন্যে অপূর্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তি। পূর্ব শতাব্দীতে মুসলিম মনীষীদের দ্বারা বিজ্ঞানে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয় তার প্রতি সমগ্র জগৎ ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হোতে থাকে। ফলে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁদের অপূর্ব মনীষা ও বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা সমস্ত জগৎ স্বীকার করে নেয়। এমনিতে এ সময়ে মুসলিম জগৎ ছাড়া অন্য কোথাও বিজ্ঞানের তেমন কোন আলোচনাই হয় নাই। যে সমস্ত প্রতিভাবান মনীষী এই শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাসকে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের প্রায় সব্বাই মুসলমান। বিজ্ঞান আলোচনা যা কিছু হয়েছিল প্রায় সবই আরবীতে। অবশ্য গ্রীক লাটিন ও হীব্রুতেও এই সময়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়। কিন্তু সে সবই

শুধু চবিত চর্বন ; শুধু আরবী গ্রন্থের অনুবাদ। তার মধ্যে নূতন বা মৌলিক বিষয়ের কোন নাম গন্ধও ছিল না। বিজ্ঞানে যখন মৌলিকতার অভাব ঘটে তখন সে আপনিই পিছিয়ে পড়ে। তাই মুসলিম জগৎ ছাড়া অন্য কোন দেশই বিজ্ঞানে একটুও এগোতে পারে নাই বরং অনেক সময়ই পূর্বেকার গৌরবময় যুগের দোহাই দিয়ে আরও অন্ধ কুসংস্কারেই জড়িয়ে পড়ছিল।

যাহোক এই সময়েই বিজ্ঞানের আলোচনা আরব ও পারস্যের গণ্ডী ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও পশ্চিম ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। তবে সর্বত্রই মুসলিম জাতি এবং তাঁদের ভাষা আরবীই ছিল এই সভ্যতার বাহন। অতি আশ্চর্য ভাবে, বিশেষ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোরণের ভাষাই সমগ্র সভ্য জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এর পূর্বে এবং পরেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অন্য কোন ভাষাই এমনি International Language হওয়ার দাবী করতে পারে না।

অঙ্কশাস্ত্রে পূর্ব শতাব্দীর উন্নতি অব্যাহত থাকে আলবাত্তানী ও আবুল ওয়াফার মনীষা ও বিজ্ঞান প্রতিভায়। তাঁদেরই কল্যান স্পর্শে ত্রিকোণমিতি এতদিনকার জড়ত্ব ঘুচিয়ে বিজ্ঞানের গণ্ডীতে স্থান পায় এবং শম্বুকের খোলস ছেড়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হোতে থাকে।

আলবাত্তানী

দশম শতাব্দীতে যে সমস্ত প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী তাঁদের অমর কীর্তির দ্বারা বিজ্ঞানের ইতিহাস সমুজ্জ্বল করেছেন, তন্মধ্যে আলবাত্তানী, আবুল ওয়াফা, আলফারাবী, রাজেস (আলরাজী) প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রবিদগণ পাশ্চাত্য জগতে সর্বাধিক পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলবাত্তানীর দান খুবই উচ্চ শ্রেণীর। প্রধানত এইজন্যেই জনৈক খ্যাতনামা ইউরোপীয়ান দার্শনিক তাঁকে 'মুসলিম টলেমি' নামে অভিহিত করেছেন। বস্তুত গ্রীক বিজ্ঞানের টলেমির স্থান, মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলবাত্তানীই অধিকার করেছেন। টলেমির প্রতিভার চেয়ে আলবাত্তানীর প্রতিভা কোন অংশে কমত নয়ই, বরং সঠিক গণনা, নির্ভুল পরিমাপ ইত্যাদির দিক দিয়ে দেখতে গেলে, অনেক সময়ে উচ্চস্তরের বলেই মনে হয়। সে সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বাত্তানীর দানের পরিচয়ের সময়ে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

আলবাত্তানীর পূর্ব থেকেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের অপরিস্ফুট এলোমেলো পন্থায় গবেষণার পথ পরিত্যাগ করে সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতির বাঁধন কষণের সঙ্গে গবেষণা সুরু করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্বেকার জ্যোতিষী রূপ মিলিয়ে গিয়ে শুদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতিষ-বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা

ভাবেই, বৈজ্ঞানিকদের চিত্তবিনোদন শুরু করেছিল। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার এই ক্রমোন্নতির যুগেই আলবাত্তানীর অভ্যুদয়।

মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত বাত্তানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে, এই অঙ্কশাস্ত্রবিদ আলবাত্তানী নামে পরিচিত। স্বদেশের কথা মানসপটে চিরজাগরূক রাখবার জন্যে মুসলিম মনীষিগণ নামের সঙ্গে দেশের পরিচয় দিয়ে রাখেন। বৈজ্ঞানিক হয়েও তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকরা সাহিত্যিকদের মতই দেশের নামও নিজেদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। আলবাত্তানীর আসল নাম হোল আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে জাবির এবনে সিনান আলবাত্তানী আল সাবি। তিনি আলরাককী নামেও পরিচিত। এ নাম হয়েছিল তাঁর কর্মস্থলের পরিচয় হিসাবে। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত আল রাককাতে তাঁর গবেষণার কার্য চলত। অনবরত একই স্থানে দেখতে দেখতে অনেকেই তাঁকে সেখানকার অধিবাসী হিসাবেই ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে শেষ পর্যন্ত তিনি আলরাককী নামেও পরিচিত হন।

খুব সম্ভব ২৪৪ হিজরীতে (৮৫৮ খৃঃ অব্দে) বাত্তানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আলবাত্তানীর জন্ম হয়। তিনি কিশোর বয়সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হন। তাঁর বয়স যখন মাত্র কুড়ি বৎসর সেই সময়েই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হিসাবে পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিচিত হোতে সমর্থ হন। সুদীর্ঘ একাত্তর বৎসর কর্মময় জীবন যাপন করার পর ৯২৯ খৃঃ অব্দে (৩১৭ হিজরী) বাগদাদ থেকে প্রত্যাগমন পথে তাইগ্রীসের পূর্বতীরে সামারার

নিকটবর্তী কাসর আল জিস নামে এক পল্লীতে বাত্তানী পরলোক গমন করেন। অন্যান্য মুসলিম নামের মতই আলবাত্তানীর নামের উপরও ইউরোপীয়ান ভাষাবিদগণ অত্যাচার চালাতে কসুর করেন নি। তাঁদের কল্যাণে আরবের আলবাত্তানী শেষ পর্যন্ত রূপ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। পূর্বের নামের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছাড়া বর্তমানে ইউরোপে পরিচিত আলবাতেনিয়াস (Albatenius) বা আলবাতেজনিয়াস (Albategnius) কে আলবাত্তানী বলে ধরে নেওয়া খুবই কষ্টকর হোত সন্দেহ নাই।

আলবাত্তানীর সময়ে যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলকে। আলখারেজমির প্রণীত ফলকের চেয়ে বাত্তানীর ফলক অনেক জটিল তথ্যে পরিপূর্ণ। শুধু জটিলতাতেই এর সার্থকতা নয়। "ফিজিজ"-এ প্রচারিত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ছাড়া বহু নূতন নূতন বিষয় এতে সমাবেশ করা হয়েছে। "ফিজিজ" থেকে এর আর একটি বিশেষত্ব হোল তথ্যাদি নিরূপণের সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা ও সেগুলি প্রকাশের ভঙ্গিমা। আলখারেজমি "ফিজিজ" প্রণয়নে ভারতীয় পন্থা অনুসরণ করেন, বাত্তানী সেদিক দিয়েও মাড়ান নাই। সম্পূর্ণ অভিনব ভাবের গবেষণা প্রণালী তাঁর সময়কার জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নূতন রূপ দান করেছিল বলা চলে। তিনি পূর্বেকার আরবীয় এবং গ্রীক পন্থা অনুকরণেই অক্ষরমালাকে সংখ্যার প্রতীক ভাবে (হিসাব আল জুমল)

ব্যবহার করে একখানি ফলক তৈরী করেন। C. A. Nillano ১৮৯৯-১৯০৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে মিলান থেকে তিন খণ্ডে এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলক, সৌর আয়নমণ্ডলীর গতি, চান্দ্রমাসের সঠিক গণনা, নাক্ষত্রিক (Sidereal) এবং গ্রীষ্মমণ্ডল সংক্রান্ত (Tropical) বৎসরের দৈর্ঘ, চান্দ্রিক বিশৃঙ্খলতা (Lunar anomalies), চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, ঋতুর সঠিক সময় নির্ণয়, Parallax ইত্যাদি নানা বিষয়ের নূতনতম অবদান বাত্তানীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। তিনি পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের প্রবর্তিত অনেক ভুল সংশোধন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত করে তোলেন। আলখারেজমির সময় প্রচলিত যন্ত্রপাতি থেকে, বাত্তানীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিশেষ উন্নত ধরণের না হোলেও গণনা ও গবেষণার উৎকৃষ্টতা উপলব্ধি করা যায় তাঁর প্রচারিত তথ্যগুলিতে। এর পূর্বে সূর্যের সঠিক ও মধ্য কক্ষ সম্বন্ধে (True and mean orbit of the sun) বৈজ্ঞানিকদের যে ধারণা ছিল আলবাত্তানী তাকে সংশোধন করে সঠিক বার্তার সংবাদ দেন।

বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ই প্রথম সূর্যের কক্ষগতি (Apogee এবং Perigee) সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ প্রদান করেন। বাত্তানী নূতন প্রণালীতে যন্ত্রপাতি দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা কার্য চালিয়ে প্রমাণ করেন যে কক্ষগতির (Apogee এবং Perigee)র সচলতা সমরাত্রিদিনের প্রাগয়নের (Precession of

Equinoxes) উপর নির্ভর করে। মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের প্রমাণেও যদি কারুর সন্দেহ থেকে থাকতো বাত্তানীর বিশিষ্ট কার্যকলাপে সে সন্দেহ চিরতরে বিদূরিত হয়। বৈজ্ঞানিক টলেমির এতদিনকার পূজ্য মতবাদ আলবাত্তানীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় ধূলিসাৎ হয়ে সত্যের স্থান দিতে সরে দাঁড়ায়। বাত্তানী দেখিয়ে দেন যে টলেমির সময় থেকে সূর্যের তুঙ্গত্ব (altitude) ১৬°৪৭´ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হয় যে কক্ষগতি অচল স্থবিরের মত নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে নাই। কাল শোধনের (Equation of time) বিষয়টিও এ থেকেই পরিষ্কার ভাবে নির্ধারিত হয়।

বাত্তানী টলেমির প্রচারিত আরও কয়েকটি মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। তন্মধ্যে সূর্যের আপাত কৌণিক ব্যাস রেখা পরিবর্তন (The variation of the apparent angular diameter of the Sun) অন্যতম। এর পূর্ব পর্যন্ত টলেমির ভ্রান্ত মতবাদই সঠিক বলে চলে আসছিল, বাত্তানী সেটিকে সংশোধন করেন। বার্ষিক সূর্যগ্রহণ যে অসম্ভব ব্যাপার নয় আলবাত্তানী তার প্রমাণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডানথর্ণ (Dunthorne) আলবাত্তানীর সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর নির্ভর করে চন্দ্রের গতি ইত্যাদি বহুবিধ তথ্য নির্ণয় করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অমাবস্যার সঠিক গণনা বিষয়ে এক সুন্দর ঔপপত্তিক নিয়ম প্রচলনকারী হিসাবেও আলবাত্তানী জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপরিচিত।

সমরাত্রিদিনের প্রাগয়ণের কথা এর পূর্বেও জানা ছিল কিন্তু পূর্বে নির্ণীত সংখ্যাতে পরবর্তী গণনায় অনেক ভুল বেরিয়ে পড়ে। আলবাত্তানী সঠিক গণনা করে এই ভুলগুলি দেখিয়ে দেন। তাঁর গণনা অনুসারে প্রাগয়ণ হোল বৎসরে ৫৪°৫´´ ক্রান্তিবৃত্তের আনতি (inclination of the ecliptic) সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। তাঁর গণনা অনুসারে এই আনতি হোল ২৩°৩৫´। এই সমস্ত থেকেই বোঝা যাবে আলবাত্তানী জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কিরূপ বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। ৮৮০-৮১ খৃঃ অব্দে যে সমস্ত নক্ষত্রাদি স্থির বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল তার একটি তালিকা পাওয়া যায় বাত্তানীর জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলবাত্তানী প্রভূত উন্নতি সাধন করে থাকলেও অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসে তথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে যা তাঁকে অমরত্ব দান করেছে সে হোল তাঁর ত্রিকোণমিতির সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে পূর্ণ আলোচনা। এর আগে ত্রিকোণমিতির আলোচনা হোত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অত্যন্ত দরকারী শাখা হিসাবে। এর যে নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, এ যে নিজেই একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সেকথা প্রথম উপলব্ধি করেন আলবাত্তানী। প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দেশেই অনেক পূর্ব থেকেই ত্রিকোণমিতির আলোচনা হচ্ছিল; কিন্তু একে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে কেউ কোন দিন ভাবেন নাই। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক বৃদ্ধি ছাড়া এর স্বাভাবিক বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। একে অঙ্কশাস্ত্রের দরকারী এক দুষ্পাচ্য শাখা হিসাবেই এতদিন সবাই ধরে নিয়েছিল। টলেমি ত্রিকোণমিতিকে

যেমনভাবে ব্যবহার করে গেছেন তাতে বাত্তানীর পূর্ব পর্যন্ত একে সব্বাই একটু ভয়ের চোখেই দেখত বলা চলে। হয়ত ব্যবহারের দোষেই অঙ্কশাস্ত্রের এক অত্যাবশ্যকীয় শাখা হয়েও এর মুক্তিলাভ ঘটে নাই। বৈজ্ঞানিকগণও এর দিকে তেমন দৃষ্টি দেন নাই। স্বপ্নভঙ্গ নির্ঝরের মতই আলবাত্তানীর হাতে এই অত্যাবশ্যকীয় শাখাটির কুটিলতা নষ্ট হয়ে স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য ফুটে উঠে। বৈজ্ঞানিকগণও এর দিকে আকৃষ্ট হন।

শিঞ্জিনী (sine), প্রতিশিঞ্জিনী (cosine), স্পর্শজ্যা (tangent), প্রতিস্পর্শজ্যা (co-tangent) প্রভৃতি ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক শিক্ষা। এই সহজ সুষ্ঠু সাঙ্কেতিক নিয়মগুলিকে প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে আলবাত্তানীর পূর্বে কেউ সমর্থ হন নাই। টলেমি chords ব্যবহার করে ত্রিকোণমিতির সমস্যাগুলির সমাধান করেছিলেন। কিন্তু এই chords ব্যবহার করতে তিনি যে উপপাদ্যের সাহায্য নিয়েছিলেন সেটি যেমন জটিল তেমনি দুষ্পাচ্য। সহজ সমাধানকে জটিল করে তুলবার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোল টলেমির ত্রিকোণমিতির প্রথম উদ্ভাবন। প্রথম আবিষ্কর্তার এ অসুবিধা চিরকালের; শুধু টলেমিই নয় প্রত্যেক জিনিসেরই আবিষ্কর্তা এমনি ভাবে এলোমেলো পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর পরবর্তীগণই করেছেন তার সংশোধন ও উন্নতি। যা হোক টলেমির এই জটিল পন্থাই অঙ্কশাস্ত্রবিদগণ অনুসরণ করে আসছিলেন নবম শতাব্দী পর্যন্ত।

আরবীতে শিঞ্জিনী (sine) কে বলা হয় "জাইব",

এর অর্থ বক্র। লাটিনে বাত্তানীর ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলি অনুদিত হয় এবং এই লাটিন অনুবাদগুলিই আজ পর্যন্ত ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। “জাইব” এর লাটিন অনুবাদ হোল “sinus” তা থেকেই ‘সাইন’ ‘sineএর উদ্ভব। স্পর্শজ্যা (tangent) ও প্রতিস্পর্শজ্যা (co-tangent) এর উদ্ভাবনার সূত্রপাতের সঙ্গে সূর্যের গতিবিধির একটি নিকটতম সম্বন্ধ দেখা যায় আরব বৈজ্ঞানিকদের ত্রিকোণমিতিতে। ছায়াঘড়ির উপরকার সমতলস্থ ছায়ার ধারণা থেকেই প্রতিস্পর্শজ্যা (co-tangent) এবং উর্ধতলস্থ ছায়ার ধারণা থেকেই স্পর্শজ্যা (tangent) এর উদ্ভাবনা। এতে অবশ্য বর্তমানের সঙ্গে কোন গরমিল হয় নাই তবে এখনকার উদ্ভাবনার পন্থার সঙ্গে একটু গরমিল আছে। তাই বলে এ পন্থাকে অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। প্রথম আবিষ্কর্তার অসুবিধা ছাড়া এর মধ্যে বিজ্ঞানদোষ আর বিশেষ কিছুই নাই।

ত্রিকোণমিতির এই চিহ্নগুলির আবিষ্কার এবং তাদের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য প্রভৃতি আলোচনাতেই যে আলবাত্তানীর ত্রিকোণমিতিতে দান সীমাবদ্ধ তা নয়। এগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জটিল অঙ্কশাস্ত্রের আয়ত্তের মধ্যে নেওয়াও তাঁর এই স্বতন্ত্র নব আবিষ্কৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণার পরিচয়। শিঞ্জিনী (sine) এবং প্রতিশিঞ্জিনী (cosine) এর সঙ্গে স্পর্শজ্যার (tangent) সম্বন্ধ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর উদ্ভাবিত ফরমুলা ত্রিকোণমিতিকে পূর্ব পরিচিত গণ্ডী

ছাড়িয়ে অনেক উচ্চস্তরে উন্নীত করে। কোন কোণের শিঞ্জিনী জানা থাকলে তার স্পর্শজ্যা বের করা বা স্পর্শজ্যা জানা থাকলে শিঞ্জিনী বের করা এই ফরমুলার সাহায্যে অতি সহজেই নিষ্পন্ন হোতে পারে। অধুনা প্রচলিত প্রতীক চিহ্নাদি ব্যবহার করে ফরমুলা দাঁড়াবে $\sin\alpha = \frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}$ এবং $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}$ এই ফরমুলাটিই আজকাল প্রচলিত। ত্রিভূজের বাহুর সঙ্গে কোণের ত্রিকোণমিতিক সম্বন্ধও আলবাত্তানীই উদ্ভাবনা করেন। তাঁর প্রচারিত নিয়মটি হোল, $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$. তিনি কোণের ডিগ্রী অনুসারে স্পর্শজ্যা এবং প্রতিস্পর্শজ্যার মান বের করার একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। ত্রিকোণমিতির উদ্ভাবনা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পারিপার্শিক বিজ্ঞান অনুসারে। বাত্তানীও এদিক দিয়ে কসুর করেন নাই। সূর্যের তুঙ্গত্ব নির্ণয়ে তিনি যে প্রণালীর আশ্রয় নিয়েছিলেন বর্তমানে ত্রিকোণমিতি অনুসারে সেটি দাঁড়ায়

$$x = \frac{2\,\text{Sin}\,(90-\alpha)}{\text{Sin}\,\alpha} = 2\,\text{Cot}\,\alpha.$$

আলবাত্তানীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেকগুলিরই কোন সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এমন কি অনেকগুলোর নাম পর্যন্ত জানা যায় নাই। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে যেগুলোর অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে সবগুলোই শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনাতেই ভরপূর।

এগুলোর মধ্যে নিম্নের চারখানাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—
(১) কিতাব মারেফাত মাতালি আলবুরুজ ফি মা বায়না আবরা আল ফালাক "The book of the Science of the ascensions of the signs of the Zodiac in the spaces between the quadrants of the celestial Sphere." জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয় সমূহের অঙ্কের সাহায্যে সমাধানই এর বৈশিষ্ট। (২) রিসালা ফি তাহকিক আকদার আল ইল্লিসালাত A letter on the exact determination of the question of the astrological application, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয় সমুহের বিশেষ করে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি সম্বন্ধে ত্রিকোণমিতিক সমাধান এর বৈশিষ্ট। (৩) সারাহ্ আল মাকালাত আল আরবা লি বাতলিমিয়াস, টলেমির ট্রেটাবিলসএর ভাষ্য। (৪) আলজিজ, জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ ও ফলক। এই চতুর্থ পুস্তকখানি সবদিক দিয়েই উন্নত এবং কয়েকখানির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আলবাত্তানীর সুদূর প্রসারী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং তৎসঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে কার্যকারণ বিশ্লেষণের বৈশিষ্টের জন্য এ পুস্তকখানি শুধু পরবর্তী আরব বৈজ্ঞানিকদের উপরই নয়, রিনাসাঁ পর্যন্ত ইউরোপের বিজ্ঞান জগতে এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতির বর্তমান পরিস্থিতির মূলে এর দান অনেকখানি। এর জনপ্রিয়তা হিসাবে এইটুকু বললেই চলে যে ক্যাষ্টাইলের দশম আলফানসো লাটিন অনুবাদে

তৃপ্ত না হয়ে মূল আরবী থেকে পুনরায় স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করান।

এই সময়কার অন্য কয়েকখানি ছোট ছোট পুস্তিকারও সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর গ্রন্থকারদের নাম লাটিন অনুবাদে দাঁড়িয়েছে, বেথেম (Bethem), বোয়েলিয়েন (Boelien), বেরেনী (Bereni) প্রভৃতি। আলবাত্তানীই এ গ্রন্থগুলোর প্রণেতা বলে অনেকেই মনে করেন।

আলবাত্তানীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিজ্ঞানে কেউ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না। অন্তত তাঁর কার্যকলাপে তেমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অনেকের মতে "ফিহরিস্তে" উল্লেখিত অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞান যন্ত্রবিদ জাবির এবনে সিনানি আলহাররানী, আলবাত্তানীর পূর্বতম পুরুষ। আলবাত্তানীর পূর্ণ নামের সঙ্গে এঁর নামের সৌসাদৃশ্য দেখে G. Sarton এঁকে আলবাত্তানীর পিতা বলে মত প্রকাশ করেছেন। আলবেরুনীর মতে জাবিরই সর্বপ্রথম গোলাকার আস্তারলাব (Spherical astrolabe) প্রস্তুত করেন।

আলবাত্তানীর সমসাময়িক অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে রাজেস (Rhases), ইবরাহিম, আলফারাবি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁদের দান খুব কম নয়। তবে আলবাত্তানীর পরে, দশম শতাব্দীতে অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য যিনি বিজ্ঞান জগতে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত, তাঁর নাম হোল আবুল ওয়াফা। বাত্তানীর মৃত্যুর

প্রায় একুশ বৎসর পরে আবুল ওয়াফার জন্ম হয়। তিনি দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত জীবিত থেকে নিজের জ্ঞানগরিমা দ্বারা ইসলামের বিজ্ঞান জগতে যে অমরকীর্তি সংস্থাপন করেন, সে শুধু যুগবিশেষ নয়, অনাগত ভবিষ্যতেও অম্লান গৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হবে।

রাজেস, আবুবকর মোহাম্মদ এবনে জাকারিয়া আল রাজির ইউরোপীয় নাম। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। পণ্ডিত্যের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একাধারে সুবিখ্যাত চিকিৎসক, দার্শনিক, রাসায়নিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও কলাবিদ। তবে অন্য সমস্ত গুলোকে ছাপিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানেই তাঁর প্রতিভা সর্বতোভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

৮৬৪ খৃঃ অব্দে (২৫০ হিজরীতে) পারস্যের জিবাল প্রদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে তৎকালীন সুবিখ্যাত নগর "রাই"তে তাঁর জন্ম হয়। এখানেই তিনি অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন এবং বেলস লেটারস (Belles Letter) বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। সম্ভবত রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষাও এইখানেই সুরু হয়। আলরাজী প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের দিকে কোন মনোযোগই দেন নাই। অন্য সাধারণ ছাত্রের মতই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে বিদ্যার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিলোপ করে দেন।

আল রাজী

অন্তর্নিহিত প্রতিভা মানুষকে তার সাধনার পথে চালিয়ে নেবেই। তিনিও প্রথম জীবনে জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে উপেক্ষা প্রদর্শন করলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জীবনের

কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়ার জন্য তাঁর মনে এক আকুল আগ্রহ জেগে উঠে, তাঁকে আবার এইদিকেই টেনে আনে। চিকিৎসা ব্যবসাকেই তিনি তাঁর সাধনার পথ হিসাবে বেছে নেন। এতে তিনি যে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন সমস্ত মুসলমান নরপতিদের আদর দেখেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অপূর্ব প্রতিভার খ্যাতি সমস্ত মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি একের পর এক প্রায় সমস্ত নৃপতির চিকিৎসক ও সভাসদ হিসাবে বরিত হন।

আলরাজীর চিকিৎসা শাস্ত্রে মনোনিবেশ করার কারণ হিসাবে কতকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। একটি হোল যে তিনি একবার বাগদাদে বেড়াতে যান। এখানে এক আশ্চর্য ধরণের রোগ নিরাময়ের কাহিনী তাঁর শ্রুতিগোচর হয়। অনুসন্ধানে জানতে পারেন যে শহরের উপকণ্ঠে কার্থ নামক স্থানে খালের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পুরাতন হাঁসপাতালের চিকিৎসকগণই এই অদ্ভুত পন্থাটির আবিষ্কারক এবং তাঁরাই এটি ব্যবহার করছেন। সন্ধানীর অনুসন্ধিৎসু মন এই স্বল্পজ্ঞানেই নিরস্ত হয়নি তিনি চিকিৎসকগণের নিকট থেকে সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হন এবং এই অদ্ভুত পন্থাটির রোগ নিরাময়ের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেও এর ব্যবহার আরম্ভ করেন। এ থেকেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হন। আর একটি তাঁর রসায়নশাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে জড়িত। তিনি রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকতে একবার অকস্মাৎ বিষাক্ত গ্যাসের

প্রশ্বাস গ্রহণ করেন। ফলে তাঁকে হেকিমের শরণাপন্ন হতে হয়। হেকিম সাহেব তাঁকে নিরাময় করে তোলেন বটে কিন্তু এর জন্য পঁয়ত্রিশ শ ৩৫০০৲ টাকা চার্জ করেন। এই সামান্য কাজের জন্য হেকিম সাহেবের বিরাট বিলটি দেখেই তিনি বলে উঠেন "এইবার আলকেমী বা স্বর্ণ উৎপাদনের রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছি"। এর পর থেকেই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করেন।

আল্‌রাজী প্রথমে রাইএর নৃপতির চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং তাঁর আগ্রহক্রমে প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতালের অধ্যক্ষের ভার প্রাপ্ত হন। এখান থেকে তিনি বাগদাদে নীত হয়ে খলিফার চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং তথাকার হাসপাতাল সমূহের ভার প্রাপ্ত হন। এই ভাবে একের পরে একে তিনি প্রায় সমস্ত রাজ্যেই রাজচিকিৎসক ও সভাসদ নিযুক্ত হন; কিন্তু কোন স্থানেই স্থির হয়ে বেশী দিন যাপন করতে পারেন নাই। তাঁর খ্যাতিই তাঁকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে দৌড়িয়ে নিয়ে যাযাবর জীবন যাপন করাতে বাধ্য করেছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি জন্মভূমিতে ফিরে আসতেন বটে কিন্তু বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারতেন না। ৯২৫ খৃঃ অব্দে (৩১৩ হিজরীতে, আলবেরুনীর মতে ৫ই সা'বান তারিখে) আলরাজী নিজ জন্মভূমি রাইতে পরলোক গমন করেন।

মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবেই আলরাজী পরিচিত। চিকিৎসা-বিজ্ঞন শাস্ত্রে তাঁর মৌলিক দানের সম্বন্ধে

শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে এখনও তাঁর উদ্ভাবিত অনেক পন্থাই চিকিৎসা শাস্ত্রে সাদরে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁর বহু গ্রন্থাবলী প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত। রসায়ন শাস্ত্রেও তিনি অনেকগুলি নূতন বিষয় প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে প্রতীক চিহ্নাদির প্রবর্তন অন্যতম। বস্তুত তাঁকে বর্তমান রসায়ন শাস্ত্রের প্রবর্তকও বলা যেতে পারে।* যাহোক এসব সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা সাবে।

শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রেই আলরাজীর অপূর্ব বিজ্ঞান প্রতিভার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেব অন্যান্য বিভাগের আলোচনাও এই চিকিৎসকের জীবনের একটি কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়েছিল। সেই কর্তব্যজ্ঞানই হয়ত তাঁকে অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যেও টেনে নিয়েছিল। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতি সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। বল বিজ্ঞান (mechanics) সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন। এ সম্বন্ধেও তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে ওজন সম্বন্ধীয় এক গ্রন্থ "মিজান তাবিই" ছাড়া অন্য কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দুঃখের বিষয় পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোক (optics) সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিই অধুনা বিলুপ্ত।

নবম শতাব্দীর বিখ্যাত জ্যামিতিক ছাবেতের বংশে যে বিজ্ঞান

* [Al Razi might be considered the fore runner of the Iatro chemists of the Renaissance. Sarton. Introduction to the History of Science Vol. I, pp. 507].

আলোচনা জাগ্রতই ছিল সে তাঁর পুত্র ও পৌত্রেরও বিজ্ঞান আলোচনাতে যোগ দেওয়াতেই বোঝা যায়। ছাবেতের ন্যায় তাঁর পুত্র সাইদ এবনে সিনান এবনে ছাবেত এবনে কোরাও বিজ্ঞান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পিতার ন্যায় তিনিও প্রথমে চিকিৎসা শাস্ত্রেই মনোনিবেশ করেন এবং এদিক দিয়ে বিশেষ খ্যাতিও লাভ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর প্রতিভা যে বিশেষ উপেক্ষণীয় নয় তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাপ্ত রাজসম্মান থেকেই। তিনি খলিফা আলমুতাকিদ, আলকাহির এবং আলরাজীর চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং সে হিসাবে তৎকালে বাগদাদে যথেষ্ট প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। বাগদাদের হাঁসপাতাল সমূহের ভারও তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি এগুলির সমূহ উন্নতি সাধন করেন। এই সময়ে তাঁরই প্রচেষ্টায় চিকিৎসা ব্যবসায়ের মানদণ্ড অনেক উন্নত হয়। খলিফার আদেশক্রমে হাতুড়ে চিকিৎসকদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। যে কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা ব্যবসা করতে হোলে তৎকালীন মেডিক্যাল বোর্ডের এক কঠোর পরীক্ষায় পাশ করতে হোত। সিনানও এই বোর্ডের অন্যতম সভ্য হিসাবে প্রায় আট'শ চিকিৎসককে ডিপ্লোমা দেন। যাহোক চিকিৎসা বিজ্ঞানেই তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত হয় নাই। পিতার বিজ্ঞান পিপাসা পুত্রতেও বর্তেছিল। সিনান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও কিছু কিছু আলোচনা করেন। জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তাঁর দান সমধিক উল্লেখযোগ্য। আর্কিমেডিসের

সিনান এবনে ছাবেত

কতকগুলি পুস্তকেরও তিনি সিরিয়ান ও আরবীতে অনুবাদ করেন। সিনান ৯৪৩ খৃঃ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ছাবেতের বিজ্ঞান বুদ্ধি তাঁর পৌত্র আবু ইসহাক ইব্রাহিম এবনে সিনান এবনে ছাবেত এবনে কোরার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। অবশ্য এমনিতে তাঁর প্রতিভার নিদর্শন বিশেষ কিছুই নাই। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদের বংশধরের অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক

ইব্রাহিম এবনে সিনান

প্রতিভার দান বিশেষ কিছু না থাকার মধ্যে প্রতিভার অপ্রাচুর্যের চেয়ে নিয়তির বিচারহীন অন্ধ হস্তক্ষেপের পরিচয়ই বেশী। যৌবনের প্রথম ভাগেই স্ফুটোনোন্মুখ দীপ্তি কালের ফুৎকারে নির্বাপিত হয়ে যায়। মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে ইব্রাহিম কালগ্রাসে পতিত হন। বিজ্ঞান প্রতিভা স্ফুরিত হয় সাধনার বলে। যৌবনের প্রারম্ভে, সবে সাধনার যখন আরম্ভ তখনই নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে সাধনার পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পেয়েই ইব্রাহিমকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। তাই তাঁর প্রতিভা কোন স্তরের ছিল তার বিচার হওয়া অসম্ভব। ইব্রাহিম এবনে সিনান ৯০৮ খৃঃ অব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪৬ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই স্বল্প সময়ের কার্যেরই যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তিনি তাঁর পিতামহের বিজ্ঞান প্রতিভার পূর্ণ উত্তরাধিকারীই ছিলেন। তিনিও পিতামহ এবং পিতার মতই ব্যবসায়ে ছিলেন চিকিৎসক কিন্তু ব্যবসায়ে রত থেকেও তিনি Conics, জ্যোতির্বিজ্ঞান সূর্যঘড়ি প্রস্তুতের কৌশল ইত্যাদি

সম্বন্ধে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। Conics-এর প্রথম পুস্তকের এবং আলমাজেষ্টের ভাষ্যও লেখেন। তা ছাড়া জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন।

অধিবৃত্ত (Parabola) এর সমপরিমাপ বিশিষ্ট বর্গ (Quadrature) বের করতে তিনি যে প্রণালী উদ্ভাবন করেন অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে তার স্থান অনেক উচ্চে। সরলতা এবং তথ্যের দিক দিয়ে আর্কিমেডিসের প্রবর্তিত প্রণালী থেকেও এটি সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বস্তুত Integral Calculas বর্তমান আকারে ব্যবহৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইব্রাহিমের প্রথাই ছিল এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আলফারাবী

পূর্বে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ করা হোত না। দার্শনিকরাও বৈজ্ঞানিকদের মতই বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করতেন। যেখানে হাতে কলমে কাজ করতে হোত, বিজ্ঞানের সেই অংশটুকু বাদ দিলে, তখনকার দর্শন ও ঔপপত্তিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা যায় না। তখনকার অনেক বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞান বিষয়ে চর্চা করার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেও গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হয়েছেন দেখা যায়। নবম শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক আলকিন্দির মত আলফারাবীও বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। দর্শনের গবেষণার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জগতের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণত তিনি দ্বিতীয় এরিষ্টটল (Second master after Aristotle, আল মুয়াল্লিম আলছানি) নামে পরিচিত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান তাঁকে মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে অভিহিত করেছেন ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন। এ থেকেই ধারণা করা যায় তাঁর উচ্চ দর্শন অভিজ্ঞান কতখানি উন্নত ধরণের। আলকিন্দির প্রবর্তিত ইসলামিক দর্শনের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সুমধুর সামঞ্জস্য স্থাপন করার মধ্যেই তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। পরবর্তী দার্শনিক এবনে সিনা তাঁর এই নব প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করেই দর্শনের এক নূতন রূপ দান করেন।

দর্শন ছাড়া অন্য যে সুকুমার বিদ্যায় তিনি সর্বাধিক পারদর্শী

ছিলেন সে হোল সঙ্গীত। মুসলিম জগতে সঙ্গীত বিজ্ঞানে তাঁর স্থান অনেক উচ্চে। সঙ্গীত বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের এক নিকটতম সম্বন্ধ আছে এর উন্নত স্তরে। এর সপ্তগ্রামের সুরের মধ্যে অঙ্কের ভগ্নাংশের বিশেষ আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। এই সুর সাধনা ভগ্নাংশের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। আরবীয় সঙ্গীতের সমস্ত নিয়মাবলী ভগ্নাংশে প্রচলিত। হয়ত এই সুর সাধনাই ফারাবীকে অঙ্কশাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করে এবং আলকিন্দির মত তিনিও বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ "কিতাব আলমুসিকি" বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসাবে বিশেষ উচ্চ স্তরের, সঙ্গীত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনাই এর বিশেষত্ব।

আলফারাবী তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়েই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিভাগেই তাঁর কিছু না কিছু হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও মৌলিকতার দিক দিয়ে এর মূল্য কতখানি সে বিষয় বিচার্য, তবুও এরা বৈজ্ঞানিকের সাধনা, উৎসাহ এবং ধৈর্যের যে পরিচয় দেয় তা অপূর্ব। তিনি

আল ফারাবী

এরিষ্টটলের অনেকগুলি গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন ; তন্মধ্যে পদার্থ-বিদ্যা (Physics) ভূ-বিদ্যা (Metereology) জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ভাষ্যগুলি অন্যতম। তাঁর প্রণীত টলেমির আলমাজেষ্টের একখানি ভাষ্যেরও সংবাদ পাওয়া যায়। এ সমস্ত ছাড়া, ডিটিরিসির মতে, তিনি আরও আট দশ খানি গ্রন্থ

প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে বিজ্ঞান রত্ন (রিসালা ফুসাস আল হিকাম), আদর্শ নগরী (রিসালা ফি মাবাদি আরা আহ্‌ল আল মদিনা ও আল ফাজিলা), বিজ্ঞান বিশ্বকোষ (কিতাব ইহ্‌ছা আল উলুম) বা Encyclopædia of Science সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের বিজ্ঞান তথা শিক্ষার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম ও উৎসাহের নিদর্শন। এতে তিনি তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়েরই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। সে সময়ে বিজ্ঞান কতদূর উন্নত ছিল তার সাক্ষ্যরূপে এর মূল্য খুবই বেশী। দুঃখের বিষয়, মূল আরবী গ্রন্থখানির কোন সন্ধানই এ পর্যন্ত হয় নাই। শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতিতেই তাঁর যা মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য কোন বিভাগে বিশেষ কিছু করেছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

আলফারাবী জাতিতে ছিলেন তুর্কী। তুর্কস্থানে ফারাব নগরীর নিকটে ওয়াসিজিতে তাঁর জন্ম হয়। প্রথম বয়সে তিনি বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন ও জীবিকা উপার্জনের জন্য চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা শীঘ্রই চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আলেপ্পোর বাদশাহ সইফুদ্দৌলা আলি এবনে হামদান তাঁর গুণগ্রামে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের সভাসদ হিসাবে গ্রহণ করেন। ফারাবীও অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় বাদশাহের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ রাজকীয় অনুগ্রহ ভোগ করেন। সইফুদ্দৌলার আশ্রয়েই তিনি আজীবন সুফি ধর্ম পালন করে নিরাপত্তে

দিনাতিপাত করেন এবং নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন। ৩৩৬ হিজরী রজব মাসে (৯৫৬ খৃঃ অব্দে) ৮০ বৎসর বয়সে দামস্কাসে তাঁর মৃত্যু হয়। বাদশাহের এক অভিযানের সঙ্গী হয়েই তিনি এস্থানে আগমন করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই স্থানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু নসর মোহাম্মদ এবনে মোহাম্মদ তারখান বিন উজলাগ আল ফারাবী।

আলনাইরেজীও আলবাত্তানীর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক। আলবাত্তানীর পূর্বেই ৯২৩ খৃঃ অব্দে (কারুর কারুর মতে ৯২২) তিনি এন্তেকাল করেন। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতিই তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল এবং এই দিকেই তিনি প্রথম থেকেই মনোনিবেশ করেন, তবে আলবাত্তানীর প্রভাবও যে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন নাই, জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আলনাইরেজী

তাঁর জ্যামিতিক মৌলিক প্রবন্ধরাজি ও ইউক্লিডের ভাষ্য শুধু প্রবন্ধ ও ভাষ্য হিসাবেই মনোযোগ আকর্ষণ করে না, মৌলিকত্বের দিক দিয়েও এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সুস্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দেয়। সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক জিরার্ড এই গ্রন্থখানির লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করে পাশ্চাত্য জগতকে জ্যামিতি সম্বন্ধে সজাগ করে তোলেন বললে অসঙ্গত কিছু হবে না। টলেমির ভাষ্যও এই মনীষীর অন্যতম কীর্তি।

আলনাইরেজীর উপর আলবাত্তানীর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় বৈজ্ঞানিকের জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনায়। যতদূর মনে হয়

জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন খলিফা আলমুতাজিদের উৎসাহে। খলিফার জন্যেই তিনি নৈসর্গিক ঘটনাবলীর বিচিত্র কাহিনী অবলম্বন করে এবং সেগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সুন্দর একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ত্রিকোণমিতিতেও তাঁর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য-ঘ ড়র উর্ধতলস্থ ছায়াকে শিঞ্জিনীর সম হিসাবে ব্যবহার করাই তিনি শ্রেয় মনে করতেন ; এ হিসাবে তাঁকে হাবাশের মতানুবর্তী বলা চলে। এ ছাড়া তিনি গোলাকার আস্তারলব (Spherical astrolabe) সম্বন্ধে সুবিস্তারিত ভাবে একখণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করেন। আস্তারলব সম্বন্ধীয় আরবী গ্রন্থাবলীর মধ্যে এখানি অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থখানি প্রধানত চার খণ্ডে বিভক্ত—(১) প্রথম খণ্ডে ঐতিহাসিক অবতারণার সঙ্গে মুখবন্ধ। (২) দ্বিতীয় খণ্ডে গোলাকার আস্তারলবের বর্ণনা। সাধারণ আস্তারলব এবং অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতির অপেক্ষা এর ঔৎকর্ষ ও শ্রেয়তার কারণ প্রদর্শন। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এর ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থখানি কিছুদিন পূর্বে জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এই অনুবাদ খানির নাম হোল Schoy Abhandlung von al Nairizi uber die Riehtungder qibla ubersetztunderlantart.

আলনাইরেজীর পূর্ণ নাম হোল আবুল আব্বাছ আলফজল এবনে হাতিম আলনাইরেজী। তিনি সিরাজের নিকটবর্তী নাইরেজ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

আবুল ওয়াফা

দশম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবুল ওয়াফার নাম অঙ্কশাস্ত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতির সঙ্গে বিজড়িত। নবম শতাব্দীর সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমানভাবে আলোচনা করবার আগ্রহ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই নিস্তেজ হয়ে আসছিল বলে মনে হয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন এক বিভাগকে বেছে নিয়ে সেই দিকেই মনোযোগ দিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যেতে পারে, অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে এ ভাবনা অস্ফুট ভাবে জেগে উঠেছিল। কেউ কেউ পূর্বের বৈজ্ঞানিকদের চিরাচরিত প্রথাকে ছেড়ে দিয়ে স্পষ্টভাবেই এক বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। যাঁরা তেমন ভাবে মনের দুর্বলতা সজোরে ঝেড়ে ফেলতে না পেরে, পূর্ব প্রথা মত সকল বিষয়েই আলোচনা করতে থাকেন তাঁদের মধ্যেও যেন সর্ববিষয়ে সমান আগ্রহের অভাব বিশেষ করেই পরিলক্ষিত হয়। মোটকথা, এই সময় থেকেই বৈজ্ঞানিকগণ কোন এক নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোনিবেশ করবার সুফলের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। যাঁদের কাজের মধ্যে দশম শতাব্দীতেই এই ভাবটা স্পষ্টরূপে জেগে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে মনীষী আবুলওয়াফা অন্যতম। তাঁর সমস্ত প্রতিভা শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যেই সন্নিবেশিত হয়েছিল বলেই বোধ হয়, এতে তাঁর দানও হয়েছে অতুলনীয়।

খোরাসান প্রদেশের বুজ্জান নগরে (৩২৮ হিজরী ১লা রমজান) ৯৪০ খৃঃ অব্দে ১০ জুন তারিখে (কারুর কারুর মতে ৯৩৯ খৃঃ অব্দে) আবুল ওয়াফার জন্ম হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ এবনে ইয়াহিয়া এবনে আল আব্বাছ আলবুজ্জানি। তিনি আরব কি পারস্য বংশসম্ভূত সে বিষয়ে বিশেষ মতদ্বৈধ দেখা যায়। তবে অধিকাংশের মতে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পারস্যবাসী।

আবুল ওয়াফা অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম বৈজ্ঞানিক হোলেও তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার কেমন প্রসার ছিল তা জানা যায় না। তবে পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ তেমন বিখ্যাত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর অস্পষ্ট জীবনীতে দেখা যায় তিনি প্রথম জীবনে তাঁর সম্পর্কিত দুই পিতৃব্য আবু আমর আলমুগাজিনি এবং আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে আম্বাসার নিকট অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এঁরাও যে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এমন মনে করবার কোন কারণ নাই। হয়ত প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। অখ্যাত অজ্ঞাত ভাবে জন্মগ্রহণ করলেও প্রতিভার দীপ্তি শীঘ্রই আবুল ওয়াফাকে বিদ্বান সমাজে সুপরিচিত করে তোলে। ৩৪৮ হিজরীতে বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইরাকে গমন করেন এবং তখন থেকেই বিজ্ঞান আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পরে বাগদাদকেই গবেষণার উপযুক্ত স্থান বলে নির্ণয় করে তিনি এই স্থানেই বসবাস সুরু করেন। ৯৯৮ খৃঃ অব্দে

জুলাই মাসে (৩৮৮ হিজরী, রজব) বাগদাদেই তিনি পরলোক গমন করেন। জন্মতারিখের মত মৃত্যু তারিখ নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। কারুর কারুর মতে তাঁর মৃত্যু হয় ৯৯৭ খৃঃ অব্দে, ৩৮৭ হিজরীতে।

আবুলওয়াফা অঙ্কশাস্ত্রের সমস্ত শাখায়ই কিছু না কিছু আলোচনা করেছিলেন। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোনমিতিই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, এই দুই শাখাতেই তাঁর দানও হয়েছে অতুলনীয়। অন্যান্য বিভাগেও তাঁর দান কম নয়। অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি নিয়েও তিনি বহু আলোচনা করেন। এগুলিতেও তাঁর প্রতিভা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলবাত্তানীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসমাপ্ত কার্যাবলীর উত্তরাধিকারী হিসাবেই যেন আবুলওয়াফা পুনর্বার এর আলোচনা আরম্ভ করেন। আলবাত্তানীর পরে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক তাঁর সুষ্ঠু নিয়মবদ্ধ প্রণালী অনুসারে গবেষণায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নাই। ওয়াফার হস্তে সেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মৃত বৈজ্ঞানিক প্রথাগুলি পুনর্জীবন লাভ করে। 'জিজ-আল-সামিল' বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদদের নিকট বিশেষ পরিচিত। বিশদভাবে ব্যাখ্যা এবং তৎসহ সঠিক পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ জ্ঞানপূর্ণতথ্যাদিই এর বিশেষত্ব। এই সকল পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিকের কষ্টসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। আবুলওয়াফাই এই জিজ রচয়িতা। মঁসিয়ে

সেডিলোটর (M. Sedillot) মতে টলেমির চন্দ্রসম্বন্ধীয় গণনায় মতবাদের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেই, আবুলওয়াফা পূর্বতন বিজ্ঞানবিদদের পর্যবেক্ষণগুলিকে নূতন ভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই ভুল সংশোধনের জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা মৌলিক আবিষ্কারের ভিত্তি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। কেন্দ্র ও স্থানচ্যুতির সমীকরণ (The equation of centre and eviction) আবুল ওয়াফারই আবদান। এর পূর্বে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই বৈজ্ঞানিকের অন্যান্য আলোচনা ও আবিষ্কারের কথা বাদ দিলেও যা তাঁকে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানবিদদের মধ্যে স্থান দান করেছে, সে হোল চন্দ্রের তৃতীয় অসমতা (Third Luner inequality) সম্বন্ধে আলোচনা। গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অসমতার কথা জানতেন। সে সম্বন্ধে তাঁরা বিস্তারিত তথ্যও রেখে গেছেন কিন্তু তৃতীয় অসমতার কথা প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোন দেশীয় বৈজ্ঞানিকেরই পরিজ্ঞাত ছিল না। এমন কি আবুলওয়াফার মৃত্যুর পরেও ছয় শত বৎসর পর্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবনই করতে পারেন নাই। আধুনিক Astronomy-তে এই অসমতা "variation" নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

আবুল ওয়াফা সত্যসত্যই সঠিকভাবে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে পেরেছিলেন কি না সে বিষয়ে পাশ্চাত্য

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। Sedillot এর মতে আবুল ওয়াফাই এর সর্বপ্রথম আবিষ্কারক এবং তিনি এর নাম দেন "ইখতিলাফ আলমুহাজাত"। প্যারিসের একাডেমি দ্য সিয়ঁাস (Academie de Sciences) এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে বাদানুবাদ চলেছে, কিন্তু তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নাই। বিরুদ্ধবাদীদের মতে অধুনা প্রচলিত মতবাদের মত আরবীয়েরা প্রথম দুইটি অসমতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন না, তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে দুইটির আলোচনা করতেন। এতেই মনে হয় তাঁরা তৃতীয়টির কথা সঠিকভাবে বুঝতেই পারেন নাই। তাঁদের মতে আবুল ওয়াফার "মুহাজাত" টলেমির Prosneusis এর উন্নত আরবী সংস্করণ মাত্র।

প্রথম দুইটি অসমতার কথা গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের সময় থেকে প্রচলিত। জ্ঞান শিষ্য হিসাবেই আরব বৈজ্ঞানিকগণ এ দুটির কথা জানতে পারেন। গুরুদের অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে যদি কোন কিছু উন্নতি হয়ে থাকে, তা হোলে পূর্বের অস্পষ্ট ও অমার্জিত জ্ঞানের, বৈজ্ঞানিক ধারণারও যে পরিবর্তন হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সে হিসাবে তৃতীয় অসমতা আবিষ্কারের মর্য্যাদা আবুল ওয়াফাকে দেওয়ার মধ্যে কোন বাধা উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। আবুল ওয়াফার পর্যবেক্ষণের সমস্ত তথ্যাদি সবিস্তারে অবগত হোতে পারলে হয়ত এ দ্বন্দের মীমাংসা সম্ভবপর হোত। অন্যান্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মত তাঁরও সমস্ত গ্রন্থের সংবাদ এখনও পাওয়া

যায় নাই ; তাই এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করা এখনও সম্ভবপর নয়। ভবিষ্যতের অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকেরা হয়ত জগৎকে সঠিক সংবাদ দিতে পারবেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আবুল ওয়াফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দানের বিষয়ে অধুনা মতভেদ দেখা গেলেও, ত্রিকোণমিতিতে তাঁর প্রতিভাকে সর্ববরেণ্য বলে মেনে নিতে কোন বিরোধিতা দেখা যায় না। বস্তুত ত্রিকোণমিতিতে আলবাত্তানীর সময় থেকে যে উন্নতি পরলক্ষিত হয়, আবুল ওয়াফার হস্তে সে উন্নতি-বেগ অব্যাহত থেকে যায়। ত্রিকোণমিতিও তার সঙ্কীর্ণ কোণ ছেড়ে বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিজের আধিপত্য স্থাপন করে নিতে থাকে। আলবাত্তানীর স্বপ্ন আবুলওয়াফার হস্তে বাস্তবে পরিণত হয়। পূর্বেকার অস্ফুট ত্রিকোণমিতি এক্ষণে সম্পূর্ণতার দিকে ক্রমবর্ধমানের পথে এগুতে থাকে। এর উপপাদ্য, প্রমাণ, প্রমাণিত বিষয় সমূহের সুষ্ঠু নিয়মবদ্ধভাবে প্রচলন করেন আবুলওয়াফা। আলবাত্তানীর সময় ত্রিকোণমিতি স্বাধীনতার রূপ নিয়েছিল, আবুলওয়াফার সময় সে স্বাধীনভাবেই ফুটে উঠে।

দুই কোণের শিঞ্জিনীর (Sine) এর সমষ্টি যে শিঞ্জিনী এবং প্রতিশিঞ্জিনী (Cosine) দ্বারা নির্ণয় করা যায়, তার প্রথম উদ্ভাবনা হয় আবুলওয়াফার হাতে। বর্তমান ত্রিকোণমিতির ফরমুলা $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ ত্রিকোণমিতির প্রথম শিক্ষা বল্লেই চলে। কিন্তু আবুলওয়াফার পূর্ব পর্যন্ত অঙ্কশাস্ত্রবিদদের এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না।

পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের কথা ছেড়ে দিলেও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস ও (Copernicus) যে এই সহজ ফরমুলাটি সম্বন্ধে এক প্রকার অজ্ঞই ছিলেন সে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী থেকেই বুঝা যায়। তাঁর প্রিয় শিষ্য রাটিকাস (Rhaeticus) কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থাবলীতে এই সহজ ফরমুলাটির কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। তবে অনুরূপ সিদ্বান্তে তিনিও উপনীত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের পথটি যেমন জটিল তেমনি কুটিল। বিজ্ঞানের ইতিহাসের অসম্পূর্ণ জ্ঞানই কোপার্নিকাসের এই অদ্ভুত প্রথার জন্য দায়ী। আবুলওয়াফার উদ্ভাবিত এই সহজ পন্থাটি অবগত হোলে হয়ত কোপার্নিকাসের দান বিজ্ঞানকে আরও উন্নত করতে পারত কিন্তু তা হয় নাই। এই জবরজঙ্গ গোছের কোপার্নিকাসী ফরমুলা শুধু বিজ্ঞান ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই নিবদ্ধ রয়েছে, বাইরে কার্যকরী হয় নাই; বিজ্ঞানের উন্নতির সাহায্যও কিছুমাত্র করতে পারে নাই।

মণ্ডলাকার ত্রিভূজের (Spherical triangle) সঙ্গে কোণের শিঞ্জিনী প্রভৃতির সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপন করে ত্রিকোণমিতিকে এই বৈজ্ঞানিক পথে পরিচালনা করবার প্রথম সম্মান আবুল ওয়াফারই প্রাপ্য। তিনি এইদিকে বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞা, ইত্যাদির নূতন ব্যাখ্যা দেন। শিঞ্জিনীর তালিকা (Sine Table) প্রস্তুত করবার এক

নূতন উপায় উদ্ভাবনা করাও তাঁর অন্যতম কীর্তি। তিনি ৩০° ডিগ্রি কোণের শিঞ্জিনীর মূল্য দশমিক ভগ্নাংশের অষ্টম স্থান (8th Decimal place) পর্যন্ত নির্ণয় করেন। এ ছাড়া প্রত্যেক দশ ডিগ্রীর শিঞ্জিনী, এবং স্পর্শজ্যার মূল্য নিরূপণ করে এক তালিকাও প্রস্তুত করেন। আলবাত্তানী স্পর্শজ্যার সঙ্গে শিঞ্জিনী ও প্রতিশিঞ্জিনীর সম্বন্ধ নির্ণয় করেছিলেন; তার বেশী কিছু করে যেতে পারেন নাই। সে ভার পড়ে তাঁর উত্তরাধিকারী আবুল ওয়াফার উপর। দুই কোণের সমষ্টির শিঞ্জিনী, কোণের অর্ধাংশের শিঞ্জিনীর বর্গের সঙ্গে প্রতিশিঞ্জিনীর সম্বন্ধ, কোণের শিঞ্জিনীর সঙ্গে সেই কোণের অর্ধেকের শিঞ্জিনীর ও প্রতিশিঞ্জিনীর সম্বন্ধ, তিনিই প্রথম ত্রিকোণমিতিতে প্রবর্তন করেন। বর্তমানে প্রচলিত সংজ্ঞা দিলে এগুলি দাঁড়াবে :—

$$\text{Sin}\,(a+b) = \text{Sin}\,a\,\text{Cos}\,b + \text{Cos}\,a\,\text{Sin}\,b.$$

$$2\,\text{Sin}^2\,\alpha/2 = 1 - \text{Cos}\,\alpha.$$

$$\text{Sin}\,\alpha = 2\,\text{Sin}\,\alpha/2\,\text{Cos}\,\alpha/2.$$

স্পর্শজ্যা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছিলেন। ত্রিকোণমিতিতে প্রচলিত ছয়টি সংজ্ঞার ভিতরকার পরস্পরের মধ্যে যে সাধারণ সম্বন্ধ বিরাজমান, আবুলওয়াফাই সেটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রচলন করেন। বর্তমানে প্রচলিত নানা ফরমুলা এই সাধারণ সম্বন্ধের উপর নির্ভর করেই প্রবর্তিত হয়েছে।

ত্রিকোণমিতিতে পূর্বপ্রচলিত সমকোণী ত্রিভূজের জায়গায়

মণ্ডলাকার ত্রিভূজের ব্যবহার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মেনিলসের প্রতিপাদ্যের (Menelaus's proposition) সাহায্যে Rule of four magnitude বা বাহুর শিঞ্জিনীর সঙ্গে কোণের শিঞ্জিনীর সম্বন্ধ এবং tangent theorem-এর প্রচলন, আবুলওয়াফার অসামান্য বিজ্ঞান প্রতিভারই পরিচয় দেয়। Rule of four magnitude অনুযায়ী বাহুর সঙ্গে কোণের সম্বন্ধ আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে লেখা যাবে Sin a : Sin c = Sin A : Sin C এবং tangent theorem অনুসারে কোণ ও বাহুর স্পর্শজ্যা ও শিঞ্জিনীর মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, সে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়াবে tan a : tan A = Sin b : Sin B। এইগুলি থেকেই আবুলওয়াফা বাহুগুলির প্রতিশিঞ্জিনী বা Cosine-এর মধ্যেকার পরস্পর সম্বন্ধগুলি স্থির করে কয়েকটি ফরমুলার প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে একটি হোল Cos C = Cos a Cos b. স্থূলকোণী মণ্ডলাকার ত্রিভূজের বাহুর এবং কোণের শিঞ্জিনীর সম্বন্ধও আবুলওয়াফাই সর্বপ্রথম স্থাপন করেন।

কোন স্থান থেকে মক্কা শরীফের (কিবলা) অবস্থান সঠিক ভাবে নির্ণয় করবার আগ্রহ অতি স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদিগকে বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম স্তর থেকেই পেয়ে বসে। প্রায় প্রত্যেক 'জিজে' এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। যে স্থান থেকে কিবলার দিক নির্ণয় করবার কথা উঠত, সে স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সঙ্গে মক্কা শরীফের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার পার্থক্য খুব বেশী না হোলে, সূক্ষ্ম

গণনার মধ্যে না যেয়ে মোটামুটিভাবে গণনা করা হোত। অবশ্য সাধারণ কাজ এতেই বেশ চলে যেত। বৈজ্ঞানিক আলবাত্তানী, ইবনে ইউনুসও অনেক সময়ে এ পন্থার অনুসরণ করেছেন। উপায়টি বেশ সরল। একটি বৃত্ত অঙ্কন করে নিয়ে দক্ষিণ এবং উত্তর দিক থেকে স্থানটির দ্রাঘিমার সঙ্গে মক্কা শরীফের দ্রাঘিমার পার্থক্য নিয়ে দুইটি সমান চাপ কেটে নেওয়া হয়। বৃত্তের উপরিস্থ এই দুই ছেদ বিন্দু যোগ করে দেওয়া হয়। অক্ষরেখার বেলায়ও তেমনি পূর্ব পশ্চিম থেকে স্থানটির অক্ষরেখার সঙ্গে মক্কা শরীফের অক্ষরেখার পার্থক্য নিয়ে দুইটি সমান চাপ কেটে নেওয়া হয়। বৃত্তের উপরিস্থ এই দুই ছেদ বিন্দুকে যোগ করে দিলে যে রেখাটি পাওয়া যাবে সেটি পূর্বের রেখাকে যে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে। এই শেষোক্ত বিন্দুকে বৃত্তের কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ করে দিলে যে রেখা পাওয়া যাবে সেই রেখাটিই মক্কা শরীফের অবস্থান নির্দেশ করবে।

আলনাইরেজী সর্বপ্রথম এই মোটামুটি গণনায় ক্ষান্ত না হয়ে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকভাবে সূক্ষ্ম গণনা করবার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর গণনা সঠিক হয় নাই। আবুলওয়াফাই তাঁর আলমাজিস্তিতে বিশুদ্ধ গণিতিক হিসাব দেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতি তাঁর অভূতপূর্ব প্রতিভার দানে সমুজ্জল। অঙ্কশাস্ত্রের এই দুই বিভাগই আবুলওয়াফার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তবে অন্যান্য বিভাগেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। জ্যামিতিতে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় নানা

উপপাদ্য ও সম্পাদ্যের সমাধানে। ইউক্লিডের জ্যামিতির একখানি ভাষ্যও তিনি প্রণয়ন করেন। জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার মধ্যে কোন এক বর্গের সমান করে অন্য একটি বর্গ অঙ্কন, সমবাহু বহুভূজ অঙ্কনের নিয়মপদ্ধতি, বৃত্ত মধ্যে অঙ্কিত সমবাহু ত্রিভূজের বাহুর অর্ধেকের সমান বাহুবিশিষ্ট সমবাহু সপ্তভূজ নির্মাণ, $x^4 = a$, $x^4 + ax^3 = 6$ প্রভৃতি সমস্যার জ্যামিতিক সমাধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জ্যামিতিক অঙ্কন প্রণালীগুলি আজও উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হয়। এতে ভারতীয় পন্থা কতকটা অনুসৃত হয়েছে তবে একটি বিষয় খুবই বিস্ময়কর—তিনি কুত্রাপি ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করেন নাই।

মুসলিম বিজ্ঞান জগতে অঙ্কশাস্ত্রের কোন শাখায়ই অবিমিশ্র ভাবে আলোচনা করবার আগ্রহ কোনদিনই দেখা যায় নাই। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ সবগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রেখেই আলোচনা করেছেন। তাই ভারতীয় এবং গ্রীক পণ্ডিতগণের অনুসরণকারী হয়েও জ্যামিতির তথাকথিত বিশুদ্ধতার প্রতি মনোযোগ দেবার অবসর তাঁদের কারুরই হয়ে উঠে নাই। তাঁদের এই সাধারণ ধর্মের ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রথম বনিমুসা ভ্রাতৃত্রয়ের জ্যামিতি আলোচনায়, দ্বিতীয়বার আবুলওয়াফার জ্যামিতি আলোচনায়। বনিমুসা ভ্রাতৃত্রয়ের মত আবুলওয়াফাও অবিমিশ্রিত জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে

তাঁর স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থখানির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তাঁর ছাত্র কর্তৃক এর একখানা পারসী অনুবাদই মূল গ্রন্থখানির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে জ্যামিতিক অঙ্কনের সর্বপ্রথম মূলমন্ত্র থেকে আরম্ভ করে পরিলিখিত গোলকের উপর বহুতলকের কৌণিক অঙ্কন (Construction of the corners of a polyhedron on the circumscribed sphere) প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান প্রতিভা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এর মধ্যেকার জ্যামিতিক অঙ্কনের সরলতায়। কম্পাসের সামান্য একটি অঙ্কনের সাহায্যেই বহু জ্যামিতিক সমস্যা সমূহের সম্পাদনাই এর বিশেষত্ব। এমনি সহজভাবে জটিল বিষয়ের আলোচনা করবার এরূপ উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়।

Conics Section এও অধিবৃত্তের (Parabola) অঙ্কন, বর্গক্ষেত্র স্থিরীকরন এবং ঘনফল নির্ণয় সম্বন্ধে আবুলওয়াফার আলোচনা অনেক উন্নত ধরণের।

বীজগণিতের মধ্যে ডাওফেন্ট (Diophantus)-এর অনুবাদ আবুলওয়াফার এক প্রামাণ্য কীর্তি। এই অনুবাদ ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা সমীকরণ সম্বন্ধেও তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। অঙ্কশাস্ত্রবিদদের জীবনী সংগ্রহকারক আবুল ফারদাসের "কিতাবুল ফিহরী"তে আবুল ওয়াফার তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রার সমীকরণের উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আবুল ওয়াফা কৃত অনেক সমীকরণের

বিষয়েই ঐ পুস্তকখানিতে 'উল্লিখিত হয়েছে; তন্মধ্যে একটির বর্তমান রূপ হবে $x^4+px^3=q$ এই সমীকরণের সমাধান হয়েছে Conics Section এর সাহায্যে। $x^2-y=o$ সমীকরণের Parabola এবং $y^2+axy+b=o$ সমীকরণের Hyperbola, এই সমাধানে ব্যবহৃত হয়েছে। দুঃখের বিষয় আবুল ওয়াফার বীজগণিত বিষয়ক পুস্তকখানিরও কোন সন্ধানই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আবুল ফারদাসের ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ ছাড়া অন্য কোথাও কোন প্রামাণ্য কিছু পাওয়া যায় না।

পূর্বের বর্ণনা থেকেই বুঝা যাবে যে আবুল ওয়াফা নানা বিষয়ে বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অন্যান্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তাঁর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁর বহু গ্রন্থের কোন সন্ধানই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এ পর্যন্ত মাত্র নিম্নোল্লিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে (১) অঙ্কের পুস্তক, "কিতাব ফি মাইয়াহতাজু এলায়হে আল কুত্তাব ওয়াল ওম্মালমিন ইলম আল হিসাব" (লেখক এবং ব্যবসায়ীদের উপযোগী পুস্তক) (২) "আল কিতাব আল কামিল" (সম্পূর্ণ পুস্তক) সম্ভবত ইবনে আল কিফতী এই গ্রন্থখানিকেই আলমাজেষ্ট নামে উল্লেখ করেছেন। এর কতক অংশ ক্যারা ডু ভো কর্তৃক অনুদিত হয়েছে (৩) "কিতাবুল হান্দাসা" (ব্যবহারিক জ্যামিতি) প্যারি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুস্তকাবলীর মধ্যে একখানা পারসী জ্যামিতিক অঙ্কন বিষয়ক পুস্তক দেখা যায়। খুব সম্ভব পুস্তকখানি

কিতাবুল হান্দাসারাই অনুকরণ। উপেকের (Wœpke) মতে আসল পুস্তক খানাও আবুল ওয়াফার লিখিত নয় বরং তাঁর কোন ছাত্র তাঁর জ্যামিতি বিষয়ক বিভিন্ন বক্তৃতার সারাংশ লিপিবদ্ধ করে এখানা প্রণয়ন করেন। ব্রিটিশ, ফ্রান্স এবং ফ্লোরেন্স মিউজিয়মে একই প্রকার একখানা "জিজ-আল-সামিল" রক্ষিত আছে। এর প্রণয়ন কর্তার কোন নাম পাওয়া যায় না। অনেকের মতে এইখানাই আবুল ওয়াফার "জিজ আল সামিল"। কেউ কেউ বলেন, এখানা তাঁর জিজ থেকে সঙ্কলিত মাত্র। তাঁর আসল জিজ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলকের নাম হোল "আল ওয়াজিহ"। এ পর্যন্ত এ খানার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। প্রথম পুস্তকখানির "কিতাব আল মানাজিল ফিল হিসাব" (অঙ্কের ক্রমিক স্তরের পুস্তক) এর সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়।

আবুল ওয়াফার সমসাময়িক অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান প্রতিভা অনেকটা নিষ্প্রভ মনে হয়। যুগ প্রবর্তক মনীষীর সময়ে সাধারনত তাঁর প্রভাবই বিশেষ কার্যকরী হয়ে উঠে। বিশেষ শক্তিশালী প্রতিভাবান ব্যক্তি ছাড়া, অন্য কেউ সে প্রভাব উল্লঙ্ঘন করে নিজের স্বাতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। দশম শতাব্দীতে আলবাত্তানী এবং আবুল ওয়াফার প্রভাবই পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। বিজ্ঞান জগতে বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রে তাঁদের প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মতই ভাস্বর ও সমুজ্জল। অন্যান্য যাঁরা এ সময়ে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা এই দুই মনীষীরই

পদানুসরন করেন প্রায় সর্ব বিষয়েই, নিজেদের স্বাতন্ত্র বা মৌলিকতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই প্রদর্শন করতে পারেন নাই। প্রায় সবাই ত্রিকোণমিতি বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজড়িত। বস্তুত দশম শতাব্দীকে ত্রিকোণমিতির যুগও বলা চলে। এ শতাব্দীতে ত্রিকোণমিতির যত উন্নতি হয়েছিল অঙ্কশাস্ত্রের অন্য বিভাগে তার তুলনায় কিছুই হয় নাই। কেউ কেউ স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই বলেই মনে হয়।

এই যুগ প্রভাব এড়িয়ে চলা অভিযানকারীদের মধ্যে আবুজাফর আলখাজিনের নামই প্রথম উল্লেখ যোগ্য। তাঁর অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনার মধ্যে বীজগণিতকেই তিনি একটু প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আত্মনিবেশ করেন। তবে তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে নূতন আবিষ্কারের কিছুই নাই। বীজগণিতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য

আল খাজিন

হোল ত্রৈমাত্রিক সমীকরণ বা আলমাহানীর সমীকরণটির (Al Mahanis equation) সমাধান। এই সমাধানে তিনি Conics section যেমন ভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁর মৌলিকতা এবং উভয় শাখাতেই বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তিনিও যে যুগ প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারেন নাই তার নিদর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তৎপ্রণীত গ্রন্থ। জ্যামিতি আলোচনায়ও তিনি যোগ্য

দান করেছিলেন এবং ইউক্লিডের দশম গ্রন্থের একখানা ভাষ্যও লেখেন। অঙ্কের অন্যান্য শাখারও নানাবিধ গ্রন্থাবলীর ভাষ্য লেখাও তাঁর বৈজ্ঞানিক কীর্তি।

আবু জাফরের নাম দেখে মনে হয় তিনি কোন লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ছিলেন এবং এই লাইব্রেরী পরিচালনার মধ্যে অবসর সময়ে বিজ্ঞান আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর উপাধি আলখাজিনই এই পদসূচক কার্যের সন্ধান দেয়। খাজিন অর্থ লাইব্রেরীয়ান বা ধন রক্ষক। তিনি খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৭১ খৃঃ অব্দে (সঠিক তারিখ জানা যায় না, কারুর মতে ৯৬১ হইতে ৯৭১ খৃঃ অব্দের মধ্যে) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে তেমন সুপরিচিত না হোলেও যাঁরা এই বিজ্ঞান তাল গড়তে তিল তিল করে সাহায্য করেছেন তাঁদের কথা ভুললে চলবে না। যাঁরা নানা কারণে এখনও পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নাই তাঁদের সবাই যে প্রতিভায় একেবারে নিষ্প্রভ ছিলেন এমন মনে করবার কোন কারণই নাই। তবুও যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন এই স্বল্প পরিচয়ের মধ্যেই তাঁদের স্মরণ করা উচিত। দশম শতাব্দীতেও এমন বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই। তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, এমন কি অনেকের জন্ম মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয় নাই। এখানে এমনি স্বল্পপরিচিত কয়েকজন গণিতবিদের উল্লেখ করা যাবে।

ধর্মযাজকদের মধ্যে যে আজকালকার মত বিজ্ঞানের প্রতি এক অহেতুক ঔদাসীন্য বা বিতৃষ্ণা ছিল না তার পরিচয় পাওয়া যায় ইউসুফ আল খুরীর বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীতে। ইংরেজীতে তিনি Joseph the Priest নামে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি ইউসুফ আল কোয়াস বা আল সাহির নামেও অনেক সময় অভিহিত হোতেন। আল কোয়াস অর্থ ও ধর্মযাজক। ইউসুফের বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী প্রধানত শুদ্ধ অনুবাদেই নিবদ্ধ। তিনি আর্কিমেডিসের অধুনাবিলুপ্ত ত্রিভূজ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং গ্যালেনের De simplicum temperamentis et facultatibus এর অনুবাদ করেন। প্রথম অনুবাদখানি সিনান এবনে ছাবেত এবনে কোরা কর্তৃক এবং দ্বিতীয়খানি হোনায়েন এবনে ইসহাক কর্তৃক পুনর্বার সংস্কৃত হয়। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় অন্য কয়েকখানি পুস্তকেরও তিনি অনুবাদ করেন। খুব সম্ভব দশম শতাব্দীর প্রথম দশকেই ইউসুফের মৃত্যু হয়।

ইউসুফ আলখুরী

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য যাঁরা এই সময়ে বিজ্ঞান জগতে খ্যাতি লাভ করেন হামিদ এবনে আলি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবুল রবিব হামিদ এবনে আলি আল ওয়াসিতি। নিম্ন মেসোপটেমিয়ার ওয়াসিতিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই হিসাবেই আল ওয়াসিতি নামেও পরিচিত। এবনে ইউনুসের মতে আলি এবনে ইসা এবং হামিদ এবনে আলি

হামিদ এবনে আলি

এই দুই জনে আস্তারলব ইত্যাদি নির্মাণ কার্যে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন। তিনি এই দুইজনকে গ্যালেন এবং টলেমির সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন। এতেই বোঝা যায় এঁদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কার্য কুশলতা খুবই উন্নত ধরণের ছিল। হামিদ এবনে আলির কার্যাবলী নবম শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পারস্য দেশবাসী আবুবকর তাঁর সমসাময়িককালে বিজ্ঞান জগতে প্রসিদ্ধি লাভ না করলেও মধ্যযুগে তাঁর সমাদর দেখা যায়। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবুবকর আলাহাসান ইবন আল খাসিব। লাটিনে এ নামের বিকৃতি ঘটে আলবুবাথেরে (Albubather); আবুবকর আরবী এবং পারসী উভয় ভাষাতেই জ্যোতিষ সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিজ্ঞান হিসাবে এগুলির বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে হয় না। তবে একখানি পুস্তক ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে "De Nativitatibus" নামে লাটিনে অনুদিত হয় এবং ইউরোপে খুবই সমাদর লাভ করে; পুস্তকখানি পরে হিব্রুতেও অনুদিত হয়।

আল খাসিব

দশম শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই অসামান্য প্রভাবের সময়ে তার আভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটিগুলিকে একত্রিত করার ভার নেন ইবনে আল আদামি। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ ইবনে আল হোসায়েন ইবনে হামিদ। তিনি

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঔপপত্তিক উপক্রমণিকাও লিখে যান কিন্তু নিজে এগুলো প্রকাশ করতে পারেন নাই। মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত কার্যাবলী সমাপ্ত হবার পূর্বেই তাঁকে ইহলোক হতে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছাত্র আল কাসিম এবনে মোহম্মদ এবনে হিশাম আল মাদানী পুস্তকখানাকে "নজমুল ইকদ" (পরিসজ্জিত মুক্তাহার) নাম দিয়ে ৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

ইবনে আল আদামি

পিতা পুত্র এবং দাস তিনজন একসঙ্গে একত্রে বসে বিজ্ঞান আলোচনা করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অন্তত নিজের দাসকে সমপর্যায়ভুক্ত করে, সমান আসনে বসিয়ে তার সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ে নিজেদের ধারণা প্রেরণার আদান প্রদান, অন্য কোথাও দেখা গিয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রথম দেখা যায় দশম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক এবনে আমাজুরের জীবনে। এবনে আমাজুর মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলেই মনে হয়। তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সবিস্তারিতভাবে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবদান যে অনেক উন্নত ধরণেরই ছিল তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের কার্যের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখেই। পরবর্তী

এবনে আমাজুর

বৈজ্ঞানিকগণের অনেকেই তাঁর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ফলের দোহাই দিয়েছেন। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবনে ইউনুস তাঁর পুস্তকে এবনে আমাজুরের নির্ণীত তথ্যাদির অনেক উল্লেখ করেছেন।

এবনে আমাজুরের পূর্ণ নাম হোল আবুল কাসেম এবনে আমাজুর আলতুর্কী। তিনি তুর্কীস্থানের ফারগানা প্রদেশে খুব সম্ভব ৮৫৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে বিজ্ঞানের দিকে তিনি তেমন কোন মনোযোগ দেন নাই; কিন্তু পরিণত বয়সে এদিকে তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তখন থেকেই বিজ্ঞান আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। শুধু নিজে বিজ্ঞান আলোচনাতেই ক্ষান্ত হন নাই পুত্র আবুল হাসান আলি বয়ঃপ্রাপ্ত হোলে তাকেও এই পথে টেনে আনেন। পুত্রের ক্রীতদাস মুফলিহ তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্যে প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। প্রভু তার গুণ, বুদ্ধি ও ধীশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেদের সহকারী হিসাবে বিজ্ঞান আলোচনায় নিযুক্ত করেন। এবনে আমাজুর ও পুত্র আবুল হাসান আলি একত্রে বানু আমাজুর নামে পরিচিত। তাঁহাদের প্রণীত অনেকগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়; তন্মধ্যে “আলখালিস” (বিশুদ্ধ), “আলমুজান্নর” (পরিবেষ্টিত), “আলবদি” (আশ্চর্যজনক) এবং মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধীয় ফলকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলোতে পারসীক কাল গণনার নিয়ম ব্যবহৃত হয়েছে।

বিজ্ঞান গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করে যে সমস্ত মনীষী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন আবু ওসমান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁর পূর্ণ নাম হোল আবু ওসমান সৈয়দ এবনে ইয়াকুব আল দামিস্কি। খলিফা আলমুকতাদিরের (৯০৮-৯৩২) রাজত্ব কালেই আবু ওসমানের পূর্ণ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তিনি ব্যবসায়ে ছিলেন চিকিৎসক। চিকিৎসা শাস্ত্রেও যে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল সে বুঝা যায় তাঁর মক্কা ও মদিনার হাঁসপাতাল সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়াতেই। অঙ্ক শাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এরিষ্টটল, ইউক্লিড, গ্যালেন প্রভৃতির গ্রন্থগুলির আরবী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলির মধ্যে প্যাপাসের (Pappus) ভাষ্য সমেত ইউক্লিডের দশম গ্রন্থখানির অনুবাদই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আরবী অনুবাদই এই গ্রন্থখানির অস্তিত্বের একমাত্র পরিচায়ক।

আবু ওসমান

আলকিন্দির শিষ্যদের মধ্যে বিজ্ঞানসেবী হিসাবে যে কয়েক জনের নাম পাওয়া যায় আবু জাইদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু জাইদ আহম্মদ এবনে সহল আলবালখি। তাঁর জন্ম তারিখ এখনও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় নাই। তবে তিনি ৯৩৪ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ফিহরিস্তে আবু জাইদের বহু গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়; তন্মধ্যে দুই খানির ইংরেজী অনুবাদ হোল "The excellency of Mathematics" এবং "On certitude of astrology"। তাঁর আবহাওয়া সম্বন্ধীয় অন্য একখানি

আবু জাইদ

পুস্তক "সুয়ার আল আকালিম" ভৌগলিক ম্যাপ ইত্যাদি দিয়ে পরিপূর্ণ।

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের কাজ নিয়ে আলোচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন আলি এবনে আহম্মদ আল ইমরানি। ইনি দশম শতাব্দীর মিসরের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবু কামিলের বীজগণিতের একখানা ভাষ্য লিখে বিজ্ঞানবিদদের মধ্যে স্থান লাভ করেন। বীজগণিতের এই ভাষ্য ছাড়া তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়েও আলোচনা করেন।

আল ইমরানি

এই জ্যোতিষী গবেষণার ফলপ্রসূত কতকগুলি পুস্তকের একখানি দ্বাদশ শতাব্দীতে বার্সিলোনার সাভাসোর্ডা (Savasorda) কর্তৃক 'On the choosing of auspicious days' বা "শুভ দিবস নির্ণন বিষয়ক পুস্তক" নামে অনুদিত হয়। আলি এবনে আহম্মদ উত্তর মেসোপটেমিয়ার মসুল নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই ৯৫৫-৫৬ খৃঃ অব্দে এন্তেকাল করেন। তার জন্ম তারিখ এখনও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই।

ইউসুফ আলখুরীর মত অন্য আর একজন ধর্মযাজকেরও এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান আলোচনায় লিপ্ত দেখা যায়, এঁর নাম নাজিফ এবনে ইয়ামন আলকাস। কতকগুলি অনুবাদ কার্যের সঙ্গেই এঁর নাম বিজড়িত। নাজিফ ৯৯০ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নাজিফ এবনে ইয়ামন

পারস্যবাসী যে কয়েকজন মনীষী এই সময়ে বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করেছিলেন আবুল ফতেহ মোহাম্মদ এবনে

মোহাম্মদ এবনে কাসিম এবনে ফজল আল ইস্পাহানি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইস্পাহানের এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর মধ্যে এপোলোনিয়াসের Conics এর আরবী অনুবাদ এবং আলহিমসী ও ছাবেত এবনে কোরার পুস্তকগুলির ভাষ্য উল্লেখযোগ্য। Conics এর আরবী অনুবাদখানিই হয়েছে সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সর্বদোষ বর্জিত। তাঁর ভাষ্যগুলি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

আবুল ফতেহ

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলরাজির স্বদেশবাসী অন্য একজন বৈজ্ঞানিকও এই সময়ে অঙ্কশাস্ত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও পদার্থবিদ্যায় বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর নাম হোল আবুল হোসায়েন আবদুর রহমান এবনে ওমর আল সুফী আল রাজী। আবুল হোসায়েন ৯০৩ খৃঃ অব্দে রাই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই ৯৮৬ খৃঃ অব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তিনি ছিলেন বুয়াইদ নৃপতি আজদুদ্দৌলার একাধারে বন্ধু এবং শিক্ষক। মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মধ্যে তাঁর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্থির নক্ষত্রাদির বিষয়ে নানা সমস্যানিবদ্ধ গ্রন্থের জন্যই। এ গ্রন্থখানার নাম হোল "কিতাব আল কাওয়াকিব আল ছাবিতা আল মুছাওওয়ার" বা স্থির নক্ষত্রাদির বিষয়ক পুস্তক। কেউ কেউ বলেন মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণমূলক কার্যাবলী সন্নিবিষ্ট যে তিনখানি সর্বোৎকৃষ্ট (master piece) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এখানা

আবদুর রহমান সুফী

তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্য দুখানা হোল একাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক এবনে ইউনুস এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উলুগবেগ সম্পাদিত জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ। এ মতকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলা চলে না তবে এতে গ্রন্থখানির ঔৎকর্ষেরই পরিচয় দেয় কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানার বিশেষ আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না।

খলিফা আজদুদ্দৌলা নিজে ছিলেন বিজ্ঞানের সাধক। শুধু তাই নয় তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হোতে সমর্থ হন। খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আবুল কাসিম আলি এবনে হোসায়েন আল আলওয়াই আল শারিফুল হোসায়নি অন্যতম। অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানই ছিল তাঁর বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এতে তাঁর পর্যবেক্ষণগুলির বৈজ্ঞানিক সততা তৎকালে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তিনি একখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলকও তৈরী করেন। গত দুই শতাব্দীতে এর বিশেষ সমাদর দেখা যায়। আবুল কাসিম ৯৮৫ খৃঃ অব্দে বাগদাদ নগরীতে দেহ ত্যাগ করেন।

আবুল কাসিম

খলিফার মানমন্দিরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান সাধনায় লিপ্ত ছিলেন আল সাগানি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু হামিদ আহম্মদ এবনে মোহাম্মদ আল সাগানি আল আসতারলবি। অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে উপপত্তিক

বহুবিধ দানের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও নির্মান, বিজ্ঞান জগতে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।

আল সাগানি

বস্তুত নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও নির্মানে তাঁর ছিল অসাধারণ কৃতিত্ব। তিনি মারভ নগরীর নিকটবর্তী সাগানিতে একটি আস্তারলব প্রতিষ্ঠা করেন এবং খলিফার মানমন্দিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হোত তার অনেকগুলি আবিষ্কার ও নির্মান করেন। উপপত্তিক বিষয় সমূহের মধ্যে কোণকে সমত্রিখণ্ডিত করবার উপায় উদ্ভাবনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ৯৯০ খৃঃ অব্দে এই বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয়।

বৈজ্ঞানিক আলইমরানের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য আল কোয়াবিসি বা আবুল সাকর আবদুল আজিজ এবনে ওছমান এবনে আলি আল কোয়াবিসি তাঁর জ্ঞান সাধনার পথ অনুসরণ করেন। লাটিনে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে আল ক্যাবিশাস (Al Cabitias)। আল ইমরানের মৃত্যুর পর হামদানীয় খলিফা সুলতান সৈয়ফুদ্দোলার পৃষ্ঠ পোষকতাতেই এই বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সাধনার পথ সুগম হয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্য ছিল জ্যোতিষ বিজ্ঞান (Astrology) নিয়ে এবং এদিক দিয়ে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করতেও সমর্থ হন। আল কোয়াবিসির

আল কোয়াবিসি

প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "আল মাদখাল ইলা সিনাত আহকাম আল নজুম" বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপক্রমনিকা এবং গ্রহ সমূহের সমসূত্রে অবস্থান বিষয়ক

(Treatise on the conjunction of the planets) গ্রন্থ দুই খানিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জোহানেস এই দুই খানিই লাটিনে অনুবাদ করেন। আল কোয়াবিসি কিম্বা সৈয়ফুদ্দৌলা রামধনু সমন্ধে একটি সুন্দর কবিতা লেখেন।

নবম ও দশম শতাব্দী বাগদাদের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে বাগদাদ ছিল সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার কেন্দ্রস্থল। মুসলিম রাজ্যগুলি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও তখন বিজ্ঞানের নাম গন্ধ বলে কিছু ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচলনের মূলে ছিল তৎকালীন নরপতিদের বিদ্যোৎসাহিতা। গণতন্ত্রের অবসান ঘটলেও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যেও শিক্ষার প্রতি এরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। বহু রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে, বহু রক্তপাত হয়েছে, ঝড় ঝঞ্ঝাবাত বয়ে গেছে, কিন্তু বিদ্যোৎসাহিতার মধ্যে তিলমাত্র ঘুণ ধরে নাই। নরপতিদের সঙ্গে সুধী পণ্ডিত বৈজ্ঞানিকদের আন্তরিকতাও এই বিদ্যোৎসাহিতার মূলে ইন্ধন যুগিয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিকই খলিফাদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন শুধু তাঁদের জ্ঞানগরিমার জন্যেই। এই মধুর বন্ধুত্ব সম্বন্ধ ছাড়াও খলিফাদের বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদানও বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ অনেকগুণ বর্ধিত করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর রাসায়নিক খলিফা, নবম শতাব্দীর জ্যোতিষ বৈজ্ঞানিক, দশম শতাব্দীর অঙ্কশাস্ত্রবিদ খলিফা আজহুদ্দৌলা এবং খলিফা মুকতাফিবিল্লাহর পুত্র জাফর, শুধু রাজোচিত শৌর্যবীর্য মহত্বের অধিকারী হিসাবেই

পরিচিত নন, তাঁদের জ্ঞানগরিমা এবং বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যেও তাঁরা ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন।

খলিফা আজদুদ্দোলা ছিলেন বুয়াইদ আমির। বাগদাদের তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁর কাছে ছিল বিশেষ সমাদরের। বিখ্যাত পদার্থবিদ আবদুর রহমান সুফী ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই বন্ধুত্বের সুযোগে এবং বিজ্ঞানের প্রতি স্বীয় অন্তর্নিহিত অনুরাগের জন্য তিনি নিজেও বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করেন। বাগদাদের এই স্বর্ণযুগে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সুধিগণ এসে বাগদাদে সমবেত হোতেন, শুধু আমোদ প্রমোদের জন্যে নয় বরং রীতিমত বিজ্ঞান আলোচনার জন্যে। আজকালকার মত তখনও প্রত্যেক বৎসরেই স্থানে স্থানে এমনি সম্মিলনী বসত। নিজ মহিমায় উজ্জল বাগদাদ ছাড়া অন্য অনেক স্থানেও এমনি সম্মিলনীর খবর পাওয়া যায়। নিশাপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত আবুল মনসুর আবদুল মালিক আস্‌সালিবি খোরাসান নৃপতি সামানীয় বংশীয় মনসুর কর্তৃক আহুত এমনি এক বিদ্বান সভার বিষয় উল্লেখ করেছেন তাঁর "ইয়াতিমুদ্দহর" গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনা এখানে উধৃত করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"সামানীয় বংশীয়দের রাজত্বকালে বোখারা মহিমার কেন্দ্রস্থল, রাজ্যের মুকুটমণি, সেকালের সব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মিলন ক্ষেত্র, সাহিত্যতারকাদের চক্রবাল, এবং সেই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বানবর্গের সম্মিলনীস্থল হিসাবেই শোভা পাচ্ছিল। আবু জাফর মোহাম্মদ বিন মুসা আলমুসাবী আমার নিকট এমনি

বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা আবুল হাসান বুখারা নৃপতি মনস্থুর বিন আহম্মদের নিকট থেকে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পান, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এবং আহূত বিদ্বানমণ্ডলীতে যোগদানের জন্যে। সেইস্থানে আবুল হাসান আবু মোহাম্মদ বিন মাতরান, আবু জাফর বিন আল আব্বাস আল হাসান, আবু মোহাম্মদ বিন আবুচ্ছায়েব, আবু নসর আলহারছা ম, আবু নসর আল্ জারিফি, রেজা বিন আল্ ওয়ালিদ আল ইস্পাহানি, আলি বিন হারুন আসসায়বানি, আবু ইসহাক আল্ ফারসি, আবুল কাসিম আল্ দিনওয়ারী, আবু আলি আজজোয়ামী প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান এবং সাহিত্যিকগণ সমবেত হয়েছিলেন। বিদ্বানমণ্ডলীতে সভা আরম্ভ হওয়ার পরে যখন একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা, কৃষ্টি ও গবেষণার বিষয় আলোচনা করছিলেন, একে অন্যকে কথার সৌরভে, কৃষ্টির স্থবাসে বিমুগ্ধ করছিলেন, গবেষণালব্ধ মুক্তামালা একে অন্যকে উপহার দিচ্ছিলেন তখন যে কি অপূর্ব স্বর্গীয় শোভারই সৃষ্টি হয়েছিল সে মানস চক্ষে কল্পনা করা ছাড়া তুমি এমনি বুঝতে পারবে না। আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন—এইটি হচ্ছে জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিবস, লাল অক্ষরেই জীবনের খাতায় লিখিত থাকবে এটি। সর্বদাই মনে রেখ এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণের এই সম্মিলনী। আমার মৃত্যুর পরে তোমার জীবনের প্রত্যেক স্মরণীয় ও বরণীয় দিনে এই সম্মিলনীর কথাও স্মরণ করো।

আমার মনে হয় তুমি হয়ত তোমার জীবনে এমন সম্মিলনী বেশী দেখতে পাবে না। এমনি বিদ্বানবর্গের এবং প্রতিভা প্রদীপ্ত ব্যক্তিদের একত্র সম্মিলনই হয়ত আর বেশী ঘটে উঠবে না।”

আমির আজদুদ্দৌলার আগ্রহেও প্রত্যেক বৎসর এমনি সম্মিলনীর অধিষ্ঠান হোত। আমির প্রায়ই এই সম্মিলনীর সুধীবৃন্দকে নিজের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের সম্মান জনসাধারণের চোখে অনেকখানি বর্ধিত করে দিতেন। শুধু বৈজ্ঞানিকদের আদর আপ্যায়ন ও সম্বর্ধনাতেই এই আমিরের কাজ শেষ হয় নাই তিনি নিজেও বৈজ্ঞানিক আলোচনায়, অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত সাধারণ মানুষ হিসাবেই যোগদান করতেন। খলিফার পদোচিত অহঙ্কার বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান আলোচনার আগ্রহের চাপে আপনি নিষ্পেষিত ও পদদলিত হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত।

আজদুদ্দৌলা (আবু সুজা এবনে রুকনোদ্দৌলা) ৯৩৬ খৃঃ অব্দে ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৮৩ খৃঃ অব্দে বাগদাদে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি অতি সুকুমার বয়সে (১৩ বৎসর বয়সে) ৯৪৯ খৃঃ অব্দে ইরাক এবং দক্ষিণ পারস্যের আমিরের পদে অধিষ্ঠিত হন। আমির হিসাবে শৌর্য বীর্যের দিক দিয়ে তিনি যে অন্য কারুর চেয়ে কম ছিলেন না সে বোঝা যায় তাঁর বাগদাদ অধিকার থেকেই। তিনি ৯৭৫ খৃঃ অব্দে বাগদাদ অধিকার করেন এবং খলিফা আত্তাইবিল্লাহ কর্তৃক “মালিক আল মুলক” উপাধিতে ভূষিত হন। ইসলামের ইতিহাসে এর

পূর্বে আর কেউই এই উপাধি গ্রহণ করেন নাই। রাজোচিত শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের কল্যাণ সাধন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারে উৎসাহ দেওয়াও এই মহৎ নৃপতির কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিল। তিনি নিজেই যে বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করতেন সে আমরা পূর্বেই দেখেছি। প্রজাদের কল্যাণের নিমিত্ত নানা জনহিতকর কার্যের মধ্যে বাগদাদে বহু হাঁসপাতাল স্থাপন এবং সিরাজের নিকট দিয়ে প্রবাহিত নদী "বেন্দে আমিরে" একটি বাঁধ দিয়ে একে জলযান গমনোপযোগী করে তোলা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবেই তিনি বৈজ্ঞানিক মহলে স্থান পেয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোথাও বিজ্ঞান আলোচনায় নরপতিদের যোগদানের কথা জানা যায় না। পদোচিত ক্ষমতার অন্ধ অহঙ্কারই হয়ত এই অনাসক্তির কারণ; কিন্তু ইসলামের সাম্যমন্ত্র, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ভাব এই অহঙ্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে বিজ্ঞানকেও রাজশিক্ষার অন্তর্গত করে খলিফাদিগকে সাধারণ মানুষের মত বৈজ্ঞানিক সাজাতে সক্ষম হয়েছিল; কল্পিত দেবত্ব খলিফাদিগকে দূরে সরিয়ে রাখতে আপনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

আজদুদ্দৌলার ন্যায় খলিফা মুতাজিদবিল্লাহর পুত্র খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ (আবুল ফজর জাফর) ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় রীতিমত ভাবে যোগদান করতেন। শুধু সম্মিলনীতে যোগদানেই তাঁর বিজ্ঞান অনুরাগের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই;

অন্য বৈজ্ঞানিকের মত তিনি নিজে যথারীতি ভাবে গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানই তাঁকে আকর্ষণ করে বিশেষ ভাবে। মানমন্দিরেই তাঁর অনেক সময় কাটত গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণে। ধূমকেতুর কালাপাহাড়ী তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা একটি সামঞ্জস্য ভাব লক্ষ্য করেন। এখন অবশ্য সেটি সুপ্রতিষ্ঠিত। জাফরও এই সামঞ্জস্যের বিষয় লক্ষ্য করেন। তিনি ধূমকেতুর বিষয়ে কয়েকখানা পুস্তকও প্রণয়ন করেন।

আবুল ফজর জাফর

পিতার নানা গুণ পুত্রতেও বর্তে থাকে। আমির আজদুদ্দৌলা এবং তাঁর পুত্র শরফউদ্দৌলার বেলায় ও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। পিতার বিদ্যোৎসাহিতা, বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ পূর্ণমাত্রায়ই পুত্রের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। শরফউদ্দৌলা ৯৮২ খৃঃ অব্দে আমির-ওল-ওমরার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলিফা আত্তাই বিল্লাহ কর্তৃক "শাহান শাহ" উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার কথা এইটুকু বললেই চলবে যে তিনি বাগদাদের রাজপ্রাসাদের উদ্যানে একটি মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মান মন্দিরে গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করা হোত। এর অধ্যক্ষ ছিলেন প্রসিদ্ধ গণিতবিদ আলকুহী। আমির শরফউদ্দৌলাও এই পর্যবেক্ষণে রীতিমত ভাবে যোগদান করতেন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে। অন্যান্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক এই মানমন্দিরে কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে আবু হামিদ আহম্মদ এবনে মোহাম্মদ আল সাগানি আল আস্তারলবি,

আবু ইসহাক ইব্রাহিম এবনে হিলাল, আবুল ওয়াফা, আবুল হাসান মোহাম্মদ আল সামিরি, আবুল হাসান আল মাগরিবি প্রধান। শরফউদ্দৌলা ৯৮৯ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আজদুদ্দৌলা ও জাফরের মত অনেক খলিফাই বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করেছিলেন, কিন্তু শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

বাগদাদের আশে পাশে বা অন্য কোন রাজধানীর আশে পাশে থেকে যাঁরা খলিফাদের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের প্রগাঢ় জ্ঞান ও বিজ্ঞান আলোচনার আন্তরিকতার উপর কিছুমাত্র কটাক্ষ না করেও বলা চলে যে এই আন্তরিকতার মূলে খলিফাদের উৎসাহও অনেকটা কাজ করেছিল; আর্থিক ঝঞ্ঝাট থেকে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই তাঁরা এদিকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এমনি বাইরের কোন উৎসাহ না পেয়েও যাঁরা এ পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের এই আন্তরিকতার মূলে শুধু যে জ্ঞানস্পৃহাই বর্তমান ছিল সে কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে। এমনি নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু জ্ঞানের জন্যেই বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করেন আলহামদানি।

তিনি যে বাগদাদ হোতে অতি দূরে থেকে খলিফার কোন আর্থিক সাহায্য না পেয়েই এমনি কাজ করেছিলেন শুধু তাই নয়, সামাজিক সম্মান বা প্রতিপত্তি হিসাবেও তাঁর অবস্থা কিছুমাত্র লোভনীয় নয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে এবং তাঁর

পূর্বপুরুষগণকে যে ব্যবসায় অবলম্বন করতে হয়েছিল তাকে বিশেষ সম্মানজনক বলা চলে না। তিনি ব্যবসায়ে ছিলেন তন্তুবায়, দেশের চক্ষে যার স্থান অতি নীচে। সত্যিকার জ্ঞানস্পৃহা যার মধ্যে থাকে তাকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারে না। আলহামদানিও সমস্ত বাধা বিপত্তি ছিন্ন করে এপথে অগ্রসর হোতে সক্ষম হন।

আলহামদানির পূর্ণ নাম হোল আবু মোহাম্মদ আল হাসান এবনে আহম্মদ এবনে ইয়াকুব আলহামদানি এবনে আলহাইক। আলহাইক হোল তাঁর ব্যবসায়ের পরিচয়, অর্থ তন্তুবায়। তিনি অনেক সময় শুধু আলহাইক নামেও অভিহিত হোতেন। ইমেনের এক দরিদ্র তন্তুবায়ের গৃহে তাঁর জন্ম হয়। জন্ম তারিখের সঠিক সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

আল হামদানি

এমনিতেও তাঁর জীবন কেমনভাবে কেটেছিল সে কথাও ভাল ভাবে জানা যায় না। তবে মনে হয় খুব বেশী সুখে নয়। জীবনের শেষ পর্যন্তও তিনি রাজরোষের হাত থেকে রেহাই পান নাই। কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। জ্ঞানসেবী বৃদ্ধের উপর এই রাজরোষের কারণ অজ্ঞাত, তবে এর ক্ষমতা শেষ পর্যন্তও অপ্রতিহতই থেকে যায়।

আলহামদানি জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রত্নবিদ্যা (archæology) এবং ভূগোল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমেন প্রদেশের জন্য একখানা জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলক তৈরী করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্রে এই ফলক ছাড়া তাঁর অন্য কোন দান

আছে কি না জানা যায় না। তবে নিজ প্রদেশের অন্যান্য নানা বিষয়েও তিনি অনুসন্ধান করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে একত্রিত করে "আলইখিল" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে পূর্বেকার আরবদের বিজ্ঞান আলোচনা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, সৃষ্টি বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ধারণার কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। একটি হোল ব্যস্ত সমস্ত কাজের, অন্য একটি হোল ধীরস্থির সামঞ্জস্য সাধনের। দশম শতাব্দীতেও এমনি হয়েছে। একদিকে কাজ চলেছে তোড় জোড়ের সহিত অতি দ্রুত গতিতে, বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে কুইক মার্চ করে, অন্যদিকে চলেছে তারই সামঞ্জস্য করে নেবার সাধনা; সবগুলোকে একসঙ্গে গুছিয়ে নিয়ে সর্ব সাধারণের সামনে তার অতি আধুনিক মূর্তিখানিকে তুলে ধরা। এই শেষোক্ত কাজের ভার যাঁরা নেন তাঁরাও যে অতিকুশলী মৌলিক প্রতিভার অধিকারী বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে কম নন সে কথা বলাই বাহুল্য। দশম শতাব্দীতেও এমনি কতকগুলো লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের কেউ কেউ কাজ করেছেন সম্পূর্ণ একাকী অন্য কারুর সাহায্য না নিয়েই, আর কেউ কেউ কাজ করেছেন কয়েকজন এক সঙ্গে মিলে মিশে, একত্রে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এমনি একদল হোল "এখওয়ানুস্ সাফা" (Brethren of purity)।

কতকগুলি লোক একসঙ্গে বসে একই বিষয়ে কাজ করে যায় একাত্ম হয়ে, একই ভাবে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনার জন্যে—রাজনৈতিক কোন কিছু নিয়ে দল পাকিয়ে নয়—এমন উদাহরণ জগতের ইতিহাসে খুব কম; অন্তত মধ্যযুগে এমন একাত্মতা সত্যিই বিস্ময়কর। তখনকার দিনে রাজনীতির সঙ্গে যাঁদের কোন সংস্রব ছিল না তাঁরা যে রাজদরবারে বেশী আর্থিক সাহায্য আশা করতে পারতেন না তা ঠিকই। তা ছাড়া রাজদরবারের সংস্রব থেকে অতি একাগ্রতার সঙ্গে যাঁরা দূরে থাকতে চাইতেন তাঁদের বেলায় এমনি আর্থিক সাহায্য আসার পথ আর খোলা থাকত না। সাধারণত "এখওয়ানুস্ সাফা"র বেলায়ও একথা খেটে যায়। তাঁরা বাইরের সাহায্য, উৎসাহ বা বীতরাগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েই কাজ করে গেছেন—অবিচলিত মনে একাগ্র সাধনায় শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচারের জন্যেই।

তাঁদের দলটি ছিল গুপ্ত দল। বাইরে এঁদের কোন জাঁকজমকই ছিল না। নীরবে কাজ করে যাওয়াই ছিল তাঁদের একমাত্র সাধনা। এঁদের বিষয়ে বাইরে কেউ বিশেষ কিছু জানতেও পারত না। বাইরে জনসাধারণের মধ্যে যাঁদের নাম জাহির হয় না, তাঁদের বিষয় সাধারণের ঔৎসুক্য থাকে নিতান্ত কম, তাই এমনিতে তাঁদের বিষয় বিশেষ কিছু জানাও যায় না। তাঁদের কাজ থেকেই তাঁদের যা কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। "এখওয়ানুস্ সাফা"র বেলায়ও হয়েছে তাই। এমনিতে তাঁদের

কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না, তাঁদের লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি থেকে যা একটু পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্লুগেল (Flugel) ও ডিটিরিসির (Dieterici) অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এই দলের কথা কিছু কিছু বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে।

এই দলে মিলেছিলেন আরব ও পারস্যের বিভিন্ন স্থানের কতগুলি মনীষী, তখনকার রাস্তা ঘাট যান বাহনের কথা মনে করলে এমনিতে যাঁদের একত্রিত হওয়াই এক বিচিত্র ব্যাপার বলে বোধ হবে। এঁদের একজন ছিলেন পারস্যের পূর্বপ্রান্ত বাস্তের অধিবাসী, একজন ছিলেন পারস্যের উত্তর পশ্চিমের লোক, একজন হোলেন জেরুজালেমের বাসিন্দা, দুইজন ছিলেন আরবের বিভিন্ন স্থানে থেকে আগত। যতদূর জানা যায় এঁরা সংখ্যায় ছিলেন ছয় এবং এঁদের আর একজনও পারস্যেরই অধিবাসী। তবে ঐতিহাসিক সাহারজুরি মাত্র পাঁচ জনের নাম করেছেন। এই পাঁচ জন হোল (১) আবু সোলায়মান মোহাম্মদ বিন মুশির আল বস্তি আল মোকাদ্দসি (২) আবুল হাসান আলি এবনে হারুন আল জানজানি (৩) মোহাম্মদ বিন আহম্মদ আল নাহারজুরি (৪) আল আওফি (৫) জায়েদ বিন রাফ'য়া।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বসরাতে এই গোপন দলের প্রতিষ্ঠা হয়। সেইখানেই তাঁদের কাজ চলতে থাকে। কেউ কেউ এই প্রতিষ্ঠানের সময় বলেছেন ৯৮৩ খৃঃ অব্দ। ফ্লুগেলের মতে এঁদের গ্রন্থ "রাসায়েলে এখওয়ানুস্ সাফা" প্রকাশিত হয় ৯৭০ খৃঃ অব্দে। তা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের মুতাজলীয় মতবাদের

প্রাধান্য দেখলে মনে হয় বুয়াইদ নৃপতিদের আমলেই এর প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বুয়াইদ নৃপতিগণ তুর্কীর প্রভাব প্রতিহত করে বাগদাদে অসামান্য প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁরা ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তাঁদের উদার মতবাদ মুতাজলীয়দের প্রচার কার্যের পক্ষে ছিল পূর্ণ সহায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক। বুয়াইদ নৃপতিদের আমলে উৎসাহপূর্ণ আবহাওয়া মধ্যে "এখওয়ানুস্ সাফা"র আবির্ভাব কাল বলে মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

মুতাজলীয় মতবাদের প্রভাবে উত্তরোত্তর বর্ধিত বিজ্ঞান ও দর্শনকে ইসলামিক আইন কানুনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে খাপ খাইয়ে দেওয়া যায় কিনা, এমনি একটি চিন্তা তখনকার পণ্ডিতদের অনেককেই পেয়ে বসেছিল। অনেকেই এদিকে চেষ্টাও করেন। "এখাওয়ানুস্ সাফা"ই এ বিষয়ে অগ্রগামী। তাঁদের কাজগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় তাঁদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের, ইসলামিক আইন কানুনের সঙ্গে দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান এবং প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানকে একত্রিত করে একটি রূপ দেওয়া। তাঁরা সর্বসমেত বায়ান্নখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এগুলির নাম হোল "রাসায়েলে এখওয়ানুস্ সাফা"। এতে তখনকার দর্শন সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি তখনকার দিনের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্টরূপেই আমাদের চোখের সামনে ধরিয়ে দেয়।

এই বায়ান্ন খানা গ্রন্থের চৌদ্দ খানা হোল অঙ্ক এবং ন্যায় শাস্ত্র (Mathematics and logic), সতেরখানা প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং নৃবিদ্যা (Natural science and anthropology), দশখানা মনোবিজ্ঞান (Psychology) এবং এগার খানা ধর্মতত্ত্ব জ্যোতিষ বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে।

গ্রন্থগুলির একটি বিশেষত্ব হোল লেখার ভঙ্গিমা। দর্শন বিজ্ঞান, ও ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি কাটখোট্টা নীরস বিষয়গুলিকে সরস ভাষায় সাধারনের হৃদয়গ্রাহী করেই এতে অবতারনা করা হয়েছে। নীরস বিষয়গুলির নীরসতা মনের উপর একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া না ছড়িয়ে দিয়ে বর্ণনার সরসতায় মনকে আরও উদ্দীপিত করে তোলে। এই গ্রন্থগুলি বোম্বাই থেকে ১৮৮৭-৮৯ খৃঃ অব্দে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এদের কতক হিন্দী, পারসী এবং তুর্কী ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে। এই বায়ান্নখানা গ্রন্থে তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানই সবিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। ডিটিরিসির মতে এগুলো ভাল ভাবে বুঝতে হোলে প্রারম্ভে কতকগুলি বিষয়ের সম্যক জ্ঞানের দরকার, তিনি এই প্রাথমিক শিক্ষা এবং "রাসায়েলে এখওয়ানুস সাফা"র বর্ণিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে

পার্থিববিদ্যা (Mundane studies)

১। লেখা পড়া ২। ব্যাকরণ এবং শব্দকোষ সঙ্কলন (Lexicography) ৩। গণনা ও হিসাব (calculations and

computation) ৪। ছন্দপ্রকরণ ও কাব্যকলা ৫। প্রতীক বিজ্ঞান (Science of Omens and Protents) ৬। রসায়ন ম্যাজিক, ভোজবাজি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ৭। ব্যবসা বাণিজ্য ৮। ক্রয় বিক্রয়, বাণিজ্যনীতি, কৃষিকার্য ও পশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান ৯। জীবন বৃত্তান্ত।

ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষা (Religious studies)

১। কোরাণ শরিফ ২। কোরাণ শরিফের ব্যাখ্যা বা তফসির জ্ঞান ৩। হাদিস শরিফ ৪। ফেকাহ্ ৫। আধ্যাত্মিক বা সুফীতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান।

"রাসায়েলে" আলোচিত হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি।

১। অঙ্কশাস্ত্র এবং ন্যায়শাস্ত্র (আলরিয়াজিয়াত ওয়াল মনতাকিয়াত) চৌদ্দ খণ্ডে সমাপ্ত। এতে সংখ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, গান, জ্যামিতি এবং অঙ্কের পারস্পরিক সম্বন্ধ, শিল্পবিদ্যা এবং মানব চরিত্রের বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

২। প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং নৃবিদ্যা (Natural science and anthropology, আলতাব্বিয়াত ওয়াল ইনসানিয়াত) সতের খণ্ডে বিভক্ত। এতে বস্তু (matter), আকার, স্থান, কাল, গতি, সৃষ্টি বিজ্ঞান (cosmogony), উৎপাদন, বিনাশ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, খনিজবিদ্যা, প্রকৃতির উপাদান এবং তার প্রকাশ, উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), প্রাণীবিদ্যা (Zoology), শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা

(anatomy), নৃবিদ্যা (anthropology), অনুভূতি (sense perception), ভ্রূণতত্ত্ব (embryology), ক্ষুদ্রজগৎ হিসাবে মানুষ (Man as the microcosm), আত্মার পরিবর্ধন, শরীর এবং আত্মা, দৈহিক ব্যথা এবং আনন্দের সত্য প্রকৃতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৩। মনোবিজ্ঞান (Psychology) দশ খণ্ডে বিভক্ত।

৪। ধর্মতত্ত্ব (আল ইলাহিয়াত) এগার খণ্ডে বিভক্ত। "এখওয়ানুস সাফা"র আদর্শ এবং কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে এতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়েছে। ইসলামের গূঢ় মতবাদ, জগতের আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা বিধান, গুপ্ত বিদ্যা প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের কতটা সামঞ্জস্য করা যায় এবং এমনিতে তাদের মধ্যে কেমন সামঞ্জস্য আছে, প্রধানত সেই বিষয়েই "এখওয়ানুস্ সাফা"র মনীষিগণ বেশী জোর দিয়েছিলেন, তাঁদের দর্শনের মতবাদও চলেছে সেই পথ ধরেই। এর সঙ্গে মিশেছিল সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের আধুনিকতম রত্নসম্ভারকে বাছাই করে একত্র করে নেবার আকাঙ্খা। তাঁদের কার্যপ্রণালীও প্রধানত সমাবেশিক এবং সর্বব্যাপক (Encyclopædic)। ডিটিরিসির কথায় একে বলা যেতে পারে "এতদিন পর্যন্ত যে পরিমান জ্ঞান মানুষের আয়ত্তে এসেছে তাকে একত্রিত করে সম্বন্ধীভূত এবং বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক জগতের জন্য একটি সমাবেশিক মত তৈরী করা যাতে তদানীন্তন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

অনুযায়ী সমস্ত প্রকার প্রশ্নের সহজ উত্তর দেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।" তাঁদের দৃঢ় ধারণা ছিল ইসলামের মূল মন্ত্রের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সামঞ্জস্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দর্শনের দিক থেকে তাঁরা আলকিন্দি ও আলফারাবীর উত্তরাধিকারী এবং এবনে সিনার পূর্বাধিকারী। প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যে তাঁরা জোয়ার ভাটা, ভূমিকম্প, গ্রহণ, বায়ু কম্পনে শব্দের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দুইটি বিভিন্ন প্রকারের শব্দ তরঙ্গের মিশ্রনের কথা তাঁরাই প্রথম উত্থাপন করেন। রসায়নে ধাতুর গঠন বিষয়ে তাঁরা জাবির এবনে হাইয়ানের মতবাদকে অনুসরণ করেছেন ; আবার এরিষ্টটলের চারিটি মূল পদার্থের কথাও উল্লেখ করেছেন।

এতে শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে একাশী সংখ্যা পর্যন্ত ম্যাজিক স্কোয়ার, Perfect এবং Amicable numbers, সংখ্যা বিভাগ, দুইয়ে দুইয়ে বা তিনে তিনে বস্তু বিভাগ, সমসামতলিক ক্ষেত্রের বহিস্থ সীমার পরিমাণ সংক্রান্ত (Isoperimetrical) সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। তাঁদের জ্যোতিষ বিজ্ঞানের আলোচনা অন্য সবার আলোচনাকে ছাড়িয়ে গেছে বলা চলে এবং অনেকটা রসায়নের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েছে।

যাঁরা কয়েক জন একত্রে বসে কাজ করেছেন তাঁদের কাজের মধ্যে যে সক্রিয়তা দেখা যাবে এ স্বাভাবিক। কাজ যতই নীরস হোক না কেন, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত, একই

ভাবধারায় প্রভাবান্বিত তিন চার জন যখন একত্রে বসে সেই নীরস জিনিস নিয়েই কাজ করেন, তখন সে নীরসতা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে; সরসতার স্বচ্ছ আভা তাঁদের মনকে চাঙ্গা করে তোলে। কিন্তু একাকী যাঁরা এমনি নীরস জিনিস নিয়ে নাড়া চাড়া করেন, তাঁদের কাজের কঠোরতা বুঝতে হয়ত কারুরই দেরী হবে না। এই কঠোরতাকে বরণ করে নিয়েও যাঁরা এমনি নীরস কাজের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দিতে পারেন, তাঁদের ধৈর্য ও জ্ঞানপিপাসার কথা মনে করলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। দশম শতাব্দীতে এমনি অসীম অধ্যবসায়ী, অপরিসীম ধৈর্যশীল কয়েকজন জ্ঞানপিপাসুর সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের একজন হোলেন "মাফাতিহুল উলুম" প্রণেতা আবু আবছুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহম্মদ বিন ইউসুফ আল কাতিব আর অন্য একজন হোলেন "ফিহরিস্ত" প্রণেতা আবুল ফারাজ মোহাম্মদ বিন ইসহাক আলওয়াররাক।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া (Encyclopædia) প্রণয়ন করবার দাবী করতে পারেন আবু আবছুল্লাহ। তাঁর "মাফাতিহুল উলুম"ই পৃথিবীর সর্বপ্রথম এবং সর্বপুরাতন এনসাইক্লোপিডিয়া।

আবু আবছুল্লাহ ছিলেন খারেজম অধিবাসী। দেশের পূর্ব ইতিহাস যে মানুষকে অনেক সময় নানা কঠিন কাজ করতেও অনুপ্রাণিত করে, খারেজম এবং আবছুল্লাহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জইহুন নদী বিধৌত শস্য শ্যামলা খারেজম, অনুর্বর মরুভূমিলাঞ্ছিত

মধ্য এশিয়ায় সুদৃশ্য মরু উদ্যানের মতই বিরাজিত। মুসলিম অধিকারের পর থেকেই এই প্রদেশটি জ্ঞান বিজ্ঞান কৃষ্টিতে পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিপত্তিশালী খলিফাদের আওতায় বাগদাদের জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করার মূলে খারেজমের সাহায্যও কম নয়। বীজগণিত ও জ্যোতিষ চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে খারেজম প্রথম থেকেই বাগদাদের কৃষ্টির পথে অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। এই স্থানেই মুসলিম নিউটন মোহাম্মদ বিন মুসা আলখারেজমি জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর কৃষ্টি ও সভ্যতা যাঁদের তিল তিল দানের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে তাঁদের অনেকেই এই খারেজম অধিবাসী। ইসলামের অভ্যুদয় থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতেই বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এর ক্রোড়কে ধন্য করেছেন তাঁদের বিরাট প্রতিভা ও অভূতপূর্ব জ্ঞানের দানে।

এমনি পূর্বকীর্তিমণ্ডিত স্থানের অধিবাসী আবু আবদুল্লাহ যে এই সুকঠোর সাধনায় অনুপ্রাণিত হবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। এই অনুপ্রেরণার মূলে অবশ্য অন্য একটি কারণও বিদ্যমান ছিল। সে হোল তৎকালীন নৃপতির বিদ্যোৎসাহ। যুগ যুগ পূজিত মনীষীদের মনীষার স্ফুরণের পিছনে যে অনেক সময়েই নৃপতিদের বিদ্যোৎসাহ, বিদ্বানদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও সম্মান, প্রেরণার মূল উৎসরূপে বিরাজিত ছিল সে কথা অস্বীকার করা চলে না। যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অন্য রাজ্যের ধ্বংসের জন্য মুসলিম নৃপতিদের অনেকেরই অন্তরে একটি গুপ্ত বিষুবিয়াস সব সময়েই

প্রজ্জ্বলিত থাকলেও তারই পাশে পাশে থাকত জ্ঞানের জন্য একটি অফুরন্ত উৎস, তার সরলতা সচ্ছলতা সব সময়েই সব অবস্থাতেই দৃঢ় রেখে। আবু আবদুল্লাহও এমনি এক বিদ্যোৎসাহী নৃপতির সাহায্য পান। তিনি হোলেন সামানীয় বংশের মনসুর-তনয় দ্বিতীয় নুহ। সামানীয় বংশীয় নৃপতিগণ রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই শিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়ে আসছিলেন। তাঁদের অপরিসীম আগ্রহ ও বিদ্যানুরাগে বুখারা হয়ে উঠেছিল সমস্ত পারস্যের কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল। দ্বিতীয় মনসুর ও তাঁর পুত্র নুহের সময় এদিক দিয়ে হয় আরও উন্নতি। খোরাসানের ভাগ্যে এমন উন্নত পরিস্থিতির উদ্ভব আর কোন দিনই হয় নাই। দ্বিতীয় নুহের মন্ত্রী আবুল হাসান ওবায়দুল্লা বিন আবুল ওতাবও বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবু আবদুল্লাহ তাঁর "মাফাতিহুল উলুম" এই মন্ত্রীর নামেই উৎসর্গ করেন।

আবু আবদুল্লাহর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। খুব সম্ভব তিনি বলখ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখও অজ্ঞান অন্ধকারের অন্তরালেই রয়ে গেছে। তাঁর গ্রন্থ থেকে যতদূর বোঝা যায় তিনি কোন রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং খোরাসানেই বসবাস করতেন। খোরাসানের বহু লোকের নাম তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়; তা ছাড়া পারস্যের এই পূর্ব প্রান্তের অবস্থা আচার ব্যবহার ইত্যাদির কথাও এতে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

গ্রন্থখানা ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে ফন ফ্লুটেন (Von Vloten) কর্তৃক লিডেন (Lyden) থেকে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এতে বিজ্ঞানকে তুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হোল দেশীয় বা আরবীয় আর একটি হোল বিদেশীয় অর্থাৎ গ্রীস, পারস্য বা অন্যান্য স্থানে যার প্রথম উৎপত্তি।

দেশীয় বিজ্ঞান সাধারণত ধর্মসম্বন্ধীয়। এতে আছে :—

১। ব্যবহার তত্ত্ব (ফিকহ)—আইন (ওছুল) এবং ব্যবহার বিধি (ফুরু) ইত্যাদি নিয়ে এগার পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এতে পাক নাপাক, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ক্রয় বিক্রয়, বিবাহ, হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের শাস্তি, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে—এক কথায় মানুষের দৈনন্দিন কার্য কলাপের বিধি ব্যবহার ইত্যাদির কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

২। দর্শন (কালাম)—সাত পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এতে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের মতবাদ, খৃষ্টান, ইহুদী, পারসী এবং ভারতীয় পৌত্তলিক, কেলিডোনিয়ান পৌত্তলিক, আরবীয় পৌত্তলিক এবং তাঁদের ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৩। ব্যাকরণ (নহু)—বার পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

৪। অফিস কার্যনির্বাহক বিধি (Secretariat art কিতাবত)—চার পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এতে গভর্ণমেণ্ট অফিসে যে সমস্ত পারিভাষিক নাম (Technical term) ব্যবহৃত হোত সে গুলোর সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে।

৫। ছন্দ প্রকরণ (ওরূদ) ও কাব্যকলাপ (সে'য়র)—পাঁচ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

৬। ইতিহাস (আখবার)—নয় পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এতে গ্রীস, রোম, পারস্যের পূর্ব ইতিহাস, মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ইসলামের পূর্বেকার আরব বিশেষ করে ইয়েমেনের ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিদেশী বিজ্ঞান

৭। দর্শন (ফালসাফা)—তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে এতে নানা বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে। শব্দের উৎপত্তি (গ্রীক থেকে বিশুদ্ধ ভাবে ব্যাখ্যাত) ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে এর সম্বন্ধ এবং এর উপযুক্ত স্থান, প্রকৃতি বিজ্ঞান (চিকিৎসাশাস্ত্র, বায়ুবিজ্ঞান, খনিজ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, রসায়ন) অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

৮। ন্যায়শাস্ত্র (মনতেক্)—নয় পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

৯। চিকিৎসা শাস্ত্র (তিব্)—আট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এতে শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, নিদান শাস্ত্র (Pathology) ঔষধ উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালী, ভৈষজ্য বিজ্ঞান (Therapeutics), পথ্য, ওজন, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

১০। অঙ্ক (ইলমুল আদাদ)—পাঁচ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। বীজগণিতের কিছু আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে।

১১। জ্যামিতি (হান্দাসা)—চার পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

১২। জ্যোতির্বিজ্ঞান (এলমুল নজুম)—চার পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এতে গ্রহ এবং স্থির নক্ষত্রাদির নাম, বিশ্বের গঠন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কথা আলোচিত হয়েছে।

১৩। গান (মুসিকি)—তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। গানের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র, বিভিন্ন স্বরচিহ্ন ও সুরের নাম প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

১৪। বল বিজ্ঞান (Mechanics এলমুল হিয়াল)—উদস্থিতিবিদ্যা (Hydrostatics) নিয়ে দুই পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

১৫। রসায়ন (কিমিয়া)—তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। রসায়নাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং সেগুলির ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

আবু আবদুল্লাহর "মাফাতিহুল উলুম" তৎকালীন জ্ঞানের মাত্রার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু যাঁরা এই জ্ঞানরাজ্যকে ক্ষুদ্র অপরিসর গণ্ডীর সীমা থেকে বিশাল প্রান্তরে পরিণত করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের আজীবন সাধনা দ্বারা, তাঁদের কথা বা স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের কাজের পরিচয় এতে কিছু নাই। সে ভার নিয়েছিলেন "ফিহরিস্ত" প্রণেতা আবুল ফারাজ আল নাজিম। আবুল ফারাজের পূর্ণ নাম হোল আবুল ফারাজ মোহাম্মদ এবনে আবি ইয়াকুব আলওয়াররাক আল নাজিম আল বাগদাদী।

আবুল ফারাজের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বলতে গেলে তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট কিছুই

নির্ধারিত হয় নাই। কারুর কারুর মতে তিনি ৯৮৫ খৃঃ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন, কেউ কেউ ৯৮৮ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু তারিখ বলে নির্ধারিত করেছেন। মৃত্যুর সঠিক তারিখ সম্বন্ধে এমনি একটা মতভেদ থাকলেও, তবুও একটা সংবাদ পাওয়া গেছে বলা যেতে পারে, কিন্তু জন্ম তারিখ সম্বন্ধে এমনি একটা স্পষ্ট কিছুই জানা যায় না। তাঁর গ্রন্থ থেকে বুঝা যায় ৯৪০ খৃঃ অব্দে তদানীন্তন কোন এক বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁর জন্ম তারিখ ৯২৫ খৃঃ অব্দের এ ধারে কিছুতেই হতে পারে না।

আবুল ফারাজের পিতা ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা (আল-ওয়ার্‌রাক)। অন্য সাধারণ পুস্তক বিক্রেতার মত তিনি দরিদ্র, প্রতিপত্তিহীন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন কিম্বা ঠিক তার বিপরীত সম্মান, প্রতিপত্তিতে তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত সমাজের একজন ছিলেন, সে স্পষ্ট করে কিছুই জানা যায় না। পুত্রের নামের সঙ্গে "আল নাজিম" খেতাব সম্মান ও প্রতিপত্তির কথাই জানিয়ে দেয়। "আল নাজিম" অর্থ হোল খলিফা অথবা অন্য কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু (Table Companion); যিনি "আল নাজিম" হোতে পারেন তিনি যে সম্মান, প্রতিপত্তিতে সম্ভ্রান্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে "আল নাজিম' পিতা, পুত্র কিম্বা অন্য কোন উর্ধতন পুরুষের—কার গৌরবের পরিচয়—সে কথা বলা সহজ নয়। হয়ত এ পুত্রেরও গৌরবের পরিচয়ের সাক্ষ্য হতে পারে। বাগদাদ

আবুল ফারাজের জন্মস্থান না হোলেও এখানে যে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করেছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তাঁর গ্রন্থ থেকেই। তিনি তাঁর গ্রন্থে অনেক বাগদাদবাসীর জীবনের খুঁটিনাটি কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর শিক্ষক ও পরিচিতবর্গও বাগদাদবাসী। তবে সময়ে সময়ে তিনি মসুলেও থাকতেন বলে মনে হয়।

আবুল ফারাজ তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে মুনাজ্জিমের অধীনে শিক্ষালাভ করেন। আবু সোলায়মান আল্‌মন্‌তিকিও তাঁর অন্যতম শিক্ষক। বিখ্যাত বিদ্যানুরাগীদের শিষ্য হিসাবে তাঁর মধ্যে এমনি শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগের উদ্ভব হয়েছিল তার ভিত্তিমূল আরও দৃঢ় হয় বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে। তিনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক ইবনে আল জাররাহ, দার্শনিক ইবনে আল খাম্মার, এবং ইয়াহিয়া ইবনে আদির অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে পরিগণিত হন। আবুল ফারাজের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, প্রকৃত বিদ্যানুরাগ ধর্মবত্তা এবং সহনশীলতা এমনি বন্ধুত্বের পথ সুগম করে দিয়েছিল। তিনি শিয়া মতাবলম্বী হলেও গোঁড়ামীর নাম গন্ধও তাঁর মনে স্থান পায় নাই, তাই তিনি খৃষ্টান দার্শনিক ইবনে আল্‌খাম্মারকেও তাঁর দলের মধ্যে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনি সুধীজনের সংস্পর্শে শিক্ষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। এমনিতে যা থাকে সুপ্ত হয়ে, অনুকূল আবহাওয়ায় সে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠে। আবুল ফারাজের বেলায়ও যে এর ব্যতিক্রম হয় নাই "ফিহ্‌রিস্ত" হোল তারই অভিব্যক্তি।

যতদূর জানা যায় আবুল ফারাজ নিজেও ছিলেন পিতার মতই পুস্তক বিক্রেতা। তাঁর গ্রন্থে তিনি সমস্ত প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্কশাস্ত্র, খনিজ বিদ্যা, কৃষিকার্য কোন কিছুই তাঁর চোখ এড়াতে পারে নাই—সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় তিনি প্রত্যেক পুস্তকের আকার, পৃষ্ঠা, কভার ইত্যাদির কথা সবিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যিনি নিজে পুস্তক না দেখেছেন তাঁর পক্ষে এমনি খুঁটিনাটি তথ্য দেওয়া একেবারে অসম্ভব। সমস্ত বই এর সঙ্গে সাধারণত এক পুস্তক ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কারুর সাক্ষাৎ হওয়া তেমন সম্ভবপর নয়। কেউ হয়ত কোন এক বিষয়েই বিশেষ আগ্রহশীল তিনি সে বিষয়ের সমস্ত পুস্তকের কথাই হয়ত বা জানতে পারেন কিন্তু অন্য বিষয়ের পুস্তকের কথা তাঁর কাছে থাকে সাধারণত অজ্ঞাত। আবুল ফারাজের এই খুঁটিনাটি বর্ণনা থেকেই মনে হয় তিনি পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন।

ফিহরিস্তে গ্রন্থকার পূর্বেকার ও তৎকালীন সমস্ত পণ্ডিতদের যথাযথ পরিচয় ও তাঁদের কার্যকলাপ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাঁদের প্রাচ্যের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি একটু মাত্রও অনুরাগ আছে তাঁরাই এর আভ্যন্তরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রকেলম্যান "ফিহরিস্ত"কে অতীব মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে উচ্ছসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে "আবুল ফারাজ এই ফিহরিস্ত বা তালিকায় তখনকার দিনের সমস্ত আরবী পুস্তকের, তা মৌলিক রচনাই

হোক বা অনুবাদই হোক—একটি তালিকা দিয়েছেন। এতে তিনি প্রথমে বিভিন্ন প্রকারের লিখন পদ্ধতির কথা বর্ণনা করে বিভিন্ন ধর্মের প্রেরিত পুস্তকের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর পরে রয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার আলোচনা। কোরান শরিফ থেকে আরম্ভ করে গুপ্ত বিদ্যা পর্যন্ত কোন বিষয়ই তাঁর নজর এড়ায় নাই। তিনি প্রত্যেক সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাখাকে ভাগ ভাগ করে সেই ভাগে ভাগে লেখকদের নাম সন্নিবেশ করার পর যথাসম্ভব পৌর্যাপর্যক্রমে তাঁদের জীবনী ও কাজের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের দিক থেকে গ্রন্থখানা অমূল্য। সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কৃষ্টির ইতিহাসের জন্য এতে শুধু আরব পারস্যের নয় প্রায় সমস্ত প্রাচ্য দেশের বহু মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ হয়েছে।”

“ফিহরিস্ত”এর এই অভূতপূর্ব গৌরবের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয় নাই সে বলা ঠিক হবে না। স্প্রেঙ্গার (Sprenger) একে কোন বৃহৎ পুস্তকালয়ের তালিকা বলে নির্দেশ করেছেন, তবে সুখের বিষয় আর কেউই তাঁকে সমর্থন করেন নাই। ফ্লুগেল সোজাসুজি ভাবেই একে অবিশ্বাস্য বলে মত প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ও অগাধ বিদ্যাবত্তারই পরিচয় দেয়। অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের জন্যে গ্রন্থকারের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় যেমন মাথা নত হয়ে আসে, তেমনি দুঃখও হয় যে গ্রন্থকার যে সমস্ত বহুমূল্য গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন সেগুলোর

অধিকাংশেরই আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। তিনি যে সমস্ত গ্রন্থকারের ভূরি ভূরি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন আমরা এখন তাঁদের সামান্য দুই একখানা গ্রন্থের কথাই জানি। তাঁদিগকে বরং ভাগ্যবান বলতে হবে, তবুও তাঁদের কাজের পরিচয় হিসাবে দুই একখানা গ্রন্থ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে,কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকারের নাম শুধু ফিহরিস্তের মারফতেই আমরা জানতে পারছি এমনিতে তাঁদের পরিচয় পাবার আর কোন উপায়ই নাই।

ফিহরিস্তের একটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ছন্দ প্রকরণ বা ভাব বিন্যাসের উচ্ছাস নাই। অন্যান্য আরবী পারসী গ্রন্থকারদের ভাববিলাসিতার বাহুল্য আবুল ফারাজ একেবারে পরিত্যাগ করে গেছেন। ফিহরিস্তের ভূমিকা থেকেই বুঝা যাবে এতে সাধারণ আরবী গ্রন্থের ভাববিলাসিতা কেমন ভাবে বর্জিত হয়েছে। ভূমিকার অনুবাদ এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"খোদা তোমার অসীম অনুগ্রহে মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য কর যেন তারা প্রারম্ভ থেকে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, যেন শুধু কথার বাঁধুনীর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হয়। আমিও আমার গ্রন্থ এই কথাগুলি দিয়েই আরম্ভ করছি কেননা খোদার মর্জিতে, আমার গ্রন্থ লিখবার উদ্দেশ্য এতেই বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এতে সমস্ত আরব এবং অনআরব জাতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে যাদের কোন কিছু দান আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে তাদের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। এতে বিজ্ঞান যখন

আবিষ্কৃত হয়েছে তখন থেকে আরম্ভ করে ৩৭৭ হিজরী (৯৮৭—৮৮ খৃঃ অব্দ) পর্যন্ত লিখিত ও আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থের গ্রন্থকারদের নাম, তাঁদের বংশাবলী, জন্ম মৃত্যুর তারিখ, তাঁদের আবাসস্থান, জীবন বৃত্তান্ত, আচার ব্যবহার, স্বভাব ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে"। এর পরেই গ্রন্থকার তার গ্রন্থের সূচী দিয়েছেন, এই সূচী থেকেই বোঝা যায় গ্রন্থখানার বিষয় বস্তু কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম খণ্ড—তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে আরব এবং অনআরব বিভিন্ন জাতির ভাষা, তাদের লিখন পদ্ধতি, লিখবার বিভিন্ন কায়দা, লিখিত অক্ষরের বিভিন্ন রূপ প্রভৃতি নিয়ে আলাচনা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধর্মের প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থসমূহের এবং এই সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কোরাণশরিফ সম্বন্ধে আলাচনা হয়েছে। তাছাড়া কোরাণ শরীফ সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থাবলীর নাম ধাম পরিচয় এবং গ্রন্থগুলির মধ্যেকার পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—বৈয়াকরণিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদদের কথা নিয়ে তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাকরণের প্রথম উদ্ভবের ইতিহাস, বসরার বৈয়াকরণিক এবং আরব আলঙ্কারিকদের পরিচয় ও তাঁদের গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুফার বৈয়াকরণিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদদের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই উভয় দলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবার জন্যে যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের নাম ধাম ও গ্রন্থাবলীর কথা আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড—ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস, জীবনী, বংশতালিকা ইত্যাদি নিয়ে তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে ঐতিহাসিক, জীবনী লেখক, কুলাচার্য ও ইতিহাস লেখকদের নাম ধাম ও গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নৃপতি, ধর্মযাজক, রাজদূত এবং লেখক রাজকর্মচারীদের নাম, ধাম ও গ্রন্থের বিষয় আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে নৃপতির সভাসদ, অনুগৃহীত ব্যক্তি, চারণকবি, ভাঁড়, বিদূষক প্রভৃতিদের নাম, ধাম ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড—কাব্য ও কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা—দুই পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে অন্য ধর্মাবলম্বী পৌত্তলিক কবি, তাঁদের সমসাময়িক মুসলিম কবি, এবং এই সকল কবিদের কাব্য সংগ্রহকারীদের কথা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম কবিদের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড—বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও দার্শনিকদের কথা নিয়ে পাঁচ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে দর্শনের উদ্ভব এবং মুতাজলীয় ও মুরজাই মতবাদী গ্রন্থকারদের জীবনী ও তাঁদের গ্রন্থসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

শিয়ামতাবলম্বীদের ইমামী, জায়দী ও অন্যান্য সম্প্রদায় এবং ইসমাইলী মতাবলম্বী গ্রন্থকারদের ও তাঁদের লিখিত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অদৃষ্টবাদী এবং হাসবিয়া মতাবলম্বী গ্রন্থকারদের নাম ধাম ও তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে খারিজি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের নাম ধাম ও তাঁদের গ্রন্থসমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভ্রাম্যমান সাধু, তপস্বী দরবেশ, সুফী যাঁরা নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে নানা মতবাদ প্রচার করতেন, তাঁদের পরিচয় ও গ্রন্থসমূহের নাম দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড—হাদিস শরীফ সংগ্রহকারী ফকিহ্ এবং ফেকাহ্র আলোচনা নিয়ে আট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে এমাম মালিক এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের নাম ধাম পরিচয় ও গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এমাম আবুহানিফা এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের নাম ধাম পরিচয় ও তাঁদের গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এমাম শাফী এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের নাম ধাম পরিচয় ও তাঁদের গ্রন্থসমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দাউদ বিন আলি বিন খালেক আলইস্পাহানী এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের নাম ধাম পরিচয় ও তাঁদের গ্রন্থাবলীর আলোচনা হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে শিয়া ইমাম ও ফকিহ্দের জীবনী ও তাঁদের গ্রন্থাবলীর কথা আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যে সমস্ত মনীষী একাধারে হাদিসবেত্তা এবং হাদিস

সংগ্রহকারী, তাঁদের জীবনী ও রচিত গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে আবু জাফর আল তাবারী ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের নাম ধাম পরিচয় ও তাঁদের গ্রন্থাবলীর কথা আলোচিত হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে খারিজি ফকিহ্‌দের জীবনী ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম খণ্ড—দর্শন ও পূর্বকালের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক (Materialist Philosopher) এবং নৈয়ায়িকদের জীবনী, তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী ও সেগুলির ভাষ্যের কথা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জ্যামিতিক. সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাতা, মেকানিক্স ও ইঞ্জিনিয়ারদের জীবনী এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভব, তৎকালীন ও পূর্বেকার চিকিৎসকদের জীবনী, তাঁদের গ্রন্থাবলী, সেগুলির ভাষ্য ও অনুবাদ ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম খণ্ড—উপকথা, উপাখ্যান, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে কথাশিল্পী, গল্পলেখক ও শিল্পীদের জীবনী ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক প্রভৃতির নাম ধাম ও তাঁদের প্রণীত গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অন্যান্য নানাবিষয়ে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারদের রচিত গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে।

নবম খণ্ড—বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের কথা নিয়ে দুই পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে সাবিয়ান নামে অভিহিত হাররান অধিবাসী ক্যালিডোনিয়ান, ম্যানিকিয়ান, বারডেসানিয়ান খুররামিজ, মারসিয়োনী, মাজদাকায়ী প্রভৃতি দ্বৈতবাদীদের কথা ও তাঁদের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

দশম খণ্ড—রাসায়নিকগণের এবং পূর্বকাল থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক স্পর্শমণির অনুসন্ধানে রত ছিলেন—তাঁদের নাম ধাম ও রচিত গ্রন্থাবলীর কথা আলোচিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ এবং আবুল ফারাজের মত মোতাহ্হার এবনে তাহিরও বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে যতদূর মনে হয় তাঁর গ্রন্থখানি এই দুইজনের গ্রন্থের মত সমাদর লাভ করতে পারে নাই। মোতাহ্হারের পূর্ণ নাম হোল মোতাহ্হার এবনে তাহির আল মোকাদ্দসী। আল মোকাদ্দসী অর্থ পবিত্র স্থানের বা জেরুজালেমের অধিবাসী। জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করলেও সিজিস্তানের বাস্তেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়।

মোতাহ্হার এবনে তাহির

তাঁর গ্রন্থ "কিতাব আল বাদ ওয়াল তারিখ" সেই সময়কার জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির পূর্ণ পরিচায়ক। এর বিশেষত্ব হোল সভ্যতার পরিবাহী তৎকালীন ও পূর্বেকার সমস্ত কৃষ্টি নিয়ে

আলোচনা। গ্রন্থকার শুধু মুসলিম সুধীদের বা মুসলিম প্রাধান্যের যুগের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হন নাই ইহুদী এবং ইরানীয় সভ্যতার কথা নিয়েও আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে একটি বিষয় বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। পৃথিবীর বয়সের আলোচনায় তিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মত উধৃত করেছেন— সে অনুসারে বয়স হোল ৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসর। সংখ্যাগুলিও দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত।

দশম শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অপ্রতিহত প্রভাব বজায় থাকে। মুসলিম অধিকৃত দেশ ছাড়া অন্য কোন স্থানে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি তেমন কোন সাড়া এই সময়ে জাগে নাই। তবে শুধু মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণই যে এই সাধনায় লিপ্ত ছিলেন অন্য কোন ধর্মাবলম্বী তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নাই এমন মনে করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে। নবম শতাব্দীতে অন্য ধর্মাবলম্বী কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যেমন মুসলিম নরপতিদের অধীনে থেকেও সানন্দে, সাগ্রহে বিজ্ঞান চর্চায় যোগ দিয়েছিলেন দশম শতাব্দীতেও তার জের মেটে নাই। এই সমস্ত বিধর্মী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দুএকজন ছাড়া কেউ তেমন বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নাই, এ বললে তাঁদের প্রতি বিশেষ অন্যায় করা হবে না। দশম শতাব্দীতে খৃষ্টান বৈজ্ঞানিক কুস্তা বিন লুকা ছাড়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে অন্য কারুর নাম করা যায় না। তিনি গ্রীক বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি আরবীতে অনুবাদ করার জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। এই সমস্ত অনুবাদ কার্যের

মধ্যে থিওডোসিয়াস (Theodosius) এর Spherics, এরিসটারকাস (Aristarchas), অটোলাইকাস (Autolycos) হিপসিক্লস (Hypsicles) এবং ডাওফেন্ট (Diophantus) এর গ্রন্থাবলীর কতকাংশের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তাঁর অনুবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী অনেক দিন পর্যন্ত প্রামাণ্য বলেই গৃহীত হোত। বস্তুত তৎকালে বৈজ্ঞানিক হিসাবে কুস্তা বিন লুকা যে অপরিসীম খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন তার নিদর্শন—পারসী কবি নাসিরি খসরুর কবিতাতে তাঁর উল্লেখেই—পাওয়া যায়। কবিরা বৈজ্ঞানিকদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন সাধারণত এমন মনে করবার কোন কারণই নাই। এই অসহানুভূতির মধ্যেও যিনি কবির কাব্যে স্থান পেয়েছেন, তিনি যে সাধারণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত ছিলেন সে অনুমান করা বিশেষ কঠিন নয়। এ সম্বন্ধে কবি খসরুর নিম্নোক্ত পদটি উল্লেখযোগ্য—

"হর কাসে চিজি হামি গোয়েদ জে তেরা বায়ই খিস
তা গুমান আয়াদ, তা কুস্তা বিন লুকাস্তি

"যে কেউ, অতি বড় মূর্খতা সত্ত্বেও, যখন কোন নূতন কথা বলে তখন সে যেন কুস্তা বিন লুকার সমান হয়েছে এমনি ভাব দেখায়।" কুস্তা বিন লুকার পূর্ণ নাম হোল কুস্তা বিন লুকা আলবালবেকী। লাটিনে তিনি লিউক এর পুত্র কনষ্টেনটাইন (Constantine son of Luke) নামে পরিচিত। তিনি

সিরিয়ার অন্তর্গত বালবাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯১২ খৃঃ অব্দে আরমেনিয়াতে দেহত্যাগ করেন। আরবীয়েরা "শূন্য" কি রকম ভাবে ব্যবহার করতেন তার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায় কুস্তা বিন লুকার গুণন পদ্ধতিতে।

বাগদাদের খলিফাদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহ যে ইউরোপের এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের পুঞ্জীভূত অন্ধকারকেও আস্তে আস্তে লঘু করে আনছিল, মিসর এবং স্পেনের বিজ্ঞান আলোচনায় সে পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্রাজ্য লিপ্সার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রচার এবং জ্ঞান প্রচার ও আহরণ, এ দুটিও মুসলিম রাজনৈতিকদের মহামন্ত্র হিসাবেই পরিগণিত হয়ে পড়েছিল। নবম শতাব্দীতে স্পেনে সবেমাত্র মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই সে সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের চেয়ে অন্য দিকেই বেশী নজর পড়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞান পিপাসা চাপা পড়ে গেছে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্খার তলে। এ হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু দশম শতাব্দীতে, নবম শতাব্দীর এই বিরাগ এবং অবহেলার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয়েছে।

মহামতি খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের সময় থেকেই বিজ্ঞান চর্চার দিকে স্পেনের খলিফাদের দৃষ্টি পড়ে। আবদুর রহমান একদিকে যেমন প্রতিপত্তিশালী নরপতি, অসম সাহসী যোদ্ধা অন্যদিকে তেমনি সদয় ও সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি নিজে সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করতেন। তাঁর শিক্ষা ও সদাশয়তার সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে জগতের সর্বাংশ থেকে শ্রেষ্ঠ

পণ্ডিতেরা কর্ডোভায় আগমন করতেন। খলিফাও নিজ পদমর্য্যাদা ভুলে তাঁদের সঙ্গে সানন্দে যোগদান করতেন, তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনায় সময় কাটাতেন। খলিফা আবদুর রহমান বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দান ব্যতীত নিজে বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করেন নাই বটে, তবে তাঁর এই বিদ্যোৎসাহিতা পুত্র হাকামের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে তাঁকে "গ্রন্থকীট খলিফাতে" পরিণত করে। খলিফা দ্বিতীয় হাকাম আল্‌মুসতানসির বিল্লাহর রাজত্বকালকে স্পেনের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা চলে।

জ্ঞান চর্চার জন্য হাকামের নাম ইতিহাসে সুপরিচিত। জ্ঞান চর্চায় তিনি এত বেশী আনন্দ পেতেন যে সামরিক গৌরব লাভের আকাঙ্খা তাঁর হৃদয়ে খুব কমই স্থান পেত। হাকামের শান্ত পাঠাসক্তি খলিফা হিসাবে তাঁকে কোন অপকারই করে নাই ; পাঠাসক্তির বিশেষ প্রাবল্যসত্ত্বেও তাঁর ক্ষাত্রবীর্য্যের কোন অভাবই হয় নাই। পিতা আবদুর রহমানের জীবিত অবস্থাতেই হাকামের পাঠাসক্তি এবং শান্তি প্রিয়তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই খলিফা আবদুর রহমানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কতিপয় সামন্ত নৃপতি, সন্ধি সর্ত ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করেন। তাঁদের ধারণা ছিল হাকাম যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হবেন না কিন্তু শীঘ্রই তাঁদের ধারণা ভুল বলে প্রতিপন্ন হোল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল গ্রন্থকীট পণ্ডিতও সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হোতে পারেন, তিনিও অন্য যে কোন অসম সাহসী

শৌর্যবীর্যশালী নরপতির মতই দৃঢ় হস্তে বিদ্রোহ দমন করতে পারেন। হাকাম কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করে আবার নিজ কাজে মন দিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের জন্য যে জ্ঞান পিপাসা এতদিন ছিল শান্ত হয়ে আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এর পর থেকেই হাকাম তাঁর জগদ্বিখ্যাত লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ক্রয়ের জন্য তিনি প্রাচ্যের সর্বাংশে দলে দলে লোক পাঠান। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অনুসন্ধানে তাঁর কর্মচারীরা দামস্কাস, বাগদাদ, কায়রো, আলেকজেন্দ্রিয়া কনস্তান্তিনোপলের পুস্তকের দোকানে হানা দিতে থাকেন। বিজ্ঞানের পুস্তকের নূতন পুরাতন যে কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি যত অধিক মূল্য হউক না কেন ক্রয় করবার আদেশ পেয়ে তাঁরা মূল্যের দিকে দৃকপাত না করে পুস্তকের দিকেই বেশী দৃকপাত করতেন। গ্রন্থের অধিকারী বিক্রয়ে অসম্মত হোলে তাঁকে যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে নকলনবীশের দ্বারা নকল করিয়ে সে গ্রন্থের নকল কর্ডোভায় প্রেরিত হোত। পুস্তক লিখিত হওয়ার পূর্বেও অনেক সময় খলিফা পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেছেন জানতে পারলেই, হাকাম তাঁকে মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে দিয়ে পুস্তক লিখিত হোলেই, তার প্রথম অনুলিপি কর্ডোভায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করতেন। এমনিভাবেই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানীকে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক কিতাবুল আগানির প্রথম অনুলিপির জন্য এক হাজার দিনার প্রদত্ত হয়। খলিফার এমনি

প্রচেষ্টার ফলে পারস্য ও সিরিয়ায় যে সকল পুস্তক লিখিত হোত, তা তথাকার ছাত্র ও মনীষীদের জ্ঞানগোচর হবার পূর্বেই সুদূর ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে হাকামের লাইব্রেরীতে তার প্রতিলিপি পৌঁছে যেত। মুদ্রণ শিল্প তখন অজ্ঞাত। নকলনবীশের উপরই সমস্ত পুস্তকের প্রতিলিপি তৈরী করবার ভার পড়ত। এতে যে কত অর্থব্যয় হোত সে সহজেই অনুমেয়। হাকামের জ্ঞানস্পৃহা এই কষ্ট ও অর্থব্যয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই নিজের গতি অব্যাহত রাখতে কৃতসঙ্কল্প; তাই তাঁর লাইব্রেরীতে চার লক্ষেরও অধিক পুস্তক সংগৃহীত হয়। এই বিরাট লাইব্রেরীর পুস্তকের তালিকা পঞ্চাশ ভাগে সমাপ্ত। প্রত্যেক ভাগে পঞ্চাশ তা' কাগজ। তাতে করেই তদানীন্তন পেশাদার লেখিয়ার নিপুণ হস্তে নাম ও বিবরণ লেখা হয়েছে।

খলিফা শুধু পুস্তক সংগ্রহ করে নিজের লাইব্রেরীর শোভা বৃদ্ধি করেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি অতি যত্নের সঙ্গে প্রত্যেকখানা পুস্তক অধ্যয়ন করতেন এবং প্রত্যেক পঠিত গ্রন্থের পাশে পাশে অতি যত্নের সঙ্গে টীকা লিখে রাখতেন। এই টীকা থেকেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের মনীষীরা এই টীকা দেখে খলিফার সর্বগুণবিশারদত্বের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন। এরূপ সুশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী নরপতির সময়ে জ্ঞানের সমস্ত শাখারই সমৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। আসলে হয়েছিলও তাই। স্পেনে তথা ইউরোপে, গ্রীক রোম সভ্যতা অন্তর্হিত হওয়ার পর এই

প্রথম বিজ্ঞান আলোচনা হয়েছিল বলা চলে। খলিফা আবদুর রহমানের সময় থেকে যে শিখা ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল আলহাকামের সময় সেইটি আরও ব্যাপক ভাবে প্রজ্জলিত হয়ে চতুর্দিক দীপ্ত ও উদ্ভাসিত করে তোলে। শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের দিক দিয়ে দশম শতাব্দীতে তেমন কিছু হয় নাই; তবে একাদশ শতাব্দীতে এর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলা চলে।

দশম শতাব্দীতে এক আলমাজরিতি ছাড়া আর কেউ মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কোন তৎপরতা দেখাতে পারেন নাই। বিজ্ঞান চর্চার সবে যখন আরম্ভ তখনই মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর নয়। সুপ্রতিষ্ঠিত না হোলে গবেষণার দিকে কেউ তেমন নজর দিতে পারেনা—স্পেনের মুসলমানদের বেলায়ও এই কথাই খাটে, তবুও এই অপ্রতিষ্ঠার মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞান চর্চায় মন দিয়েছিলেন। মৌলিকতা ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁদের বর্তমানে পরিচিত কাজগুলি তেমন বিশিষ্টতার দাবী করতে না পারলেও, তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞানের প্রতি একটি বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগের সন্ধান এতে পাওয়া যায়।

কর্ডোভার সাহিব আলকুবল অঙ্কশাস্ত্রবিদদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম হোল মুসলিম এবনে আললেয়াত আবু ওবায়দা,

সাহিব আল কুবল

তবে তিনি সাধারণত, তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্যে সাহিব আল কুবল নামেই পরিচিত ছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখার মধ্যে গণিতশাস্ত্রই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এর সাধনাই তিনি তাঁর

জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। এই সাধনার ফল কোন মৌলিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল কিনা তার কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় না, তবে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অঙ্ক সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলে জানা যায়। এতে তাঁর প্রতিভার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। ৯০৭ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

দশম শতাব্দীর স্পেনের অন্যতম বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ হোলেন সালহাব এবনে আবদুসসালাম আলফারাজী আবুল আব্বাস। দুঃখের বিষয় এঁর বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ইনি আলহাকামের সিংহাসন আরোহনের অনেক পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। খুব সম্ভব ইনি সাহিব আল কুবলেরই সমসাময়িক।

সালহাব এবনে আবদুস সালাম

স্পেনের দশম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ আলমাজরিতির অভ্যুদয় হয় মনীষী ভূপতি আলহাকামেরই রাজত্বকালে। বিদ্যোৎসাহী নরপতির অনুপ্রেরণাই আলমাজরিতিকে বিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রেরিত করে বলা চলে। আলমাজরিতি অঙ্কশাস্ত্রের জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও amicable numbers এর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তিন বিষয়েই প্রতিভার পরিচায়ক মনীষাব্যঞ্জক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আলমাজরিতির পূর্ণ নাম হোল আবুলকাসেম মাসলাম এবনে আহম্মদ আলমাজরিতি। দশম শতাব্দীতেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়। তাঁর মৃত্যুর তারিখ হিসাবে তাঁকে দশম শতাব্দীতে না ফেলে একাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের

পর্য্যায়ভূক্ত করাই হয়ত ঠিক হোত। কিন্তু খলিফা আলহাকামের সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা বিজড়িত থাকায় তাঁকে দশম শতাব্দীর পর্য্যায়ভুক্ত করাই হয়ত সঙ্গত হবে; সেই হিসেবেই তাঁকে দশম শতাব্দীর পর্য্যায়ভুক্ত করা হোল।

আলমাজরিতি আলেখারেজমির প্রবর্তিত জ্যোতির্বিজ্ঞান পুনরায় বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত করেন এবং এতে পূর্বেকার পারসিক কালগণনার ধারা বদলিয়ে দিয়ে আরবী কালগণনার ধারা প্রবর্তন করেন। অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁর কেমন দখল ছিল তার স্পষ্ট আভাস এ থেকেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি আস্তারলব (astrolabe) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ, টলেমির প্লেনিসফেরিয়াম (Planispheriam) এর একখানি ভাষ্য এবং গণিত বিষয়ে (commercial arithmetic) একখানা গ্রন্থও লেখেন। গণিত পুস্তকখানির নাম হোল "আলমুয়ামালাত"। তাঁর আস্তারলব সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানা জোহানেস কর্তৃক লাটিনে অনুদিত হয়, টলেমির ভাষ্যখানি ব্রাগসের রুডোলফ (Rudolph of Brugs) কর্তৃক অনুদিত হয়। ২২০, ২৮৪ amical number সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন।

আলমাজরিতি

এখওয়ানুস্ সাফার কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই প্রাচ্যের মত পাশ্চাত্যেও একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। হাকামের পুস্তক সংগ্রহের অপরিসীম আগ্রহই যে পাশ্চাত্যের এই অনুরাগের মূলে বিরাজমান ছিল সে কথা বলা হয়ত অন্যায় হবে না। খুব সম্ভব আলমাজরিতি এইগুলো পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে

প্রচার করেন। কারুর কারুর মতে এর প্রচার হয়েছিল আলমাজরিতির কিছুদিন পরে, তাঁরই শিষ্য আলকারমানি কর্তৃক।

শুধু অঙ্কশাস্ত্রেই নয় অন্যান্য নানা বিষয়েই আলমাজরিতির প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি "রুতবাত আল হাকিম" এবং "গায়াস আল হাকিম" (জ্ঞানীর উদ্দেশ্য) নামে রসায়ন বিষয়ে দুইখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় পুস্তকখানি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নৃপতি আলফানসোর আদেশক্রমে লাটিনে অনুদিত হয়।

বাগদাদের শৌর্য বীর্যের অপ্রতিহত প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনার সমুৎকর্ষ বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পায়। ফলে অষ্টম শতাব্দী থেকেই পৃথিবীর বিজ্ঞান আলোচনা অনেকটা বাগদাদের বিদ্বৎ সমাজের মুখাপেক্ষী ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এখনকার মত তখনও অন্য দেশের বিজ্ঞান প্রতিভা, শীর্ষদেশের উৎসাহ ও সহানুভূতি ছাড়া স্ফুরিত হোতে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না। বাগদাদের ছোঁয়াচ থেকে বহু দূরে অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত সুদূর পাশ্চাত্যে থেকেও মুসলিম স্পেনের বিজ্ঞান প্রতিভার যে মৌলিকতা দেখা যাচ্ছিল প্রথম উদ্ভূত অঙ্কুরের সজীবতা ও অস্পষ্টতা নিয়ে, সে সত্যিই বিস্ময়কর। এ সম্ভবপর হয়েছিল শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিকদের অপূর্ব বিজ্ঞান প্রতিভার জন্যেই।

স্পেন ছাড়া তখন উত্তর আফ্রিকার মিসরে ও ভারতেও মুসলিম রাজত্বের পত্তন আরম্ভ হয়েছে ধীরে ধীরে। বাগদাদের

সান্নিধ্যের জন্য বাগদাদের জ্ঞান-উৎসাহ মিসরের মরুভূমিতেও প্রসারিত হয়ে সেখানকার জ্ঞানপিপাসা বর্ধিত করে তোলে, মরুভূর বক্ষেও জ্ঞানের জন্য লালায়িত আগ্রহ জেগে ওঠে। নবম শতাব্দী থেকেই এই আগ্রহ ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। নবম শতাব্দীতে এক আহম্মদ ইবনে ইউসুফ ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কোন গণিতবিদের সন্ধান পাওয়া যায় না। দশম শতাব্দীতেও যে খুব বেশী কিছু হয়েছে তা বলা যায় না। এ সময়েও এক আবু কামিল ছাড়া আর কেউই তেমন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। রোমের পতনের পরে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মিসরের বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ, ক্ষুদ্রতম ক্ষীণ রশ্মিরও আবির্ভাব কোনদিনই এখানে হয় নাই। এই অন্ধকার ঘুচিয়ে প্রথম আলোর উদ্বোধন হয় আহম্মদ এবনে ইউসুফ এবং আবু কামিলের দ্বারাই।

মিসরে তখন ফাতেমীয় বংশের রাজত্ব। বাগদাদের জ্ঞান রাজ্যে প্রতিপত্তি তাঁদের মনকেও না টলিয়ে ছাড়ে নাই। আলকাহিরা (কায়রো) থেকে শত্রুকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই স্থানে বিদ্যার পাদপীঠ স্থাপন করে বাগদাদের সঙ্গে টেক্কা দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মিসরের স্বর্ণযুগের অতি বিখ্যাত আলেকজেন্দ্রিয়ার খ্যাতিকে ম্লান করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কায়রোর গৌরব বর্ধিত করা, অন্তর্নিহিত এই দুইটি আশাই এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। নবম দশম শতাব্দীতে তেমন কোন প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া না গেলেও একাদশ শতাব্দীতে এ

পৃথিবীর বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবনে ইউনুস এবং আলহাইছামের বিজ্ঞান প্রতিভায়।

আবু কামিলের পূর্ণ নাম হোল আবু কামিল সুজা এবনে আসলাম এবনে মোহাম্মদ এবনে সুজা আলহাসিব আল মিসরী। শেষোক্ত দুইটি হোল তাঁর জন্মস্থান বা কার্যস্থান এবং কার্যের পরিচয় জ্ঞাপক—অর্থ মিসর দেশীয় গণনাকারী বা অঙ্কশাস্ত্রবিদ।

অঙ্কশাস্ত্রের প্রত্যেক শাখাতেই আবু কামিলের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত প্রত্যেক বিষয়েই কিছু না কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং স্বীয় প্রতিভায় সেগুলির গণ্ডীকে প্রসারিত করে তুলেছেন। জ্যামিতির পঞ্চভূজ ও দশভূজের (Pentagon and Decagon) ধর্ম সম্বন্ধীয় (properties) আলোচনার সঙ্গে

আবু কামিল

আবু কামিলের নাম বিজড়িত। জ্যামিতি এর পূর্বেই ত্রিভূজ চতুর্ভূজের গণ্ডী পেরিয়ে বহুভূজের মধ্যে উপনীত হয়েছিল, আবু কামিল এর গণ্ডীকে বাড়িয়ে তোলেন আরও বিস্তারিত ভাবে নানা জটিল সমস্যা ঢুকিয়ে এবং সেগুলির সমাধান ক'রে। জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য ও উপপাদ্যের মীমাংসায় সমীকরণের প্রয়োগ এর পূর্বে খুব কমই হয়েছে। ছাবেত এবনে কোরা এর পথ প্রদর্শক, তাঁর পরে আর কেউই তেমন সুকৌশলের সঙ্গে সমীকরণগুলির ব্যবহার করতে পারেন নাই। অতীব সুকৌশলে সুমধুর স্নেহস্পর্শের সঙ্গে আবু কামিল সমীকরণ

দিয়ে জ্যামিতিক উপপাদ্য বিষয়গুলির সমাধান আরম্ভ করেন। বস্তুত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমীকরণ দ্বারা সমাধান আবু কামিলের সম্পূর্ণ নিজস্ব। এ হিসাবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদদের পর্য্যায়ভুক্ত। দশম শতাব্দীতে সমীকরণ নিয়ে এমন সচ্ছল সুকৌশলী আলোচনা আর কারও দ্বারা হতে দেখা যায় না।*

শুদ্ধ অঙ্ক এবং বীজগণিতেও আবু কামিলের বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রের এই দুই শাখার অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি বিশেষ যশস্বী হন। অঙ্কের সাঙ্কেতিক নিয়মগুলি যে এখনকার মত সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল নিয়মবদ্ধ ভাবে ছিল না সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পূর্বের চেয়ে এখন অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে বিশেষ করে সমস্ত পৃথিবীর মনীষীদের মতের আদান প্রদানের সুবিধার ফলে। যখন সারা পৃথিবীব্যাপী ডাকের প্রচলন ছিল না এবং ছাপারও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই, তখন যে এমনি পরস্পরের মতের আদান প্রদানের সুযোগ খুব কমই জুটত সে অনুমান করা কঠিন নয়। বাগদাদ, কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে বা অন্যান্য স্থানে নৃপতিদের উদ্যোগে বিদ্বানমণ্ডলীর যে সমাবেশ হোত তাতেই তাঁদের যা পরিচয় ঘটত এবং তাতেই চলত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা। এই স্বল্পসংখ্যক সমাবেশে সর্ব বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা আশা করা

---

* No writer of his time showed more genius than he in the treatment of equations and in their application to the solution of geometric problems.

—History of Mathematics—Smith P. 177.

যায় না। যা দুই একটি অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হোত তারই আলোচনা চলত। অঙ্কের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি দিয়ে তাই তেমন কোন আলোচনা হয়েছিল বলে মনে হয় না। সংখ্যা লিখন প্রণালী প্রথম সুষ্ঠু নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে দেখা যায় নবম শতাব্দীতে। সেই সময় থেকে শূন্য লিখা হোত শুধু একটি বিন্দুর সাহায্যে। আরবী অঙ্ক লিখন প্রণালীতে এখনও সেই বিন্দুরই প্রচলন আছে। আলমাজরিতি, আলখারেজমির জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলকের আলোচনায় শূন্যের তিন প্রকার চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। যা হোক এখন থেকেই ধীরে ধীরে অঙ্কের লিখন প্রণালী উত্তরোত্তর উন্নত আকার ধারণ করতে থাকে। এই ক্রমোন্নতির মধ্যে আবু কামিলের দানও খুব কম নয়। ভগ্নাংশ লিখন প্রণালীর বর্তমান আকার আবু কামিলই প্রথম উদ্ভাবন করেন। অনির্দিষ্ট সংখ্যা লিখতে নূতন প্রথা অবলম্বনকারী হিসাবেও আবু কামিলের নাম পাওয়া যায়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ অনির্দিষ্ট সংখ্যা লিখনে নানা বর্ণের আশ্রয় নিতেন, এই মিসরীয় বৈজ্ঞানিক কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রা সমূহের দ্বারাই অনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করতেন। তবে এতে তিনি আলখারেজমির পন্থা অনুসরণ করেন বলা চলে।

বীজগণিতের দ্বিমাত্রা সমীকরণের উভয় প্রকার সমাধানের আবিষ্কার এবং ব্যবহার আবু কামিলের গণিতশাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান বলা চলে। প্রত্যেক দ্বিমাত্রা সমীকরণেরই দুইটি সমাধান থাকে। বীজগণিতের প্রথম পাঠেই আজকাল এ শিক্ষা

দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ জ্ঞান বিজ্ঞানসেবীদের জ্ঞানগোচর হয় নাই। দ্বিমাত্রা সমীকরণের সমাধানকারী আলখারেজমি শুধু একটি মাত্র সমাধানের কথাই উল্লেখ করেন অন্যটির কথা হয়ত তিনি ভাবেনও নাই। তাঁর বীজগণিতে এ বিষয়ের উল্লেখও নাই। অঙ্কশাস্ত্রের দিক থেকে এ একটি মস্ত বড় রকমের ভুল নিশ্চয়ই কিন্তু দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ ভুলের সংশোধন হয় নাই। এর প্রথম সংশোধন হয় আবু কামিলের দ্বারাই। এ ছাড়া তিনি মূল চিহ্নগুলির (Radicles) যোগ বিয়োগের নিয়ম পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন। আমাদের বর্তমান প্রণালী অনুসারে এ দাঁড়াবে

$$\sqrt{a} \pm \sqrt{b} = \sqrt{a+b \pm 2\sqrt{ab}}$$

একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতবিদ আলকারখি বহুল ভাবে আবু কামিলের বীজগণিত ব্যবহার করেছেন। তিনি অনেক স্থানেই আবু কামিলের অনুসরণও করেছেন।

যতদূর জানা যায় বিখ্যাত ইহুদী বৈজ্ঞানিক সাদিয়া বেন যোসেফ এই সময়ে কায়রোর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে ব্যাবিলনে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন।

ভারতবর্ষে তখন পর্যন্ত মুসলিম রাজ্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ সময়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আশা করা হয়ত ঠিক হবে না। তবে প্রকৃতপক্ষে তখনকার ভারতবর্ষের মুসলিম রাজ্যে অন্য কোন সুকুমার বিদ্যার তেমন আলোচনাই হয় নাই বলা চলে।

সমাপ্ত

সূচী—বর্ণানুক্রমিক

তার খোঁজ রাখা দরকার, মধ্যযুগের কথা ভালভাবে জানতে হোলে তেমনি সেই সময়কার একমাত্র কৃষ্টির ভাষা আরবীতে কি হয়েছে তারই খোঁজ নেওয়া দরকার। যদি দু চার শতাব্দী পরে কোন ব্যক্তি এই শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের কি উন্নতি হয়েছিল জানবার জন্যে প্রাচ্যের আরবী, সংস্কৃত, বাংলা হিন্দী বা এমনি কোন ভাষাতে কি আলোচনা হয়েছে, সে কথা জেনেই নিরস্ত হন তা হোলে তিনি যে একেও অন্ধকার যুগ বলেই ধারণা করে নেবেন সে নিঃসন্দেহ। তেমনি মধ্যযুগের জীবন্ত ভাষা আরবীতে কি হয়েছে তার খোজ খবর না নিয়েই যাঁরা তখনকার কৃষ্টির সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁরা যে একে অন্ধকার যুগ বলে ধারণা করে নিয়েছেন, সে আর এমন বিচিত্র কি? সুখের বিষয় বর্তমানের সত্যিকার ঐতিহাসিকদের চেষ্টায় এই অজ্ঞতা আস্তে আস্তে দূর হচ্ছে—হয় ত কিছুদিন পরে এর "অন্ধকার যুগ" আখ্যা এমনিতেই তিরোহিত হবে।

মুসলিম প্রাধান্যের যুগের যে সমস্ত মনীষী মৌলিক অবদানে জ্ঞান বিজ্ঞানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা আজকালকার মনীষী ও বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যার চেয়ে বিশেষ কম নয়—Statistics নিলেই একথা ভালভাবে বোঝা যাবে।*

---

* There were perhaps as many men of genius in the Middle Ages as now; at least my survey gives that impression, which would be confirmed, I am sure, by statistical enquiry. (Introduction to the History of Science. Sarton, Vol. I, Preface p. 20.)

জাবির এবনে হাইয়ান, আলকিন্দি, আলখারেজমি, আলফারগানী, আলবাত্তানী, ছাবেত এবনে কোরা, আলফারাবী, আলমাসুদী, আবুল ওয়াফা, আলগাজ্জালী, আলবেরুনী, এবনে সিনা, আলকারখি, এবনে আল হাইছাম, ইবনে ইউনুস, আলজারকালী, ওমর খৈয়াম, নাসির উদ্দিন তুসী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের যে কোন একজনই যে কোন শতাব্দীর পক্ষে যথেষ্ট। এ সমস্ত কথা ভেবে দেখলে G. Sarton এর মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে মন্তব্যকে শুধু সমীচীন নয় বরং অতি মৃদুই বলতে হবে। তাঁর মতের সামান্য অংশ এখানে উধৃত করা গেল। "To Sum up, mediaevalists have given us an entirely false idea of the Scientific thought of the Middle Ages, because of their insistence upon the least progressive elements and their almost exclusive devotion to western thought ; when the greatest achievements were accomplished by Easterners. Thus did they succeed not in destroying the popular conception of the Middle Ages as "Dark Ages" but on the contrary in reenforcing it. The Middle Ages were dark indeed when most historians showed us only (with the exception of Art) the darkest side ; these ages were never so dark as our ignorance of them."

—বর্তমানের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নত পরিস্থিতিতে মধ্যযুগের এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান আলোচনা অকিঞ্চিৎকর বলেই বোধ হবে। এ থেকে যদি কেউ ধারণা করে নেন যে তাঁদের প্রতিভাও ছিল নগন্য তা হোলে তিনি যে বিশেষ ভুল করবেন সে নিঃসন্দেহ। কারুর প্রতিভার বিচার করতে হোলে তাঁর সময়কার পরিস্থিতি নিয়েই বিচার করতে হবে এবং তিনি তাঁর পূর্বেকার জ্ঞান বিজ্ঞানকে কতটুক উন্নত করেছেন সেই থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। সংখ্যা গণনা বা লিখন প্রণালী আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে নিউটন বা আইনষ্টাইন জন্মগ্রহণ করলে কি করতে পারতেন সেই বিবেচনা করে সংখ্যা গণনা আবিষ্কারকের প্রতিভার বিচার করা দরকার। সে হিসাবে সেই সর্বপ্রথম আবিষ্কারককে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বললেও তাঁর যথোপযুক্ত সম্মান করা হয় কিনা সন্দেহ; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সংখ্যা গণনা কিই না অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার! এই ভাবে বিবেচনা করলেই মধ্যযুগের মনীষীদের প্রতিভা সম্বন্ধে সত্যিকার ধারণা করা যেতে পারে। যাঁরা অঙ্কশাস্ত্রের কোন শাখাকে কোন ভাবে কিছু না কিছু উন্নত করেছেন এ গ্রন্থে শুধু তাঁদের নামই উল্লেখ করা হয়েছে।

নানা কারণে সংগ্রহ মনোমত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে উঠতে পারি নাই। গ্রন্থখানি প্রেসে যাওয়ার পরও অনেক তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। সুযোগ সুবিধা হোলে দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলো যথাস্থানে সন্নিবেশিত করবার আশা রইল। এই

সুদীর্ঘ সময়ের পরও এই অসম্পূর্ণতার কৈফিয়তে আমার বিনীত বক্তব্য—কোন ভাষাতেই ধারাবাহিক ভাবে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের বা তাঁদের অবদানের কথা আলোচিত হয় নাই; এমন কি সুসমৃদ্ধ ইংরেজী ভাষাও এ বিষয়ে শোচনীয় দৈন্য প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় যেটুকু আলোচনা হয়েছে সেটুকুও রয়েছে ইতঃস্তুতঃ বিক্ষিপ্ত। আরব পারস্য তথা প্রধানত প্রাচ্যের জিনিস হোলেও এরা এখন সুদূর পাশ্চাত্যে আড্ডা নিয়েছে বলা চলে। এদেশে মূল আরবী পারসী গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাওয়া সুদূর পরাহত অবশ্য যেগুলো এখনও লোক চক্ষের বাইরে রয়ে গিয়েছে সেগুলোর কথা আলাদা। এখানে যে সমস্ত আরবী পারসী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের উপর নির্ভর করে এগোনো সম্ভবপর নয়; ফলে নানা বিদেশী ভাষার উপর বেশী নির্ভর করতে হয়েছে। আমার মত যারা ভাগ্যচক্রে শিক্ষা বিভাগে স্থান না পেয়ে অন্যত্র ছিটকে পড়েছে এবং চাকরীর খাতিরে যাদের মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরে বেড়াতে হয় তাদের পক্ষে অপাঠ্য বিদেশী ভাষা করায়ত্ত করবার প্রচেষ্টা যে কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার সে ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে বোধগম্য হবার উপায় নাই। নানা বিদেশী ভাষার দুরূহতায় আচ্ছন্ন এই বিষয়গুলির উদ্ধার ব্যাপার আমার পক্ষে যে সুখসাধ্য হয়ে দেখা দেয় নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। অনেক সময়েই একটি জীবনীর সামান্য একটি কথা সংগ্রহ করতেই হয়ত মাসের পর মাস,

বইয়ের পর বই ঘাঁটতে হয়েছে। কলিকাতা এবং মফঃস্বলে থেকে যে সমস্ত আরবী পারসী ইংরেজী জার্মান এবং ফরাসী ভাষার গ্রন্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি সে গুলোরই সাহায্য নিয়েছি এর মাল মশলা আহরণে। আশা করি পাঠক পাঠিকারা গ্রন্থখানিকে সেই ভাবেই বিচার করবেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখতে চাই যে গ্রন্থখানি পণ্ডিতদের জন্য রচিত হয় নাই বরং এটিকে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে, তাই Quotation এর পর Quotation এবং Foot note এর পর Foot note দিয়ে একে উদ্ব্যস্ত করে তুলি নাই এবং বাদানুবাদের জিনিসগুলোতেও নানা যুক্তি ও তর্কজালের সমাবেশ না করে যা সমীচীন মনে করেছি তাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। অন্যত্র যুক্তি তর্কের সমাবেশ করবার আশা রইল। বিষয়বস্তুর অনেকগুলি নিয়ে পণ্ডিতেরা এখনও বেশ বাদানুবাদ করছেন; উদাহরণ স্বরূপ Origin of numerals এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতেই এর প্রথম উদ্ভব হয়েছিল বলে এতদিন ধরে নেওয়া হোত কিন্তু এখন নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন Florian Cajori পর্যন্ত এই বিরুদ্ধ মতবাদকে উপেক্ষা করতে পারেন নাই।

গ্রন্থখানিতে সাধারণত আরবী "ث" এর উচ্চারণে "ছ", "س" এর উচ্চারণে "স" এবং ش এর উচ্চারণে "শ"

ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থখানি প্রণয়নে সব চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছেন তিনি যাঁকে এখানি উৎসর্গ করা হোল। Reference Book সংগ্রহ করা, প্রুফ দেখা, প্রেসে দৌড়াদৌড়ি করা প্রভৃতি নিরানন্দ কাজগুলি করেছেন কল্যাণীয় মোহাম্মদ আবদুল জব্বার এম, এস-সি, জোয়াদুর রহিম জাহিদ বি-এ, মোহাম্মদ এসহাক ও মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল গণি। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন এম, এ, অধ্যাপক ফজলুর রহমান এম, এস্-সি, ডাঃ মনসুর আলি প্রভৃতি বিশেষ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করে কলেজ ও অন্যান্য লাইব্রেরী থেকে পুস্তকাদি সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। নালন্দা প্রেসের সত্বাধিকারী বাবু রবীন্দ্রনাথ মিত্রের বিশেষ আগ্রহ এবং যত্নের জন্যেই পুস্তকখানি সহজে মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার ধারণা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি যদি পরস্পরের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হোতে পারে তাহোলে তাদের কলহস্পৃহায় এমনি ভাটা পড়বে। সে দিক দিয়ে গ্রন্থখানি কিছুমাত্র কাজে আসলেও নিজের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

গোপালপুর, পাবনা
২৬শে মার্চ, ১৯৪৩

আকবর আলি

BIBLIOGRAPHY

History of Mathematics—2 Vols. Smith, D. E.
A History of Mathematics—Cajori, F.
A short account of the History of Mathematics.
—Ball, W. W. Rouse.
A brief History of Mathematics—Fink, Karl.
A History of Mathematical Notations—Cajori, F.
A History of Elementary Mathematics— „ „
A bit of Mathematical History—Böcher Maxime.
Introduction to the History of Science.
—Sarton, G.
A History of Science.
—Dampier-Whetham, W.C.D.
The Hindu Arab Numerals—Smith & Karpinski.
Historical introduction to Mathematical literature—Miller, G. A.
The Legacy of Islam—Edited by Arnold, Sir T.
A Literary History of the Arabs—Nicholson, R.A.
A Literary History of Persia—Browne, E. G.
History of the Arabs—Phillip, K. Hitti.
Spirit of Islam—Ali, Syed Ameer.
A short History of the Saracens
—Ali, Syed Ameer.
The Arab Civilization—Hall, J.
Encyclopædia of Islam.
Encyclopædia Britanica.
The Encyclopædia of pure Mathematics.
Tarikh-al-Hukama—Ibn-al-Kift.

Mukadamat—Ibn Khaldun.

Al Fihrist—Ibn al Nadim.

Al Ilm ul Jabar wal Mukabala—Al Khwarizimi.

Encyklopadie der Mathematischen Wissenschaften

Geschichte der Mathematik.
—Gunther & Wieleitner.

Zur Geschichte der Mathematik in Altertum und Mittelalter—Hankel, H.

Histoire des sciences Mathematiques et Physiques.—Marie, M.

Histoire des Mathematiques—Montoucla, J. E.

Histoire des Sciences Mathematiques en Italie.
—Libri, G

Recherches sur L'histoire des Sciences Mathematiques chez les orientaux—Woepke, F.

Geschichte der Elementar Mathematik in systemetischer Darstellung—Tröpfke, J.

Histoire des Mathematiques dans l'Antiquite et la Moyen Age—Zonen, H. G.

La Grande Encyclopedie.

Vorlesungen über Geschichte der Mathematik
—Cantor.

Geschichte der reinen Mathematik—Arneth, A.

Grundzüge der Antiken und Modernen Algebra der litteralen Gleichungen.
—Matthilessen Ludig.

Geschichte der Mathematischen Wissenschaften
—Suter Heinrich.

Geschichte der Astronomie—Wolf Rudolf.